বাংলাদেশের সত্ত প্রসঙ্গে

THE ASIATIC SOCIETY MONOGRAPH SERIES—VOL. XXIV

BĀṄGLĀDEŚER SAṄG PRASAṄGE

By
BIRESHWAR BANDYOPADHYAYA

With a Foreword by
DR SUNITI KUMAR CHATTERJI
National Professor of India in Humanities

THE ASIATIC SOCIETY
1972

THE ASIATIC SOCIETY MONOGRAPH SERIES—VOL. XXIV

বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় অধ্যাপক

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা -সহ

দি এশিয়াটিক সোসাইটি
১৯৭২

PREFACE

THE Saṅg procession or the parade of costumed or masked pantomime presenting social and religious sketches through dramatic displays with songs and music, was an interesting feature of Bengali folk culture up to the end of the first quarter of the current century. The main purpose of such performances was no doubt to provide for amusements and relaxation at the end of austere religious practices. But it had a strong under-current drawing attention to ethical and moral lapses in society through humourous and satirical repertoire. That is why the Saṅg displays captivated the minds of Calcuttans even. Different localities of the city, like Jeliapara, Kansaripara, Ahiritola etc, became famous for producing every year creative topical sketches, sometimes gross and even obscene to an extent, yet glistening with sharp expressions of wit and banter Naturally the Saṅg performers produced a wide variety of poems and songs, which continued mostly as a floating literature, not collated or studied seriously so long.

I have great pleasure therefore to present this volume on the Bengali Saṅg tradition along with an anthology of literary works of different Saṅg schools, prepared most assiduously by Shri Bireshwar Bandyopadhyaya, an assistant in the office of the Society, who found time and energy to procure and collate materials from diverse sources in Calcutta and outside. Shri Bandyopadhyaya deserves our hearty congratulations for his scholarly endeavour. I am confident the book will provide useful source material to the students of history as well as of Bengali literature. We are grateful to Dr Suniti Kumar Chatterji, our National Professor, for his 'Foreword', which has considerably heightened the importance of the volume. Our thanks are due to Shri Biram Mukhopadhyay attached to our Publica-

tion Section who took personal interest in piloting the work through the press, and Shri Charu Khan for preparing the art-work of the dust-cover of the Book. We also acknowledge with thanks the copyright materials used in the book.

The Asiatic Society
25 December 1972

S. K. Mitra
General Secretary

গ্রন্থকারের নিবেদন

সঙ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন পূর্ণাঙ্গ বই বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়নি। সংক্ষিপ্তভাবে হলেও বাংলাদেশের বহু রকমের সঙের কথা এই গ্রন্থে নিবেদন করবার চেষ্টা করেছি। প্রায় চোদ্দ বছর পূর্বে সঙের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিলাম। কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে আজ প্রথমেই মনে পড়ছে সম্প্রতি লোকান্তরিত জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কথা। তিনি আমাকে অযাচিত ও অকৃপণভাবে সহায়তা করেছেন।

'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে'র রচনাগুলি খণ্ডিতভাবে বিভিন্ন সময়ে রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, অমৃত, চতুষ্কোণ, কথাবার্তা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমার এই নিবন্ধগুলি যাঁরা আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রী রমাপদ চৌধুরী, শ্রী সুনীল বসু, শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী পরিমল গোস্বামী, শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রী শান্তিকুমার মিত্র, শ্রী সুনীলচন্দ্র বসু, শ্রী মণীন্দ্র রায়, শ্রী কমল চৌধুরী, শ্রী মনোরঞ্জন ভাস্কর, শ্রী অরুণ রায়, শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা আমার রচনা প্রকাশ করেছিলেন এবং এই কাজে অনুপ্রাণিতও করেছেন নানাভাবে। এই জন্য এঁদের সকলের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

সঙের তথ্য সংগ্রহের কাজে আমি যাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা শিরোধার্য করে এই গ্রন্থরচনায় ব্রতী হয়েছিলাম, তাঁকে ধন্যবাদ দেবার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। সেই পরম শ্রদ্ধেয় মনীষী শ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং আলোচ্য বিষয়-সমূহকে আরও আকর্ষণীয় করেছেন। এজন্য আমি নিজেকেও ধন্য জ্ঞান করছি এবং তাঁর এই সস্নেহ আনুকূল্য বিনম্রচিত্তে ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

বিভিন্ন স্থানের সঙের খোঁজ-খবর দিয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের ঋণও অপরিশোধ্য। খিদিরপুরের (পদ্মপুকুর) সঙের ছড়া ও গান সংগ্রহের সময়

শ্রী দিলীপচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী দাশরথী মণ্ডল আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ওই অঞ্চলের অর্থাৎ মনসাতলা, নারকেল বাগান এবং ভূ-কৈলাসের সঙের ছড়া ও গান সংগ্রহের সময় শ্রী হরিপদ সেন যথেষ্ট সহায়তা করেন। শ্রীরামপুরে সঙ বের হতো এই সংবাদ জানিয়েছিলেন সাংবাদিক শ্রী শান্তিকুমার মিত্র। জনাই-বেগমপুরের সঙের তথ্য সংগ্রহের সময় শ্রী রেণুপদ মুখোপাধ্যায় সহায়তা করেন। বাসুবাটীতে সঙের আসর বসতো এই সংবাদ জানিয়েছিলেন বর্ধমান থেকে শ্রী রণজিৎ ভট্টাচার্য। বাসুবাটীতে অনুসন্ধান কালে শ্রী অমলেন্দু ভট্টাচার্যের বাড়িতে আতিথেয়তা লাভ করে উপকৃত হয়েছি। শ্রী ভট্টাচার্য এবং ওই গ্রামের ডাক্তার শ্রী গোপালচন্দ্র দাস স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঢাকার মিছিলের সঙের ছড়া ও গান সংগ্রহ করার সময় শ্রী উদয়নাথ নন্দী আমাকে সহায়তা করেন। হাওড়া জেলার রাধাপুর গ্রামের গান ও ছড়া সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে ডক্টর অমূল্যকুমার বাগ মহাশয়ের সৌজন্যে। সুন্দরবন অঞ্চলের নিশ্চিন্তপুর গ্রামের গান ও ছড়া সংগ্রহ-কার্যে সহায়তা করেন শ্রীমতী কল্পনা মাইতি এবং শ্রীমতী পুষ্পরাণী মল্লিক। এই প্রসঙ্গে সকলের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

যাঁরা আমাকে ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের ঋণও স্বীকার করছি। খ্যাতনামা গবেষক ও লেখক শ্রী অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস., Mr J. E. Schaap, শ্রী নির্মলকুমার সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য-বিভাগ এবং Statesman পত্রিকার সৌজন্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

যাঁরা আমাকে অনুক্ষণ উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের কথাও উল্লেখ করা দরকার। বিশেষ করে শ্রী শিবদাস চৌধুরী, অধ্যাপক জহরলাল সেন, অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, গবেষক ও লেখক শ্রী বিনয় ঘোষ এবং শ্রী রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করে পারলাম না। তা ছাড়া শ্রী রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী দীপক সেন, শ্রী অশোক সিন্‌হা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রী চিত্রভানু সেন, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী শৈলেন মুখোপাধ্যায়, খ্যাতনামা লেখক শ্রী মিহির আচার্য, শ্রী সমর সোম, শ্রীমতী শুভ্রা বাগচি এবং অন্যান্য বন্ধুদের আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমার পরম হিতৈষী ও বন্ধু শ্রী দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত এবং শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী আমাকে নানাভাবে উৎসাহ, উপদেশ ও প্রেরণা দিয়েছেন, সে-কথাও স্বীকার

করি। তাঁদের ঋণ একমাত্র প্রীতির দ্বারাই পরিশোধ্য। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার ও তালতলা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকবৃন্দ আমাকে বিভিন্ন সময়ে বই ও পত্র-পত্রিকা দেখবার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তা ছাড়া যাঁরা ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ আমাকে দেখতে দিয়েছেন, তাঁদের আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি—বিশেষ করে, শ্রী সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, শ্রী তারকনাথ দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করে পারছি না।

এই বই প্রকাশের যাঁরা সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই ব্যাপারে বিশেষভাবে ডক্টর ত্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, ডক্টর সুধীররঞ্জন দাশ, ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা, ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়ের সহায়তা ও সহৃদয়তার কথা স্মরণ করছি।

এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি শ্রী মৃগাঙ্কমৌলি বসু (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব), ডক্টর রমা চৌধুরী, ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর আবদুস সোভান, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডক্টর অশোককুমার ভট্টাচার্য, শ্রী অনিলকুমার কাঞ্জিলাল প্রমুখ পণ্ডিতেরা যাঁরা এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত আছেন, তাঁদেরও সহায়তা পেয়েছি। সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

বাংলাদেশের সঙের গান ও ছড়া যা অনেকের চোখের আড়ালে উপেক্ষিত ছিল; লোকসাহিত্যের সেই অমূল্য সম্পদগুলিকে সংগ্রহ করে সুধীসমাজের সামনে উপস্থিত করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন অঞ্চলের সঙের পরিচয় দেবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস সকল শ্রেণীর পাঠকের দৃষ্টি এইসব ছড়া ও গানের ওপর পড়বে। যদি এই বই পাঠক-সমাজের উপকারে আসে, আমি নিজেকে ধন্য ও আমার সকল প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে মনে করবো।

যে-সব ছড়া ও গানের কিছু অংশ গ্রন্থের আলোচনা-অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, পৃষ্ঠা ৭১—'গেছলাম আমি মাঠে'; 'কি ঝকমারি করতে চাকরি গেলাম বিদেশে'; পৃষ্ঠা ৭২—'কি মজা করলো গবৃমেন্ট কাপড় দিয়ে কণ্ট্রোলে'; পৃষ্ঠা ৭৩—'আমি ভাই বড় মিস্ত্রী'; 'আপনারা কি চান, রক্তমুখী সাবান'; 'খাও না ওগো মুড়ি, তোমার চরণে গড় করি'; 'বউদিদি যেও না বাপের

ঘর' ; পৃষ্ঠা ৮৮—'টাকা তোমার মান্য ত্রিসংসারে' ; পৃষ্ঠা ৮৯—'চলে যায় দিন ভেবে দেখ' ; পৃষ্ঠা ১০৪-০৫—'নাচাও ভাইয়া জানী' ; সেগুলির পূর্বে উল্লেখিত অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ যথাক্রমে ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬ (১), ১৪৬ (২), ১৪৭ (১), ১৪৭ (২), ১৫১, ১৫৫ এবং ১৬৬ সংখ্যক গানে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যাপারে নিজে তৎপর হয়ে যে পরিশ্রম করেছেন, তার উপযুক্ত সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জানাবার মতো সাহিত্য-শক্তি আমার নেই। শুধু এই কথাই বলবো, তিনি উদ্যোগী না হ'লে বই প্রকাশিত হতে আরও বিলম্ব হতো। ছাপাখানায় প্রেসকপি পাঠাবার পূর্বে শ্রী মুখোপাধ্যায় আমাকে নানান সুপরামর্শে সহায়তা করেন এবং এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বিভাগের পরিকল্পনায় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছি, সে-কথাও স্বীকার করছি।

এই বইয়ের জ্যাকেটের পরিকল্পনা করেছেন শিল্পী শ্রী চারু খান, তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। National Printing Works-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ মুদ্রণ-ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। এই বইয়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আর সকলকেও আমার ধন্যবাদ।

ডিসেম্বর, ১৯৭২ — বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

চিত্র - তালিকা

FOREWORD

THE present work in Bengali entitled *Bāṅglādēśēr Saṅg (Swāṅg) Prasaṅgē* ("*À propos* the *Swang* of the Land of Bengal") is a noteworthy contribution to the culture and literature of Bengal, and Sri Bireswar Banerjee, who has compiled this work, can very well be congratulated on it; and I am happy to welcome him to the band of research workers in the field of Bengali literature and culture. Sri Banerjee is an Assistant in the office of the Asiatic Society of Calcutta, and having been in the atmosphere of linguistic, literary and historical study and culture, he has essayed preparing this book; and he has made, in my opinion, quite a successful essay in the subject.

The institution of the *swāṅg* (or *shŏng*, as it is currently called in present-day Bengal, and about which the author has given the necessary note, for the understanding of the uninitiated, in his very comprehensive *Introduction* to the subject), has been a new and quite a characteristic development of folk-literature as a very natural branch of folk-lore or folk-culture as it developed in the cities of Bengal during the last 200 years.* Although the *swāṅg* is something new

* The Sanskrit word *Samánga* (from *sama*+*aṅga*) appears to have developed a new sense in Prakrit and Bhasha (i.e. Middle Indo-Aryan and New Indo-Aryan). See in this connexion Sri Ralph Lilley Turner's *Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages*, Oxford University Press, 1962-1966, Entries No. 13208 and 13204. *Samáṅga* would become in Prakrit and Bhasha *Savāṅga*, *Svāṅga*, *Swāṅg*. According to Bengali habits of pronunciation, *swāṅga*, *swāṅg*, *swāṅ*=soāṅ (সোআঙ) became সঙ, সং (sŏng, i.e. *shong*), Middle Bengali -oā- became contracted to ȧ, i.e. a long অ, like *awe* in English. Cf. স্বামী=সোআমী, in uneducated colloquial often pronounced as স-মি or শ-মি; সোয়াদ=সোআদ, similarly becomes স-দ; Persian *rawāk*=রোআক, then র-ক; সোআবাজার=*Showābājār*, *Shoābajār*, then colloquially শ-বাজার; etc. etc. So সোআঙ=সঙ।

in the folk-literature of Bengal and India, it has had a long history, and its roots go back to the hoary past—back to the folk-songs and folk-poetry such as were current among all racial and linguistic groups in India—the non-Aryan tribes as well as the Aryans both included.

I need not write a little monograph on the subject in this present little Foreword to Sri Bireswar Banerjee's book. The author himself has tried to do his work conscientiously. He has very rightly planned his work in two sections. The first section, consisting of some 153 pages, gives quite a comprehensive study of the modern Bengali *swāṅg* as it is current today, or used to be current until very recently :—it is gradually coming out of use. In this section, he has with very great pains tried to give a historical development of the *swāṅg* as it was performed by various groups of people in the different areas of Calcutta and other cities, groups of people who formed members of a particular trade or caste guild mostly ; and he has also raked out from oblivion the names of the prominent people who were connected, during these two centuries of its history, with the various *swāṅg* groups, and who also used to compose the songs or poems which formed the repertoire of the *swāṅg* performers. This is recent history, and the study of it and its reconstruction has been a noteworthy success, considering how quickly this kind of ephemeral literature with all its background has come to be forgotten. I think this has been by itself a signal service to present-day Bengali culture. In his *Foreword* Sri Banerjee has also essayed to give an account of the origin of this *swāṅg* from very ancient times, and also its evolution through other kinds of musical and dramatic dance-display. The social and other background, and the attempt to bring about ethical and moral uplift in society by means of satire, have been sought to be made clear. The participators in the *swāṅg* by means of singing in costume and by dancing or engaging in pantomine, were conscious of performing a

service to society by bringing home to the public the new transformations which were coming into society, and which in the opinion of the various patrons of the *swāṅg* were not for the good of society. In some cases, some of the *swāṅg* were frankly progressive in spirit, but mostly the attitude was conservative. The *swāṅgs*, to start with, as in all domains of life in India, had a religious basis or background, and a conservative attitude as we can understand goes happily with something which has a direct or an indirect religious background. Current events also have had their full share in the poetical compositions which were sung or chanted or declaimed by the *swāṅg* pantomimers. Sri Banerjee has given full attention to this aspect of the *swāṅg*.

The second half of the work gives a good selection of the poems, songs and other compositions which formed the repertoire of the *swāṅg* parties. Here also Sri Banerjee had to take great pains in making his selection, not only from printed materials but also from manuscripts and from the memories of older people who remembered them. On the whole, this part, giving the poetical compositions of the Bengali *swāṅg*, forms quite a valuable anthology of this kind of folk-poetry ; particularly when there are so very few selections of this nature dedicated to the *swāṅg* poems and songs. In a compilation like *Bāṅgālīr Gān*, published long ago by Durgadas Lahiri from the *Baṅgabāsī* Press, there will be found scattered poems of the nature of the *swāṅg* compositions. Other kinds of similar folk-poetry, frequently becoming sophisticated poetical literature, like the *Pāñchālī* Poems of Dasarathi Roy, are there, and these also will have to be considered in the context of *swāṅg* literature.

Sri Bireswar Banerjee's book, without being exactly a pioneer for the subject, certainly breaks new ground so far as the *swāṅg* poems, songs and other compositions are concerned He has drawn our attention to this distinctive aspect of Bengali folk-literature and folk-poetry as well as

Bengali society and culture (particularly in its urban set-up), and he has done his work remarkably well. For this he deserves appreciative thanks of all students and lovers of modern Indian culture.

INDEPENDENCE DAY
15 August 1972

SUNITI KUMAR CHATTERJI

বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে

১॥ সঙ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

নাটকীয় ভাবপ্রকাশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সার্বজনীন মাধ্যম হল সঙ। পরে এই রীতি যাবতীয় নাট্যকলার অঙ্গীভূত হয়। সকল সভ্যতার আদিপর্বগুলিতে সঙের প্রচলনের কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। অঙ্গভঙ্গি, পদক্ষেপ ও মুখভঙ্গির দ্বারা ভাব, কার্য এবং পারিপার্শ্বিকতা বর্ণনা করা সঙের অন্যতম উদ্দেশ্য। সঙ যুদ্ধের নৃত্য দেখাত, পশু-পক্ষীর ডাকের অনুকরণ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করত। বলিদান-সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলি ভাবভঙ্গির দ্বারা প্রকাশ করত। ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতায় এই ভঙ্গি ইতিপূর্বেই অভিনয়-কলা রূপে বিকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রাচীন গ্রীকগণ কখনও-কখনও সঙের সঙ্গে সমবেত সংগীত যুক্ত করে দিতেন। প্রাচীন গ্রীসে কেবল দেবতা ও বীরপুরুষ-সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে সঙের অভিনয় হত। পরবর্তী কালে গ্রীসে ও রোমে সঙের দ্বারা সমকালীন প্রসঙ্গ অর্থাৎ তখনকার রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্রূপ করেও অভিনয় করা হত। রোমকগণ এই বিষয়ে সবিশেষ তৎপর ছিলেন। রোম-সাম্রাজ্যে এই বিশিষ্ট অভিনয়-কলা বহুল পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছিল। এমন কি এই কলার অনুশীলন ও পরিবর্ধনের জন্য শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন চরিত্রে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্য তাঁরা নানারকম মুখোশ ব্যবহার করতেন। মঞ্চের উপর যেরকম দৃশ্য-সংস্থানের প্রয়োজন হত তাঁরা সেরকম দৃশ্যপটেরও ব্যবস্থা করতেন।

রোমক নাট্যনীতিতে 'সঙ' সংজ্ঞাটি মঞ্চাভিনয় এবং অভিনেতা উভয়েরই সম্পর্কে প্রযুক্ত হত। নাট্যাভিনয়ে যখন কোন অভিনেতা অঙ্গভঙ্গি করে ভাব প্রকাশ করতেন, তখন সেই বিশেষ অভিনয়টুকুকে সঙ বলা হত। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক দিক থেকে বলতে গেলে রোমক সঙের অভিনয় এবং ইউরোপীয় নাট্যাভিনয়ের ব্যালে-নৃত্য, এই দুইয়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে ব্যালে-নৃত্যে যন্ত্রসংগীতের প্রচলন ছিল। কিন্তু অভিনেতাগণ মুখোশ ব্যবহার করতেন না। য়ুরোপীয় মূকাভিনয় যদিও তার

একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করে কিন্তু আসলে তা সঙেরই রূপান্তর। খ্রীষ্টমাস মরশুমে বিলাতী রঙ্গমঞ্চের উপর সঙের অভিনয় বস্তুতঃ এক হাসি-ঠাট্টা-রগড়ের রঙ্গ রূপে প্রচলিত ছিল। এই সঙ নাচ-গান, দৃশ্যপট ও পোশাক-পরিচ্ছদের বহু বিচিত্র সমারোহে অভিনীত হত এবং অভিনয়ের কিছুটা ইতালীয় মুখোশ-রঙ্গনাট্য (Masked comedy) থেকে পরিগৃহীত কয়েকটি প্রচলিত চরিত্র অবলম্বনে পরিস্ফুট হত।

সঙের (Pantomime) পরবর্তী বিকাশ commedia dell' arte এবং তা থেকে Harlequin উদ্ভূত হয়।[১] Harlequin এক প্রকার বিলাতী সঙের অভিনয়। সেখানে রং-বেরংয়ের পোশাক পরিধান করে নানারূপ রঙ্গকৌশল পরিবেশন করা হত। Harlequinএ নাচ-গানের চেয়ে মস্করাই ছিল মুখ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানা উৎসবের মধ্যেই যে সঙ আত্মপ্রকাশ করত তার বহু প্রমাণ আছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পূজা-পার্বণে সঙ বের করার প্রথা বহুদিন থেকে চলে আসছে। সকলকে আনন্দ দেবার জন্যেই সেকালের মানুষ পূজা-পার্বণে সঙ বের করতেন। মুখ্যত চিত্তবিনোদনের জন্যেই সঙের সৃষ্টি হয়েছিল। সেকালে প্রায় প্রতি পল্লীতে এবং প্রত্যেক বাজারে গাজন হত। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন গাজনের দল বিভিন্ন পথে ঢাক ও কাঁসি বাজিয়ে ঘুরত এবং সেই সঙ্গে সঙ বের হত।

তিব্বতে চৈত্র মাসে দেব-দানব সেজে লোকে নৃত্য, গীত ও কৃত্রিম যুদ্ধ করে। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থে উল্লেখ আছে। স্বামী অভেদানন্দ[২] তিব্বতের আদিম অধিবাসী প্রসঙ্গে বলেছেন, "তাহারা পিশাচাশ্রিত বৃক্ষ, প্রস্তর, সর্প প্রভৃতি পূজা করিত; এবং ভূতের বিকট মূর্ত্তির মুখোস পরিয়া দানাই নৃত্য করা এই পূজার প্রধান অঙ্গ ছিল।" চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়[৩] বলেছেন, "কত দিন হইতে চড়ক পূজা আমাদের দেশে প্রবর্তিত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এদেশে যে পূজাপদ্ধতি বিরাজমান, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার অন্তরালে বৌদ্ধ প্রভাব যে সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"

১ *The Encyclopaedia Britannica*, New York edition

২ স্বামী অভেদানন্দ, কাশ্মীর ও তিব্বতে, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৭৪), পৃষ্ঠা ১৮২

৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৮৩০

সঙ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[৪] বলেছেন, "গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন সংস্কৃতির এক অভিনব বিকাশ হইতেছে গত কয়েক শত বৎসর ধরিয়া প্রচলিত চিত্তবিনোদনের ধারা— "সঙ্ (সং)"। প্রাচীন কাল হইতে এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পোশাক পরিয়া অঙ্গভঙ্গী সহযোগে গান, ছড়া-কাটা প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের একটি পরিহাসোজ্জ্বল অনুকৃতিকে "সমাঙ্গ" অর্থাৎ "অনুরূপ অঙ্গ" বলা হইত। এই সংস্কৃত শব্দ হইতে উত্তর ভারতের হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় "স্বাঁগ্" (=সওআঙ্গ), এবং বাঙ্গালায় "সরঙ্গ"> "সঙ" বা "সং"। ছদ্মবেশ অর্থে "সঙ" শব্দ বাঙ্গালা দেশে খ্রীষ্টীয় আঠারোর শতকের শেষ দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল*। আমাদের দেশে 'জাত' বা যাত্রা' অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানমূলক শোভাযাত্রায় এইভাবে 'সঙ' সাজিয়া যাওয়ার রীতি বিশেষ ভাবে পালিত হইত। পরে উনিশের শতকের প্রারম্ভ হইতে আমাদের চড়ক গাজন প্রভৃতিতে জন-সাধারণের জীবনযাত্রার প্রকাশক নানা প্রকারের 'সঙ' এইসকল জনপ্রিয় পূজানুষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।"

সঙ শুধু চৈত্র মাসেই বের হত না। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষে সঙ বের করার একটা রেওয়াজ হয়েছিল। এমন কি বিয়ে-বাড়িতেও আমোদ-প্রমোদের জন্য সঙের ব্যবস্থা থাকত।

সেকালে ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে উৎসব-অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, বাই-নাচ প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ যেমন হত, সেই সঙ্গে অনেকে সঙের হাস্য কৌতুকেরও

[৪] জেলেপাড়ার সঙের স্মরণ-উৎসব প্রসঙ্গে একটি পুস্তিকা

* "সমাঙ্গ, সমাঙ্গিক" শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু "নকল করা" অর্থে এই শব্দ হইতে উদ্ভূত নানা শব্দ আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলিতে পাওয়া যায়। রুষ বাদ্যকার, নাট্যকার, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও ভাষাবিৎ Herasim (Gerasim) Lebedeff হেরাসিম লেবেদেফ খ্রীষ্টীয় আঠারোর শতকের শেষ দশকে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, এবং বাঙ্গালী নাট্যকার ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাহায্যে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ধরণে দৃশ্যপট রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি সহিত নাটক অভিনয় করান, বাঙ্গালা ভাষায়। ইংরেজী হইতে দুইখানি নাটক তিনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করান। একখানির ইংরেজী নাম The Disguise, বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ করা হয় "সঙ্-বদল", অর্থাৎ "পরিচ্ছদের পরিবর্তন"—যাত্রা নাটকে যে বিভিন্ন পরিচ্ছদ অভিনেতৃবর্গ পরিয়া থাকেন, তাহারই পরিবর্তন,—অর্থাৎ Disguise. এখনকার বাঙ্গালায় আমরা বলিব "ছদ্মবেশ"। (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংযোজন।)

ব্যবস্থা করতেন। ১৮২৩ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখের একটি সংবাদপত্রে[৫] এইরূপ একটি অনুষ্ঠান ও সঙের উল্লেখ আছে। সংবাদটি হল এই -

"নতুন গৃহ সঞ্চয়। মোং কলিকাতা ১১ দিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্তবাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক ২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।"

সঙ অকারণ অঙ্গভঙ্গি করে কখনও বা গান গেয়ে কিংবা ছড়া কেটে সকলকে হাসাত। যাত্রার আসরেও সঙের আবির্ভাব হত। নাটক প্রসঙ্গে আলোচনা কালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ[৬] লিখেছেন—

"বাঙ্গালা নাটক রচিত হইবার পূর্ব্বে যে যাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হইত না—ভূমিতেই 'আসর' রচনা করা হইত এবং দৃশ্যপটের ব্যবহার ছিল না। সাধারণতঃ পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনেই অভিনয়ের 'পালা' রচিত হইত। কিন্তু সকল শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা গাহনা হইত বলিয়া সময় সময় অকারণ হাস্যোদ্দীপন জন্য সং আনিতে হইত। সং আসরে আসিয়া যে অভিনয় করিত তাহা সকল সময় সুরুচি-সঙ্গত হইত না এবং সে সময় সময় অবান্তর উক্তি করিত।"

সেকালের যাত্রাওয়ালারা যখন দেখতেন ভালো অভিনয় করেও যাত্রা বেশ ভালোভাবে জমে উঠছে না, তখন সাধারণ দর্শকের কাছে আসর জমাবার জন্য সঙ দিতেন। অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, অশ্লীল রঙ্গ-রস, সঙের নাচ প্রভৃতি যাত্রার মধ্যে অনেকটা স্থান অধিকার করে থাকত এবং তা শালীনতাবিহীন হলেও তেমন নিন্দনীয় ছিল না। সেকালের সংবাদপত্রে এমন বহু সংবাদ চোখে পড়ে যার মধ্যে উল্লেখ আছে সঙের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও গান-বাজনার কথা। প্রায় দেড়শো বছর আগে যে-সব গান কলকাতা শহরে ও আশেপাশে গাওয়া হত সেগুলির মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। তার

৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৩৪৬), পৃষ্ঠা ১৩৮

৬ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বাঙ্গালা নাটক, (১৯৫২), পৃষ্ঠা ৮

বহু পরিচয় সেকালের তর্জা, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি গানের মধ্যে পাওয়া যায়। বর্তমানে সেগুলি শুনলে অনেকে শিউরে উঠবেন। কিন্তু এককালে এ-ধরনের গান সমাজের আসরে গাওয়া হত। ব্যাপটিস্ট মিসনারী ওয়ার্ড[৭] লিখেছেন, "The Songs of the Hindoos, sung at religious festivals, and even by individuals on boats and in the streets are intolerably offensive to a modest person."

সেকালের যাত্রায় সঙের প্রভাব কিরূপ বিস্তার লাভ করেছিল তা আমরা গিরিশচন্দ্র ঘোষ[৮] মহাশয়ের রচনা থেকেও জানতে পারি। তিনি বলেছিলেন, "থিয়েটারের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে কবি, হাফ্-আকড়া, পাঁচালী ও যাত্রার প্রাদুর্ভাব ছিল। হাফ্-আকড়া, কবি ও পাঁচালীতে গালি-গালাজ চলিত এবং ঐ সকল গালি-গালাজ লইয়া সমাজে সকলে বিশেষ আনন্দ করিত। যাত্রায় বড় একটা কথাবার্তা ছিল না, দু-একটা কথার পর 'তবে প্রকাশ করে বল দেখি ?' বলিয়া গান আরম্ভ হইত। সেই গানের কতক আদর ছিল, কিন্তু বিশেষ আদর সঙের। সঙ হালকা সুরে গাইত, অপেক্ষাকৃত ভারি অঙ্গের পালার সুর হইতে সঙের সুরের আদর অনেকের নিকট হইত। সঙ গালাগালি দিত। তাহা লোকের বিশেষ প্রিয় হইত। গালাগালির এত আদর ছিল যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকে সম্পাদকে অতি অবক্তব্য ভাষায় গালি চলিত এবং ঐ সকল সংবাদপত্রেরই গ্রাহক অধিক হইত, যিনি গালাগালি দিতে সুনিপুণ হইতেন, আদর তাঁহার বেশী ছিল।"

সেকালের চড়ক উপলক্ষে সন্ন্যাসী এবং সঙের মিছিলের একটি ছবি (Procession of the Churruck Pooja) এঁকেছিলেন বিদেশী চিত্রকর Sir Charles Doyly। লণ্ডনের Dickinson & Co. এই ছবিটি ছাপিয়ে ছিলেন। উক্ত ছবিতে লোহার বাণবিদ্ধ অবস্থায় সন্ন্যাসীদের নৃত্য করতে দেখা যায়। তা ছাড়া আছে সঙ, বসা সঙ অর্থাৎ মাটির পুতুল-সহ বিরাট শোভাযাত্রার দৃশ্য। সেকালে সঙের মিছিলে ইংরেজরাও যোগ দিতেন। পূর্বোক্ত ছবিটি ১৯২৫ সালে কলকাতার 'মিউনিসিপ্যাল গেজেটে' ছাপা হয়েছিল। ছবি প্রসঙ্গে

৭ W. Ward, *A View of the History, Literature and Mythology, of the Hindoos : Including a minute description of their manners and customs, and Translations from their Principal works*, (1818), vol. I, page 186

৮ সচিত্র শিশির, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, পৃষ্ঠা ৫৮

একটি দৈনিক পত্রিকা[৯] মন্তব্য করেছিলেন, "মিউনিসিপ্যাল গেজেট ১৮৪৮ সালে কলিকাতার রাস্তায় চড়কপূজার যে মিছিল বাহির হইয়াছিল, তাহার একটি চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। চিত্রে দেখা যায় যে, মিছিলের সঙ্গে অনেক ইংরাজও যোগ দিয়াছেন। সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই। পূর্ব্বে বাংলার বর্ষশেষে এই চড়কপূজার উৎসব যেরূপ ধুমধামের সঙ্গে হইত, এখন আর তাহা হয় না। বাঙ্গালার আনন্দের উৎস শুকাইয়া গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশিষ্ট পালাপার্ব্বণ ও উৎসবগুলিও লোপ পাইতেছে। পল্লীগ্রামে এখনও স্থানে স্থানে চড়কপূজার উৎসব হয় বটে, কিন্তু সহরে মোটেই তাহার চিহ্ন দেখা যায় না। পূর্ব্বে এদেশে যেসব ইংরাজ আসিতেন, তাঁহারা কতকটা সদাশয় ছিলেন। এদেশবাসীর আমোদে-উৎসবে তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে যোগ দিতেন। কিন্তু আধুনিক কালের ইংরাজদের মনে সে ভাব নাই, প্রধানতঃ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ও সঙ্কীর্ণতার ফলেই এযুগে বর্ণবিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৬৩ সালে গভর্নমেন্ট আইন করে বাণ-ফোঁড়া বন্ধ করেছিলেন[১০]।

চৈত্র মাসের পয়লা থেকে শুরু হয় বাংলাদেশের শৈব উৎসব। চৈত্র-সংক্রান্তিতে উৎসব শেষ হয়। চড়ক-উৎসব এককালে কলকাতা শহরে খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হত। কলকাতা শহরে এই উৎসবের উত্তেজনা ক্রমেই হ্রাসের দিকে চলেছে। ঢাকের বাদ্য আগেকার মতো আর শোনা যায় না। সন্ন্যাসীদের দল বেঁধে 'জয় বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে' ধ্বনিও আগের তুলনায় কম শোনা যায়। চড়ক উপলক্ষে সেকালে কলকাতার বিভিন্ন পল্লীতে মেলা বসত। আজকাল সেরকম মেলা খুব কমই বসে। সারা চৈত্রমাস সন্ন্যাসীর দল কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা ধরে যাতায়াত করত। কালীঘাট এবং গঙ্গার ধারে সন্ন্যাসীর ভিড় দেখা যেত। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সঙ বের হত।

সেকালে কলকাতা শহরের সাধারণ মানুষ সঙের রসাত্মক ছড়া ও গান শুনে মুগ্ধ হত। অনেকে বলেন, গাজন-উৎসব আর হর-কালীর বিবাহ-উৎসব একই অনুষ্ঠান। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। সন্ন্যাসীদের গর্জন থেকে 'গাজন' শব্দের উৎপত্তি।

৯ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ বৈশাখ, ১৩৩২, (১৪ এপ্রিল, ১৯২৫)

১০ অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৩৫৩), পৃষ্ঠা ৯০

বাংলাদেশে আর-একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে বাণরাজা শিবঠাকুরের তপস্যা করেছিলেন। সেই কারণে শিবভক্তরা প্রতি বছর চৈত্র মাসে শিব-ঠাকুরের আরাধনা করতেন।

চড়ক প্রসঙ্গে রামকমল সেন[১১] লিখেছেন, "The word *charak* is derived from *chakra* or *charaka*, which means a circle, and s used to signify moving or swinging in a circular direction ; Charak sanya'sa implies leaving off worldly business, living ıbstemiously, observing austerities, for the propitiation of Śiva. It is a festival improperly termed by many Charak Puja, perhaps from the notion that every ceremony observed y the Hindus of Bengal, is a puja or religious worship ; nd whether it be performed by a *muchi* or *chandala*, is onsidered as Hinduism, and the whole body of the Hindus re charged with the absurdity of the act.

"There are two kinds of Sanya'sas, called Siva Sanya'sa, nd Dherma Sanya'sa ; the first is celebrated in the month f Chaitra, and the second in Baisa'kha ; the people who ractise these Sanya'sas are termed Sanya'sis, and the priest ho presides in the ceremony is called a Gajaneya' :ahman : the Charak festival is also called *Gajana*, (*Ga'* *Grama*, Village ; *jana*, people,) being observed by the llagers. There are several ranks amongst the Sanya'sis, ch as *Mu'la* or head ; *Dhula*, or subordinate ; Sain, or llowers. The time occupied by the Charak Sanya'sa is whole month, and that of the Dherma is a fortnight ; ring this time the Sanya'sis live abstemiously, and observe rious ceremonies to be noticed below."

সেকালে সন্ন্যাসীরা শরীরে লোহার বাণ বড়শি বিদ্ধ করত। সন্ন্যাসীদের র থেকে অজস্র ধারায় রক্ত বের হত। অনেকে ধনুষ্টংকার রোগে মারা । সরকার আইন করে উক্ত প্রথা বন্ধ করেন।

১১ Ram Comul Sen, A short Account of the Charak Puja ceremonies, a Description of the Implements used, *Journal of the Asiatic Society*, mber, 1833, No. 24, page 609

প্রায় একশো বছর আগে কলকাতার সন্ন্যাসীরা খুব ভোরবেলায় কালীঘাটে যেত। কালীঘাটে স্নান করে শরীরে বাণ বিদ্ধ করত। অনেকে জিহ্বা টেনে তার মধ্যে সূক্ষ্ম লোহার শলাকা বিদ্ধ করে নৃত্য করত। সেকালে প্রায় প্রতি পল্লীতে এবং প্রত্যেক বাজারে গাজন হত। সন্ন্যাসীর দল কালীঘাট থেকে বেরিয়ে শহরের প্রায় প্রত্যেক শিবমন্দিরের সামনে নৃত্য করত। অনেকে দুটি বালককে হর-গৌরী সাজাত।

চড়ক-সংক্রান্তি প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[১২] লিখেছেন, "তাই প্রগাঢ় রসবিৎ হিন্দুগণ আজ চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সংসারের সং বাহির করিয়া থাকেন। এ যে কেবল সং-এর খেলা, এ যে কেবল ব্যঙ্গ, কেবল বিদ্রূপ, নিয়তির সহিত কেবল উপহাস, সেইটুকু বুঝাইবার জন্য আজ সংক্রান্তির সং যোটান হয়। দেখ দেখ ঐ অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল-স্বরূপ চড়ক-দণ্ডের চক্রের উপর দড়ি বাঁধিয়া কত লোক ঘুরিতেছে। কেহ পিঠ ফুঁড়িয়াছে, কেহ জিভ্ ফুঁড়িয়াছে, কেহ বা হস্ত-পদ বদ্ধ হইয়া কেবল ঘুরিতেছে। দে-পাক, দে-পাক, কেবল পাক দিতেছে, আর পাক খাইতেছে।"

চড়ক প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[১৩] লিখেছেন, "The Cadak festival is associated with the vernal Equinox. The ceremony begins a week before the end of the month of Caitra (March-April) and culminates on the last day of that month, which also marks the close of the year, in Bengal. This date is known as the day of crossing of the equator (*mahavisuba samkranti*). Actually it comes after the day of the vernal equinox by about three weeks. The name, however, indicates clearly the association with the equinoctial day which once did coincide with this date. The end of the year in Bengal appears in course of time to have lagged behind to this extent. The traditional origin of the festival is that on this date King Vāṇa in order to please Mahādeva, drew blood from his body as an offering

১২ অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), বাঙ্গালীর পূজা-পার্বণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৫৩)

১৩ K. P. Chattopadhyay, The Cadak Festival in Bengal, *Journal of The Asiatic Society of Bengal*, Letters, vol. I, 1935. No. 3, page 397

and propitiated him by dances (along with friends) which are favoured by Him."

হুতোম প্যাঁচা[১৪] কলকাতার চড়ক-পার্বণ প্রসঙ্গে এইরূপ উল্লেখ করেছেন—"কলিকাতা সহরের চারদিকেই ঢাকের বাজ্‌না শোনা যাচ্চে, চড়্‌কীর পিঠ সড়্‌ সড়্‌ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে;—সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাথায় জরির টুপি, কোমরে চন্দ্রহার, সিপাই-পেড়ে ঢাকাই শাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরের ছোপান গামছা কাঁধে বিল্বপত্র বাঁধা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজন।"

চৈত্র-সংক্রান্তির পরের দিন পয়লা বৈশাখ। নতুন বছরের শুরু। সেই কারণেই সেকালের মানুষ চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সঙের খেলায় মাতামাতি করত। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে এক অজ্ঞাত ভবিষ্যৎকে আনন্দের সঙ্গে আহ্বান করত।

বাংলাদেশে অন্য সময়েও সঙ বের হত। যাত্রা-আসরে সঙের নাচ-গানের ব্যবস্থা থাকত। সেকালের সঙ প্রসঙ্গে আর-একটি গ্রন্থে[১৫] উল্লেখ আছে, তা এখানে উদ্ধৃত করছি: "সেকালের যাত্রারম্ভে ভিস্তির সঙের পরেই মেথরের সঙ থাকিত—কালুয়া ভুলুয়া এবং মেথরানী।"

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৫৬-১৩১৭) ছেলেবেলায় সঙ সেজে অভিনয় করেছিলেন। একটি গ্রন্থে[১৬] এইরূপ উল্লেখ আছে যে, "ইন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই রসিক ও সপ্রতিভ ছিলেন। গল্প আছে যে, তাঁহাদের গ্রামে এক যাত্রার দল আসিয়াছিল। সেকালের যাত্রারম্ভে "ভিস্তির সঙ" এক উপভোগ্য অভিনয় থাকিত। সে দলের যে ব্যক্তি ভিস্তি সাজিত সে জ্বরে কাতর হইয়া পড়ায় সেদিন ভিস্তি বাদ দিয়া যাত্রা হইবে, এইরূপ কথা উঠিলে, ইন্দ্রনাথ তখন স্কুলের ছাত্র ও বাড়িতে ছিলেন, ভিস্তি সাজিয়া ও ভিস্তির গান গাহিতে সাহসী হইলেন, এবং ভিস্তি সাজিয়া আসরে নামিয়া গাহিয়া সে রাত্রির কাজ চালাইয়া দিলেন।"

সেকালে কলকাতা শহরে বিদেশীদের জন্যও সঙের মঞ্চাভিনয়ের রেওয়াজ ছিল। বিদেশীরাও সঙ নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। ১৭৯২ সালের

১৪ কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, সপ্তম সংস্করণ (১৩২১), পৃষ্ঠা ৯

১৫ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, সন ১৩৩২ সাল, পৃষ্ঠা ১৪

১৬ পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৭

৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতায় এমনি এক অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি[১৭] প্রকাশিত হয়েছিল :

"The 9th February 1792.

Calcutta Theatre, this evening, the 9th of February 1792, will be performed a new Pantomime called Mungo in Freedom, or Harlequin Fortunate, with amendment. Boxes 1 gold Mohur, Pit 12 Rupees, and gallery Six Rupees."

১৭ W. S. Seton Karr, *Selections from Calcutta Gazettes*, vol. II, page 584

২ ॥ সঙ ও নগর-সংকীর্তন

কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের খাতায় শহরের প্রায় সব অলিগলির নামকরণ হয়ে অনেকদিন আগে তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু পৌর-প্রতিষ্ঠানের সরকারী নাম ছাড়াও সেকালের কলকাতার বাসিন্দাদের কাছে অধিকাংশ পল্লীর আর-একটা করে আটপৌরে নাম ছিল। যেমন— আহিরীটোলা, কাঁসারীপাড়া, জেলেপাড়া, বেনেপাড়া, হাড়ীপাড়া, যুগীপাড়া, ইত্যাদি। এইসব আটপৌরে নাম থেকে অমুক পাড়া লেন বা রোড প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছিল এবং এগুলি আজও পুরাতন পল্লীর স্মৃতি বহন করছে।

সেকালে আহিরীটোলা বলতে বোঝাত উত্তর কলকাতার একটা বিরাট এলাকা। কাঁসারীপাড়া বলতে বোঝাত বর্তমান শ্রীমানিবাজারের কাছ থেকে শুরু করে সিমলা অঞ্চল সহ চিৎপুর পর্যন্ত অলিগলি-যুক্ত বিস্তীর্ণ এলাকা। ঠিক এই ভাবেই জেলেপাড়া বলতে বোঝাত বৌবাজার এবং ক্রীক রো-র মধ্যবর্তী পল্লী-অঞ্চল। শ্রী উপেন্দ্রনাথ বসু[১] কলকাতার ক্রীক রো প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "প্রাচীন কলিকাতার একটি ক্রীক বা খাল হইতে এই রাস্তার নাম ক্রীক রো হইয়াছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া এই রাস্তা পূর্ব্ব দিকে সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত গিয়াছে। বহু পূর্ব্বে একটি খাল, ক্রীক রো, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, বেন্টিং স্ট্রীট, হেষ্টিংস স্ট্রীট প্রভৃতি স্থান দিয়া গঙ্গায় পড়িত। শহরের আবর্জ্জনা দিয়া এই খাল ভরাট করিয়া এই রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে। ক্রীক রো-র নিকটের অঞ্চলকে ডিঙ্গা-ভাঙ্গা বলা হয়। ইহা হইতে মনে হয় বর্ষাকালে এই খালে স্রোত খুব প্রবল হইত এবং তাহাতে কখন কখন নৌকা ভাঙ্গিয়া বা ডুবিয়া যাইত। ক্রীক রো-র উত্তরে জেলিয়াপাড়া লেন এবং এই অঞ্চলে অনেক জেলে পরিবার বহুদিন হইতে বাস করিতেছে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"The fish follows the water and the fisherman follows the fish"—অর্থাৎ নদী, খাল, বিল ইত্যাদি যেদিকে যায়, মাছও

১ শ্রী উপেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫৪), পৃষ্ঠা ১৩৮

সেইদিকে যায় এবং মাছ যেদিকে যায়, জেলেরা সেইদিকে যায়। ক্রীক রো-র উত্তরে জেলেদের বসতি হইতে মনে হয় ক্রীক রো-র খালটি এক সময়ে মৎস্যে পরিপূর্ণ ছিল।"

প্রায় একশো বছর আগে কলকাতার সিমলা কাঁসারীপাড়া অঞ্চলে অনেকগুলি পাঠশালা ছিল। গুরু মহাশয়ের কাছে ছেলেরা লেখাপড়া শিখতো। প্রতি বছর মকর-সংক্রান্তির দিন পাঠশালার ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে বাদ্যযন্ত্র এবং নিশানাদি নিয়ে গঙ্গার স্তব গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নানে যেত। পাঠশালার ছাত্রদের সঙ্গে পল্লীর যুবক এবং বৃদ্ধরাও যোগ দিতেন। ওই সময় নগর-সংকীর্তনে ওই অঞ্চল মুখরিত হয়ে উঠত। কাঁসারীপাড়ার বিভিন্ন পাঠশালার ছাত্রদের জন্য নিম্নলিখিত তিনটি গান ১২৯৩ সালে রচিত হয়েছিল।

(১)

এ মা, জহ্নু-কন্যা জগৎ মান্যা, তব গুণে ধরা ধন্যা,
পতিত পাবনি !
ত্রিপুরারি-জটা হ'তে, ত্রিধারা রূপে ত্রিপথে,
ত্রিপুর তারিণি !
করুণাময়ি মা ! ত্রিতাপ হারিণি !

(২)

ত্বয়ি গো মা কাল-ভয় বারিণ-তারিণি !
শমন দমন, কারণ পাবন জীবন রূপিনি !
প্রবল বিমল জল চপল তরঙ্গে, সুরঙ্গে মিলিতাঙ্গ
জলনিধি সঙ্গে,
সগর-সন্ততি উদ্ধার প্রসঙ্গে, তারিলে ত্রিলোক
হ'য়ে সুরধুনী !
—ইত্যাদি

(৩)

আয় মা তারিণি !
সুখদা, মোক্ষদা, জ্ঞানদা, ত্বং হি বরদা ;
ভক্তিপ্রদা, মুক্তিপ্রদা, সুরধুনী !
—ইত্যাদি

সেকালে বৌবাজার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত বহু পল্লীতে দোলযাত্রার দিন নগর-সংকীর্তন বের হত। বহু দল রূপচাঁদ পক্ষীর লেখা গান গাইতেন। রূপচাঁদ পক্ষীর একটি গানের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

হোরি খেলিছে শ্রীহরি, সহ রাধাপ্যারী,
কুঙ্কুম-ধুম, শ্যাম অঙ্গভরি ॥
পুষ্পমালা, হিন্দোলা সাজায়ে ব্রজনারী,
রাই শ্যাম, অনুপম, দোলে তদুপরি ॥

—ইত্যাদি

দোলযাত্রা ছাড়াও রথযাত্রা প্রভৃতি পূজা-পার্বণে, কখনও রামনবমীর দিনে, কোথাও বা শারদীয়া পূজার পূর্বে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহ নগর-সংকীর্তনের দল বের হত। বিভিন্ন পল্লীতে হরিসভার আয়োজন হত এবং সেই উপলক্ষে অনেক জায়গায় অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের ব্যবস্থা থাকত এবং এইসব হরিসভা থেকেও নগর-সংকীর্তনের দল বের হত। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সেকালে কলকাতার রাস্তার দু-দিকেই খোলা নর্দমা ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী[২] লিখেছেন, "কোন কোনও নর্দমার পরিসর আট-দশ হাতের অধিক ছিল।" পানীয় জলের জন্য নির্ভর করতে হত বাড়ির কুয়া কিংবা পাড়ার কোন দীঘির ওপর। প্রাচীন কলকাতার প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই অসংখ্য পুকুর ও ডোবা ছিল। গ্রীষ্মকালে বহু পুকুরের জল শুকিয়ে যেত। শহরের অধিবাসীদের মধ্যে জলের জন্য হাহাকার পড়ত। শুধু তাই নয়, নানা কারণে জলও দূষিত হত। এককালে কলকাতার লালদীঘির জল ছিল খুব সুপেয়। বহুদূর থেকে জলবাহকরা এসে লালদীঘির জল নিয়ে যেত। লালদীঘি প্রসঙ্গে সেকালের একটি ইংরাজী সাময়িক পত্রিকায়[৩] এইরূপ উল্লেখ আছে :

"*Tank Square*, Last century, in the middle of the city, covers upwards of twenty-five acres of ground. Stavorinus states: 'It was dug by order of Government, to provide the inhabitants of calcutta with water, which is very sweet and pleasant. The number of springs which it contains

২ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯০৯), পৃষ্ঠা ৫৪

৩ *The Calcutta Review*, vol. XVIII, 1852, page 294

makes the water in it nearly always on the same level. It is railed round, no one may wash in it."

এই লালদীঘির জল যাতে দূষিত না হয় তার জন্য দীঘির ধারে পুলিশ মোতায়েন থাকত। সহজেই অনুমান করা যায় যে তখনকার কলকাতায় ডাক্তার এবং কবিরাজের যথেষ্ট অভাব ছিল। বিভিন্ন পল্লীতে বসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোগ ব্যাপক আকারে দেখা দিলে হতাশায় ব্যাকুল হয়ে মানুষ যখন বাঁচার কোন পথ খুঁজে পেত না, সেই সময় রোগের ভয়ে অনেকে দেবতাকে স্মরণ করত এবং সেই সঙ্গে বহু পল্লী থেকে নগর-সংকীর্তনও বের হত।

১৮৮৬ সালের ২৪ মে (১২৯৩ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) তারিখে কলকাতা শহরে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহা-সমারোহে নগর-সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নানা কারণে এই দিনটি একটি স্মরণীয় দিন। সে-কারণে প্রথমেই এর গোড়ার কথায় আসা যাক—

সে-সময়কার কলকাতা শহরে বহু 'কালীস্থান' ছিল। কালীস্থান অর্থাৎ যেখানে কালীমূর্তির সামনে ছাগ বলি দিয়ে সেই মাংস বিক্রি করা হত ; এবং বলা বাহুল্য, উক্ত মাংস শুদ্ধ মাংস রূপে গণ্য হত। ১৮৭৭-৭৮ সালে কলকাতার পৌর-কর্তৃপক্ষের কাছে অনেকগুলি আবেদনপত্রে জানানো হয়েছিল যে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ-হেতু এইসব কালীস্থানের মাংস বিক্রয় অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হোক। এর ফলে তৎকালীন পৌরসভা এই দোকানগুলি বন্ধ করে দেবার জন্য আইনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। ১৮৮০ সালে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যে-সব কালীস্থান অর্থাৎ যেখানে নিয়মিত কালীমূর্তির উপাসনা হয়, সেইসব দেবালয় উক্ত আইনের আওতার বাইরে। কিন্তু ১৮৮৪ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, যদি অখাদ্য মাংস বিক্রি করা বন্ধ করতে হয় তাহলে প্রতিটি 'কালীস্থান' নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করতে হবে। সমস্ত কালীস্থানেই যাতে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা থাকে সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসে উক্ত আইনের একটি উপধারা জারি করা হয়। এই উপধারা অনুযায়ী কমিশনারগণের বিনা অনুমতিতে কোন কালীস্থানে ছাগ-বলি দেওয়া যাবে না, এবং তৎকালীন স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্মকর্তা (Health officer) এই বিষয়ের তদারক করার জন্য বহু লোককে নিযুক্ত করতে হবে মনে করে অনুমতি-পত্র দিতে নারাজ হন।

১৮৮৫-৮৬ সালে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, শহরের কালীস্থানগুলিকে দুইটি কেন্দ্রে ভাগ করা হোক। একটি কেন্দ্র শহরের উত্তর দিকে, এবং অপরটি শহরের পূর্বদিকে স্থাপিত হোক, যেখানে প্রথানুযায়ী এবং পৌর-কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ছাগ বলি দেওয়া যেতে পারে। প্রস্তাব করা হয় যে, এর জন্ত বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে দুইটি গৃহ নির্মাণ করা হোক। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই একটি অঞ্চলের বাসিন্দারা চিঠিপত্র লিখে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন বাড়ি তৈরির পরিকল্পনাটি বর্জিত হয়। ঠিক হয় যে, প্রকৃত কালীমন্দির অর্থাৎ যেখানে নিয়মিত কালীপূজা ও পূজার অঙ্গস্বরূপ ছাগ-বলি দেওয়া হয়, তার সঙ্গে তথাকথিত কালীস্থানের (অর্থাৎ যা কসাইখানার নামান্তর মাত্র) প্রভেদ স্বীকার করা। কিন্তু পরিদর্শকমণ্ডলীর পক্ষে কোন্‌টি আসল দেবীস্থান এবং কোন্‌টি আসলে কসাইখানা মাত্র তা নির্ণয় করা বহু ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়েছিল।

কালীস্থান-প্রসঙ্গে S. W. Goode[৪] এইরূপ উল্লেখ করেছেন :

"*Kalisthans*—Calcutta at one time abounded in *Kalisthans*, *i.e.* places where goat's meat was sold in the presence of an image of Kali, to show that the animal had been consecrated to the goddess before it was sacrificed.

In 1877-78 memorials were submitted to the authorities, urging the suppression of these places, where slaughtering was carried on under insanitary conditions, and the flesh exposed in an unsightly manner. Some rules were framed by the Corporation to bring these places under supervision, but they proved ineffectual. In 1880 it was decided that *bona fide* Kalisthāns, at which worship was carried on, were protected from the operation of the Act, but in 1884 the Commissioners recognised that the inspection of all Kalisthāns was necessary to prevent the sale of unwholesome meat, and that it was essential to have all such places connected with the drainage system.

In November 1884 a bye-law was passed prohibiting slaughter at any place not approved for the purpose by the

৪ S. W. Goode, *Municipal Calcutta, its Institutions in their Origin and Growth*, (1916), page 308

Commissioners, and the Health officer declined to license the Kalisthāns, for the efficient inspection of which a large staff would have been required.

In 1885-86 it was decided to concentrate all the existing Kalisthāns in two places—one in the north and one in the east of town—where goats might be slaughtered with the prescribed rites under conditions approved by the Municipality. It was proposed to erect two buildings for the purpose at a cost of Rs. 20,000, but a memorial against the scheme was at once drawn up by the people residing near one of the selected sites.

The project was abandoned, and it was decided to distinguish between the *bonā fide* Kalisthāns, where worship was carried on and goats duly consecrated to the goddess, and the sham Kalisthāns, which were in fact mere slaughter-houses. It was however impossible for the inspecting staff in the majority of cases to establish the distinction, and the control of the Municipality proved quite illusory."

সে-সময় 'কালীস্থান' নিয়ে সারা কলকাতা শহরে যে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার বিবরণ আমরা সেকালের সংবাদপত্র থেকে জানতে পারি। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন একটি ইংরাজী সংবাদপত্রের[৫] সম্পাদকীয় স্তম্ভের কিয়দংশের মর্মানুবাদ এখানে প্রদত্ত হল :

"কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রিটের কসাইখানার বিরোধিতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে রক্ষণশীল হিন্দুগণ এই স্থানের মাংস খাইতে আপত্তি করিবেন। কারণ তাঁহারা বলিদান করা ছাগের মাংস আহার করেন। জনৈক কমিশনার অভিমত প্রকাশ করেন যে এই যুক্তি খাটে না, যেহেতু কর্পোরেশনের আইনে এই বিষয়ে সবিশেষ ব্যবস্থা আছে। তিনি বলেন যে এই পরিকল্পিত কসাইখানায় কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। দৈনিক পূজার জন্য ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত হইবেন। একজন হিন্দু কামারকে ছাগ ও ভেড়া ঠিক কালীমূর্তির সামনে বিধিমতো বলি দিবার জন্য নিযুক্ত করা হইবে। যদি এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইবে ঠিক হয় তাহা হইলে

৫ ***The Hindoo Patriot***, May 10, 1886, page 221

আমাদের আপত্তি প্রত্যাহার করিব। কিন্তু আপত্তি করার হেতু যে, ইহা হয়ত ঘটিয়া উঠিবে না।”

কারণ প্রসঙ্গে উক্ত সংবাদপত্র[৬] লিখেছিলেন—

"We never could think for a moment that an institution of which the majority of managers are other than Hindus, could possibly take in hand the management of an idol-worshipping establishment. Nor could we make up our mind about Mr. Harrison assuming the role of the head *sebait* in it."

কালীস্থান প্রসঙ্গে আর-একটি সংবাদপত্রে[৭] যা প্রকাশিত হয়েছিল তা হল :

"The meat-eating Hindoo Citizens have addressed a letter to the Chairman of the Municipal Corporation, strongly condemning the "wretched so-called *Kalisthans*", scattered all over the town, and urging the necessity of establishing certain places where goats and kids may be sacrificed under strict Municipal supervision. The *Kalisthans*, they urge, supply the people with diseased, unwholesome, and suspicious meat, which do them more harm than good. Some improvements of the existing *Kalisthans* are certainly required, and instead of opening regular slaughter houses in the heart of the town, we think the Commissioners may very well take a certain number of these *Kalisthans* under their control and supervise their works, so that they may not supply bad meat to the public."

সেকালের আরও একটি সংবাদপত্র[৮] লিখেছিলেন :

"At a Special General Meeting of the Corporation, held on Saturday last, the Commissioners resolved upon abandoning the project for erecting a slaughter-house in Cornwallis street. The only Commissioners who supported the project and voted in favour of giving gratuitous

৬ পূর্বে উল্লিখিত সংবাদপত্র

৭ *The Amrita Bazar Patrika*, May 13, 1886, page 7

৮ *The Hindoo Patriot*, May 17, 1886, page 234

offence to the religious feeling of their country-men, annoyance and trouble were, we hear, Babus Kalinath Mitra and Surendra Nath Banerji. The European Corporators deserve our cordial thanks for the part they took in the matter."

আলোচ্য বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কলকাতার টাউন হলে এই সময়ে কর্পোরেশনের একটি সভা বসেছিল। সে-সময় কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন এইচ. এল. হ্যারিসন। সেদিনের সভায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার[৯] কালীস্থান প্রসঙ্গে বলেন, "That no slaughter-houses be erected, or allowed to be erected, by the Municipality within the present limits of Calcutta, and that the so-called *Kalisthans*, where there is no regular worship, and where goats are not duly consecreated and sacrificed, be treated as slaughter-house."

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার[১০] আরও বলেছিলেন, "the project of erecting slaughter-houses by the Municipality in the town, for the benefit of the public, had been decided upon by the Town Council, and he had to confess that, along with his Hindoo colleagues, he had given his assent. They were oblivious of the past action of the Municipality, by which all slaughter-houses within the town were rightly and properly abolished. For the last 30 years at least, the opinion of the greatest Sanitary authorities in England had been that slaughter-houses should not be allowed in the metropolis. He was strongly opposed to the project, not only the (*sic*) grounds of sanitation, but also of public morality, decency, and propriety, and he strongly urged that it should be abandoned. He would appeal to his European colleagues, meat eaters as they were, to say if they would like to have slaughter-houses near where they lived, and be exposed to the repugnant sight daily. He, however, had a weightier reason, and that was the wanton offending of a large section of the Hindoo community. He concluded by

৯ *The Indian Daily News*, Monday, May 17, 1886

১০ পূর্বে উল্লিখিত সংবাদপত্র

saying that it was a part of his religion to tolerate the religious views of others, and he urged on the Commissioners, of all sects, on the grounds of sanitation, public morality, decency, propriety, and universal toleration for all religious, to support him in abandoning the project of erecting slaughter-houses in the town."

পূর্বে উল্লিখিত সংবাদপত্রে[১১] উল্লেখ আছে যে, "Mr. Simmonds, in the absence of Mr. Apcar, who was to have seconded the motion, said he had great pleasure in doing so, and he entirely concurred with all that the mover had said on sanitary grounds. It was distinctly a retrograde movement to have slaughter-houses erected as proposed. There were slaughter-houses already in the suburbs which properly looked after and maintained by the Municipality, and if it was a necessity, a slaughter-house for the benefit of such of the Hindoo community who desired it might be constructed in the suburbs, from where they could get their supply of meat as required. A slaughter-house in the Northern Division of the town was, he thought on sanitary grounds, as objectionable as well could be."

কর্পোরেশনের উক্ত সভায় মিস্টার সুইন্‌হোর[১২] মন্তব্য থেকে জানা যায়, "Mr. Swinhoe was strongly opposed to the amendment, and objected to slaughter-houses being erected in the town by the Municipality. If, he said the orthodox Hindoos would not eat meat unless the goats were first offered to *Kali*, such slaughter-house could not be managed by the Municipality, who could not have sham *Kalies* or sham Brahmins to make the necessary sacrifice."

মিস্টার আপ্‌কার[১৩] বলেছিলেন, "it was evident the orthodox Hindoos did not require an outsider to defend them. He fully supported and sympathised with those who objected to slaughter-houses in the town, and thought it most unpleasant

১১ *The Indian Daily News*, Monday, May 17, 1886

১২ পূর্বে উল্লিখিত সংবাদপত্র

১৩ পূর্বে উল্লিখিত সংবাদপত্র

to have so-called Kalisthans in the heart of the city. It would be a distinct retrograde movement to have slaughter-houses instituted in Calcutta, and it should not be allowed."

ওই সংবাদপত্রে[১৪] আরও উল্লেখ আছে যে, "Moulvie Budrudin Hyder suggested that a slaughter-house in accordance with Hindoo rites and customs should be erected at Tangra, alongside the other slaughter-houses, which would meet the difficulty for those Hindoos who desired to eat meat."

মৌলবী সিরাজ-উল্-ইসলামের[১৫] অভিমত—"He did not see why they should ignore the feeling of the Hindoo community, and there was no necessity or want shown for erecting slaughter-houses in the town. They might abolish Kalisthans, but it did not follow that slaughter-houses within the town would be a necessity, as they could be erected out of town, and in view of the strong protest from many influential and respectable Hindoos, he supported the original motion."

রক্ষণশীল হিন্দুগণের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, কালীমন্দির ও কসাই-খানাকে তালগোল পাকিয়ে এক করার চেষ্টা যেন না হয়। মাংস বিক্রি হবে এই উদ্দেশ্যে কালীমন্দিরে বলি দেওয়া হয় না। বলি হয় পূজার এক বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে। কসাইখানাকে কালীস্থান বললে তা কালীমন্দিরে রূপান্তরিত হয় না; বরং কসাইখানা যাতে সুষ্ঠুরূপে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারে তার জন্য বিধি-নিয়ম প্রণয়ন করা হোক।

রক্ষণশীল হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে সভার আয়োজন করলেন ও বহুজনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে প্রতিবাদপত্র লিখে পাঠালেন। নানাভাবে আন্দোলন চলেছিল, এমন কি শোনা যায়, সঙের দল ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক ছড়া কাটতে-কাটতে পৌর-কমিশনারদের বাড়ির সামনে সমবেত হয়েছিল এবং এর ফলে তাঁরা অর্থাৎ রক্ষণশীল হিন্দুরা পরে কর্পোরেশনের উক্ত প্রস্তাব রহিত করতে সমর্থ হন। সিমলা ভট্টাচার্যের বাগান নামক স্থানে উক্ত কসাইখানা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রস্তাব ছিল। সেই স্থান থেকে ১৮৮৬ সালের ২৪ মে তারিখে সঙের দল ও নগর-সংকীর্তন

১৪ পূর্বে উল্লিখিত সংবাদপত্র

১৫ পূর্বে উল্লিখিত সংবাদপত্র

বের করা হয়েছিল। আন্দোলনের সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সমবেতভাবে সেইসব মানুষ সেদিন নিম্নলিখিত গানটি গেয়েছিলেন :

(বাউল সুর—তাল এক তালা)

আয়্ রে ভাই সবাই মিলে, বাহু তুলে, হরি ব'লে নাচি চল !
সহরে কসাই-কালী—জবাই-বলি—ঢলাঢলি
যত ছিল ;
শ্রীহরির কৃপা-বশে, এক্ বাতাসে,
তুলার্ মতন্ উড়ে গেল !
যত সব্ ষণ্ডামার্ক, ঘোর বিপক্ষ,
কুতর্ক জাল পেতেছিল ;
তারা সেই কসাই-কালী—কলির্ চেলা
চূণ কালি লাভ্ তাইতে হ'লো !
শুভ জন্মদিন্ আজ্ মহারাণীর নাম্ গেয়ে
জয়-নিশান্ তোলো !
ওরে ভাই, তাঁর্ রাজত্বে, ধর্ম্মের পথে,
কার্ সাধ্য গোল্ বাধায় বল ?
ওহে, এই ক'রো দয়াল্ হরি !
রাজ্যেশ্বরী কুইন্ মাকে রেখো ভাল !
আর যারা হিঁদুর্ ছেলে, যায় কুচেলে,
তাদের মন্ সুপথে চালো।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই সময় কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার হেন্‌রি হ্যারিসন। তাঁর নামেই হ্যারিসন রোডের নামকরণ করা হয়েছিল। হ্যারিসন রোড প্রসঙ্গে মিস্টার কটন্[১৬] লিখেছেন :

"It is of the uniform breadth of 75 feet and is named after Sir Henry Harrison, the Chairman of the Corporation, by whom the scheme was inaugurated and matured. Begun in December, 1889, it was completed in 1892, and many an overcrowded tenement and narrow festering lane has been swept away by its construction."

১৬ H. E. A. Cotton, *Calcutta Old and New*, 1907, page 345

সেদিন সিমলার কসাইখানার প্রস্তাব রহিত করার জন্ম কর্পোরেশনের সভায় মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সদস্যরাও হিন্দু সদস্যদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেকালের সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠা থেকে এইরূপ সাম্প্রদায়িক প্রীতির পরিচয় আরও চোখে পড়বে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, অর্থাৎ ১৯২৯ সালে বৃন্দাবনের কসাইখানা উচ্ছেদের জন্য সিরাজগঞ্জের মুসলিম তরুণেরা আন্দোলন করেছিলেন এবং সরকারের নিকট প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন। সংবাদটি[১৭] এইরূপ :

সাম্প্রদায়িক প্রীতির পরিচয়

বৃন্দাবনের কসাইখানা

উচ্ছেদ

মুসলিম তরুণ সঙ্ঘের প্রস্তাব

সিরাজগঞ্জ, ৩রা মে

মুসলিম তরুণ সঙ্ঘের একটি বিশেষ বৈঠকে মৌলানা সিরাজির সভাপতিত্বে বৃন্দাবনের কসাইখানা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে বৃন্দাবন হইতে কসাইখানা উচ্ছেদের জন্ম আন্দোলন করা হইতেছিল। যুক্তপ্রদেশের সরকার কিন্তু বৃন্দাবন হইতে এই কসাইখানা তুলিয়া দিবার প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। যুক্তপ্রদেশের সরকারের এই অসম্মতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া মুসলিম তরুণ সঙ্ঘ বলেন যে, মুসলমান সম্রাটেরা যেখানে বিশেষভাবে পশু হত্যা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন বৈষ্ণবদের সেই মহাতীর্থ হইতে কসাইখানা তুলিয়া দিতে অস্বীকার করিয়া সরকার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মনে আঘাত দিয়াছেন। —ফ্রী প্রেস

১৭ বঙ্গবাণী, কলিকাতা, রবিবার, ২২ বৈশাখ, ১৩৩৬, প্রথম পৃষ্ঠা

৩।। কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের সঙ

কাঁসারীপাড়ার সঙ

বর্তমান কলকাতা আর সেকালের কলকাতায় অনেক প্রভেদ। কলকাতা শহর নানাভাবে বদলে গেছে। চারিদিকে প্রাসাদের পর প্রাসাদ নির্মিত হয়ে এক বিরাট প্রাসাদ-নগরী গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের পিছনে আছে অনেক ইতিহাস। পরিবর্তন খুব দ্রুতই হয়েছে। আর এই পরিবর্তনের ফলে অনিবার্যভাবে বদলে গেছে পথ-ঘাট। বদলে গেছে মানুষের রুচি। বদলে গেছে আমোদ-প্রমোদের বিষয়বস্তু। বদলে গেছে অনেক-কিছু। সেকালের কলকাতায় চলচ্চিত্র ছিল না। বর্তমানের মতো এত রঙ্গশালাও ছিল না। তা ছাড়া সেকালে মাঠে মাচা বেঁধে মঞ্চ তৈরি করে এত অভিনয়াদি হত না। সেকালের মানুষ যাত্রা, পাঁচালী, কবির লড়াই, পুতুল-নাচ, ঘোড়া-নাচ, মুখোশ-নাচ আর সঙের মিছিল দেখে আমোদ-আহ্লাদ করত। কলকাতার বিভিন্ন পল্লী থেকে সঙের মিছিল বের হত। উত্তর কলকাতার বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট থেকে যে-সঙ বের হত তাকে বলা হত 'কাঁসারীপাড়ার সঙ'। কাঁসারীপাড়ার পল্লীবাসীর উদ্যোগে ও বহু অর্থব্যয়ে প্রতি বছর সঙ বের হত। সঙের মিছিলে পরিহাসাত্মক ও নানা রসোদ্দীপক ছোট-ছোট নাটিকা অভিনয় করা হত। তা ছাড়া থাকত গান ও ছড়া।

কাঁসারীপাড়ার সঙ প্রসঙ্গে ১৫ এপ্রিল ১৮৭২ সালের *The Hindoo Patriot* পত্রিকায় যা লেখা হয়েছিল তা এখানে উদ্ধৃত হল: **"The Braziers of Baranassy Ghose's Street annually celebrate the festival of the Churruck Puja by making a procession through the populous parts of the Native Town, consisting of singing parties, itinerant theatricals, and comical exhibitions. All Native Calcutta is out in the streets and on the house-tops to witness this grand procession, which generally occupies about ten hours to make a circuit of two miles. Every body enjoys the fun and pleasure, which cost the spectators**

nothing, and we are glad that while the barbarities of the churruck have been suppressed, this innocent popular amusement survives. The arrangements made this year were excellent. Looking to the class of people who join this procession, it would not be at all strange if some obscene words and gestures should find expression, but we are glad to be able to testify that there was nothing of the kind in this year's arrangements. There was considerable humour, very broad humour too, but nothing obscene. A most phantastic collection of comicalities was exhibited. A party of water plumbers with tools and instruments, an utter-seller from Persia superbly dressed, a company of bag-menders, an imitation military band playing acoustics upon pipes, drums, and kettle-drums, a corps of Dravidian Brahmins, a washerman washing clothes, an oilman making oil, a fisherman dallying with his sweet-heart, a fast but ruined Babu with a group of flatterers—these were some of the representations, all singing appropriate and humorous songs. There were then mythologic representations of Krishna making love to his milkmaids, of worship at the holy shrine of Gaya, and of adoration to Kartic, both most comically conceived, &c. Some of our social customs and novelties of the day were most effectively caricaturad. The Kulin marriage was exquisite. The new form of marriage under Mr. Stephen's Act was beautifully illustrated. The bridegroom was dressed in pantaloon and chapkan, and the bride in the costume of a Hindustani natch girl and in top-boots, holding a book in her hands. The Priest, who called himself Juggut Guru or Guru's Guru, wore a straw helmet, by reason of which we believe he was dubbed "the man of straw", officiated in the marriage. The ceremony was simple and in keeping with the spirit of the age. The bridegroom declared aloud that 'he was neither a Hindu, Mohomedan, (Urdu !) (for Jew we believe) Christian, Jain, or Buddhist', and the bride made a similar declaration with becoming

modesty. They then informed the priest that they were ready to join their hands, and the latter said—amen! The bridegroom then shook hands with the bride and imprinted a loving kiss on her cheek. The ceremony concluded with a shout from the visitors—"This is the New Form of Marriage!" A meeting of the barbers was represented, who delivered indignation speeches, bitterly complaining that while all other casts were represented in the Town Council, their important guild was not, and passed a resolution requesting the Hindoo Patriot to move the Government to appoint a representative of their body, and on being asked to return a nominee, they elected one called Crore-fucka or the millionaire with the ciphers on the wrong side. The "Sweet work" of the "Anaries" (Honoraries) of Calcutta was also a subject of representation, sitting in judgment upon the "immortal tub", and guaging its delicious contents. Such were the amusements with which the Brazeirs of Baranassy Ghose's Street entertained the lovers of fun and frolic on Wednesday last. These Braziers are a most meritorious class, industrious, self-reliant, united, and thriving, and their every-day life and manners recall to the mind many old associations of the Primitive Hindu"

কাঁসারীপাড়ার সঙ বের হত তারকনাথ প্রামাণিকের উৎসাহে। আরও একজনের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন তৎকালীন হিন্দু সমাজের মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট'এর সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল। তিনিও কাঁসারীপাড়ার সঙ বের করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ[১] তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "সেকালে,—কলিকাতার জেলেপাড়ার সংযাত্রা-উৎপত্তির বহু পূর্ব্বে,—প্রতি চৈত্র-সংক্রান্তির দিন কাঁসারী পাড়ার প্রসিদ্ধ সংযাত্রা বাহির হইত; এই সংযাত্রা-সমবায়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন তারকনাথ [প্রামাণিক] ও কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়। সংযাত্রা দেখিবার নিমিত্ত সাধারণের এরূপ আগ্রহ ছিল যে, সং বাহির হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজপথের সম্মুখস্থ বারান্দাগুলি, দর্শনার্থি-জনসংঘ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া যাইত; ঐ সকল ভাড়া দিয়া গৃহের মালিকগণ প্রচুর অর্থ

১ পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক, পৃষ্ঠা ৬৫

লাভ করিতেন। জনসমুদ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিত।"

উক্ত গ্রন্থে[২] সঙ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ আছে যে, "প্রাচীন-বঙ্গীয়-প্রথার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক হিসাবেই, তারকনাথ এই অনুষ্ঠানের পরিচালক পদ গ্রহণ করেন এবং ইহাকে লোকপ্রিয় করিবার নিমিত্ত আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন।"

বিশেষভাবে নির্মিত একরকম ঘোড়ার গাড়ি করে কাঁসারীপাড়ার সঙ বিভিন্ন পথে ঘুরত। এই গাড়িকে বলা হত 'কাটরা গাড়ি'। উত্তম বসন-ভূষণে বিভূষিত অভিনেতারা যেসব অভিনয় দেখাতেন ও গান গাইতেন তা রসাত্মক ও শিক্ষাপ্রদ বলে গৃহীত হত। ছোট-ছোট নাটিকা এইসব ঘোড়ার গাড়িতে অভিনীত হত।

কাঁসারীপাড়ার সঙ প্রসঙ্গে তৎকালীন একটি পত্রিকায়[৩] উল্লেখ আছে—"প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যদিও তখন বাণ ফোঁড়া প্রচলিত ছিল না, তত্রাচ কাঁসারী-পাড়ার বাবু তারকনাথ প্রামাণিকের উৎসাহে কাঁসারীরা মহাউৎসাহে সঙের মিছিল বাহির করিত। সেই সময় মহাত্মা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে কলিকাতার অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক ও খ্রীষ্টান পাদরী একটি অশ্লীলতা নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন; এই সভার অনুরোধে গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য পথে অশ্লীল সঙ্গীতাদি নিবারণোদ্দেশে দণ্ডবিধির প্রচার করায় ঐ মিছিল বন্ধ হইয়া যায়।" উক্ত পত্রিকায়[৪] আরও উল্লেখ আছে যে, "অমৃত বাজার পত্রিকার ন্যায় সংবাদপত্র এই সভাকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই।"

সেকালে সঙের গানে অশ্লীলতা দোষ দেখিয়ে সঙের মিছিল বন্ধ করার যে চেষ্টা হয়েছিল তার আরও উল্লেখ পাওয়া যায়। একদল যেমন অশ্লীলতা খুঁজে বেড়াতেন, ঠিক তেমনি আর-একদল সঙের মিছিলে কোনরূপ অশ্লীলতা নেই তা দেখাবার চেষ্টা করতেন। এই প্রসঙ্গে সেকালের একটি সাময়িক পত্রিকা[৫] থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

২ পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৬

৩ নব্যভারত, মাঘ, ১৩১০ সাল, পৃষ্ঠা ৫৪২

৪ নব্যভারত, পূর্বে উল্লিখিত খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪২

৫ বসন্তক, ১৮৭২-১৮৭৩ সাল

"একণে সামান্য লোকের আমোদ-আহ্লাদ ও উৎসব তো সকলি একে একে শেষ হইতেছে। একণে যাত্রা নাই, পাঁচালী নাই, কবির তো কথাই নাই। সামান্য লোকেরা কি লইয়া থাকিবেন। কেবল ধাত্তেশ্বরী। আর ছোবড়া টেনে কি দিনপাত হয় ?

সামান্য লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এ সভ্যতা দেখান কেন ?"

উক্ত পত্রিকায়[6] এই মন্তব্যও করা হয়েছে যে, "কাঁসারীপাড়া দিয়া তো কাঁসারীদের সং বাহির হয়, সেখানে তো বাবু কৃষ্ণদাস পাল থাকেন, তিনি কি অসভ্য আর অশ্লীল ?"

কাঁসারীপাড়ার সঙ প্রসঙ্গে ১৮৬৮ সালে ১৩ এপ্রিল তারিখে একটি পত্রিকায়[7] যা প্রকাশিত হয়েছিল তা এখানে উদ্ধৃত হল :

"The Choitra Festivities.

The barbarous churuck has been replaced by two substitutes, one being of a somewhat gross description for the amusement of the mob, and the other of an elevating kind for the delectation of the cultivated classes which we trust will soon become institutions of the land. On Friday last the braziers of Baranassy Ghose's Street, an industrious and self-reliant class, contributed not a little to the amusement of not only the mob but also of the higher classes, by their ingenious and popular representations and caricatures. Their procession which extended over more than a mile started at about 6 A. M. and returned to the head-quarters at 5 P. M. there being continuous music, singing, laughing, pantomiming and what not for nine hours. The Streets, the house-tops, the verandahs, every nook and corner of the localities through which the procession passed, were filled with men, women, and children, and though the sun shone with his full effulgence upon them, the excitement was so great that nobody gave the slightest thought to it. Some of the caricatures were very telling, for instance the Indigo vat with its thousand reminiscences, the Hell with its dismal

৬ বসন্তক, পূর্ব উল্লিখিত খণ্ড

৭ *The Hindoo Patriot*, April 18, 1868

horrors, the Burning Ghat cinerators with a posse of municipal officers, and the modern Bengali Theatre and concert with their stereotyped airs, songs and discourses, of course mob amusements are not amenable to criticism, but we wish that somebody would point out to the promoters the propriety of avoiding grossness and coarseness as much as possible. We cannot also refrain from drawing the attention of the Commissioner of Police to the haughty officiousness of his model men, which went unpunished simply because the mob of Calcutta were not made of the stuff of Hyde Park agitators. What did it matter whether the prescribed time was exceeded by a quarter or half an hour when those in whose interest the rule regulating processions was made had discarded business for the nonce and were bent on holiday-making ?"

সেকালের কাঁসারীপাড়ার সঙ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট থেকে বের হয়ে বিভিন্ন পথে ঘুরত এবং সেইসব রাস্তা লোকে লোকারণ্য হত। বিশেষ করে চিৎপুর রোড এবং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে বেশি ভিড় জমত।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট জোড়াসাঁকো থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই রাস্তায় এক প্রাসাদতুল্য ভবনে বাস করতেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। মহাভারতের অনুবাদ করে কালীপ্রসন্ন সিংহ অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। জহরলাল বসু[৮] কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আজ পর্যন্ত কালীপ্রসন্নের মহাভারতই মূল সংস্কৃত মহাভারতের সরল, প্রাঞ্জল ও শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক অনুবাদ। যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার এ কীর্ত্তি চিরোজ্জ্বল রহিবে। এতদ্ব্যতিরেকে কালীপ্রসন্নের হুতোম পেঁচার নক্সা তৎকালীন সমাজের একখানি উৎকৃষ্ট নক্সা।" নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করে লঙ সাহেবের যখন জেল ও জরিমানা হয় তখন কালী-প্রসন্ন সিংহ তাঁর জরিমানার টাকা দিয়েছিলেন। লঙ সাহেব প্রসঙ্গে ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা[৯] লিখেছেন, "পাদ্রী জেমস্ লঙ্, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, পুরাতন সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য সাংবাদিকতা, প্রবাদ সংগ্রহ, গ্রন্থপঞ্জী সংকলন,

৮ জহরলাল বসু, বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস, (১৩৪৩), পৃষ্ঠা ১৮৩

৯ ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা, জেমস্ লঙ্, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৭১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পাঠ্য পুস্তক সংকলন, পুরানো দলীল সংগ্রহ ও সম্পাদন প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রচুর ও অতি মূল্যবান কাজের পথিকৃৎ। তিনি আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তিনি এই কাজগুলি চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কঠিন পরিশ্রম ও একান্ত নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদন করেন। সাধারণ শিক্ষিত সমাজের কথা দূরে থাকুক, আমাদের পণ্ডিত সমাজ ও উনবিংশ শতাব্দী বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও তাঁর বহুমুখী কার্য্যাবলীর সহিত তেমন পরিচিত নহেন।"

বারাণসী ঘোষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের জামাতা। দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ। বারাণসী ঘোষ কলকাতার তদানীন্তন কালেক্টার, আইন-ই-আকবরীর অনুবাদক গ্লাডউইন সাহেবের অধীনে দেওয়ানী করতেন। বলাবাহুল্য, বারাণসী ঘোষ-এর নাম থেকেই রাস্তাটির নামকরণ হয়েছিল এবং এই বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটেই কৃষ্ণদাস পাল বাস করতেন। সেকালের কলকাতার মানচিত্রে দেখা যায় যে, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট চিৎপুর রোড থেকে বেরিয়েছে। উক্ত রাস্তাটি এঁকে-বেঁকে সেনট্রাল অ্যাভিনিউ (বর্তমানে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ) পার হয়ে এসে মিশেছে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে, যার বর্তমান নাম বিধান সরণি। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের দিকের অংশটি অর্থাৎ শ্রীমানিবাজারের পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে যে-রাস্তাটি গিয়েছে তার বর্তমান নাম তারক প্রামাণিক রোড, অর্থাৎ সেকালের কাঁসারীপাড়ার রাস্তা। এই রাস্তার প্রায় পূর্বপ্রান্তে তারকনাথ প্রামাণিকের বাড়ি অবস্থিত। এই বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢুকলে সামনে চোখে পড়ে প্রকাণ্ড উঠান আর ঠাকুরদালান, যা এখনো অতীতের বহু উৎসব ও পল্লীবাসীর বহু আনন্দ-উজ্জ্বল দিনগুলির স্মৃতি-চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আহিরীটোলার সঙ

সেকালে কলকাতা শহরের অধিকাংশ পাড়ায় পল্লী-অঞ্চলের মতো গ্রাম্য পরিবেশ বিরাজ করত। অধিকাংশ পাড়ায় ছিল ঝোপ-ঝাড়, সবুজ-শ্যামল ফুল ও ফলের বাগান। অনেক পাড়ায় দু-চারটে পুকুর-ডোবাও দেখা যেত। সবুজ গাছের ঝোপের ভেতর থেকে কোকিল বসন্তের আগমন-বার্তা জানিয়ে দিত।

সেদিনের কলকাতা ছিল আধা-শহর আর আধা-গ্রাম্য জীবনের একটি সুস্থ ও আনন্দময় আবাসস্থান। পাড়ায়-পাড়ায় আসর বসত যাত্রাগান ও পাঁচালীর। বিভিন্ন পূজা-পার্বণে বহু পল্লী থেকে সঙ ও গানের মিছিল বের হত। সে-সময় কলকাতার আহিরীটোলা থেকেও গানের মিছিল বের হত। শোনা যায়, আহিরীটোলার সঙ ও গানের মিছিল প্রায় সত্তর-আশি বৎসর পূর্বে বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রাচীন কলকাতার এই অঞ্চলে একটি প্রসিদ্ধ সমারোহ অনুষ্ঠিত হত আহিরীটোলার গান উপলক্ষ করে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মকর-সংক্রান্তির দিন গানের দল বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করত। এইরূপ একটি গানের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> বন্দো মাতা সুরধুনি,
> পুরাণে মহিমা শুনি,
> পতিত পাবনী পুরাতনী।
> বিষ্ণু পদে উপাদান,
> দ্রবময়ী তব নাম,
> সুরাসুর নরের জননী ॥

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "বন্দো<বন্দোঁ।,<বন্দউ= আমি বন্দনা করি ; প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ, 'বন্দেমাতরম' বিশুদ্ধ সংস্কৃত।"

বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশ-প্রীতির ধারা প্রসঙ্গে আলোচনা কালে অমরেন্দ্রনাথ রায়[১০] লিখেছেন, "বাঙ্গালী বহুকাল হইতেই 'বন্দে মাতা সুরধুনী'র গান গাহিয়া আসিতেছে, কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া দেশ-মাতার বন্দনা করিতে সে পূর্ব্বে কখনও জানিত না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই কলকাতার আহিরীটোলার পল্লীবাসীরা 'গঙ্গা-বন্দনা'র অঙ্গ হিসাবে 'বন্দো মাতা সুরধুনি' গানটি গাইতো এবং সেই সঙ্গে একটি মিছিলও বের করত। বন্দো মাতা গানটি সেকালে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। 'গঙ্গাবন্দনা' গাইতে-গাইতে গানের দল আহিরীটোলার বিভিন্ন পথে ঘুরে আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার পল্লীর সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের সামনে এসে কিছুক্ষণের জন্ম বিশ্রাম করত। আজও চিৎপুর রোডের ধারে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে

১০ অমরেন্দ্রনাথ রায়, স্বদেশ মঙ্গল, পৃষ্ঠা ১

নিয়মিত পূজা হয়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, এককালে গঙ্গা এই পথ পর্যন্ত প্রবাহিতা ছিলেন। মদনমোহনের মন্দির স্থাপিত হবার বহুদিন আগেই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির তৈরি হয়েছিল বলে শোনা যায়।

আহিরীটোলার মিছিল সিদ্ধেশ্বরীতলা থেকে অতঃপর নিমতলায় আনন্দময়ী মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হত এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসহ গঙ্গাবন্দনা গাইতো। আনন্দময়ীর মূর্তিও বহুদিনের পুরানো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই গানের দলের সঙ্গে সঙও থাকত। আহিরীটোলার মতো বাগবাজার ও জোড়াসাঁকো অঞ্চল থেকেও মকর-সংক্রান্তির দিন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গানের মিছিল বের হত। কোন-কোন বছর কোন্ দল আগে যাবে, কোন্ দল পরে থাকবে—এই নিয়ে ঝগড়া-বিবাদও হত এবং বচসা থেকে অনেক সময় হাতাহাতি পর্যন্ত; তারপর পুলিশ সকলকে শান্ত করার জন্য এগিয়ে না এলে কোন দলই শান্ত হত না।

জেলেপাড়ার সঙ

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের সঙের মধ্যে কলকাতার জেলেপাড়ার সঙ সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তার কারণ, অধিকাংশ জায়গায় পূর্বে গান বা পালা কোন কিছু ঠিক না করে সঙ নানারকম সাজে রাস্তায় বেরিয়ে এবং ইচ্ছামতো আবোল-তাবোল প্রলাপ বকে কিংবা নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে দর্শককে হাসাবার চেষ্টা করত। কিন্তু নব-প্রবর্তিত জেলেপাড়ার সঙ বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা ১৩২০ সালে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। চৈত্র মাসে সংক্রান্তির দিন জেলেপাড়ার সঙ বের হত এবং বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই তার প্রস্তুতি-পর্ব চলত। আগে থেকে পালা ও গান লেখা হত। গানে সুর দিয়ে নিয়মিত-ভাবে তার মহলা চলত। গোড়ার দিকে যাঁরা গান ও পালা রচনা করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রূপচাঁদ পক্ষী, গুরুদাস দাস, নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে রূপচাঁদ পক্ষী সেকালে গান-রচনায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দুর্গাদাস লাহিড়ী[১১] লিখেছেন—

[১১] দুর্গাদাস লাহিড়ী, বাঙ্গালীর গান, (১৩১২), পৃষ্ঠা ৩৩৯

"রূপচাঁদ দাস বা রূপচাঁদ পক্ষী ১২২১ সালের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব পুরুষগণের আদি-নিবাস উড়িষ্যা-প্রদেশের চিলকা-হ্রদের সন্নিকট। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশে কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেব সেই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রূপচাঁদের পিতামহ হরেকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র সেই গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। হরেকৃষ্ণ দাসের পুত্র—গৌরহরি দাস মহাপাত্র। গৌরহরি, রাজা হরিহর ভক্তের আমমোক্তারী চাকুরী করিতেন এবং এই কারণে তাঁহাকে কলিকাতায় বাস করিতে হইয়াছিল। এই গৌরহরি দাসই রূপচাঁদের পিতা। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত আলোচনায় রূপচাঁদের বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। ইনি সকল প্রকার সঙ্গীত-রচনায় সুনিপুণ ছিলেন। বিশেষতঃ বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচিত প্রায় সমস্ত গানে পক্ষী বা খগরাজ ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। রূপচাঁদ বড়ই আমোদপ্রিয় ও রসিক পুরুষ ছিলেন। পক্ষী-উপাধিধারী বলিয়া তাঁহার গাড়ীখানি কতকটা খাঁচার আকারের মত ছিল।"

রূপচাঁদ পক্ষী জেলেপাড়ার সঙের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং দলের জন্য গান রচনা করে দিতেন। জেলেপাড়ার সঙ যে-পাড়া থেকে বের হত, রূপচাঁদ পক্ষীর বাড়ি ছিল সেই পাড়ার কাছেই। নেবুতলা বাজারের সামনে দিয়ে হিদারাম ব্যানার্জি লেনের মধ্যে ঢুকে কিছু দূর গেলেই উত্তর দিকে যাওয়ার একটি গলি আছে। এই গলির বর্তমান নাম রামকানাই অধিকারী লেন। ওই গলির একটি বাড়িতে বাস করতেন রূপচাঁদ পক্ষী।

জেলেপাড়ার সঙ রমানাথ কবিরাজ লেন থেকে বের হয়ে অক্রূর দত্ত লেনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেত ওয়েলিংটন স্ট্রীটে (বর্তমানে নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট)। তারপর সোজা কলেজ স্ট্রীট ধরে মাধববাবুর বাজারের সামনে দিয়ে সঙ এগিয়ে যেত। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং যেখানে অবস্থিত পূর্বে সেখানে ছিল মাধববাবুর বাজার[১২]। জেলেপাড়ার সঙ মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের মোড়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াত। সেকালে মেছুয়াবাজার বলতে বোঝাত চিৎপুর রোড থেকে আপার সার্কুলার রোড পর্যন্ত লম্বা রাস্তা। পরে কলেজ স্ট্রীট থেকে আপার সার্কুলার রোড পর্যন্ত অংশের নাম পরিবর্তন হয়ে নতুন নামকরণ হয় কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট। ওই পথ দিয়ে সঙ ঘুরত। সেকালের মেছুয়াবাজারে (বর্তমানে যেখানে কেশব সেন স্ট্রীট) একটি বাজার ছিল এবং সেখানে মাছ-তরি-তরকারি

১২ ***Hundred years of the University of Calcutta***, **1857-1956, University of Calcutta, page 218**
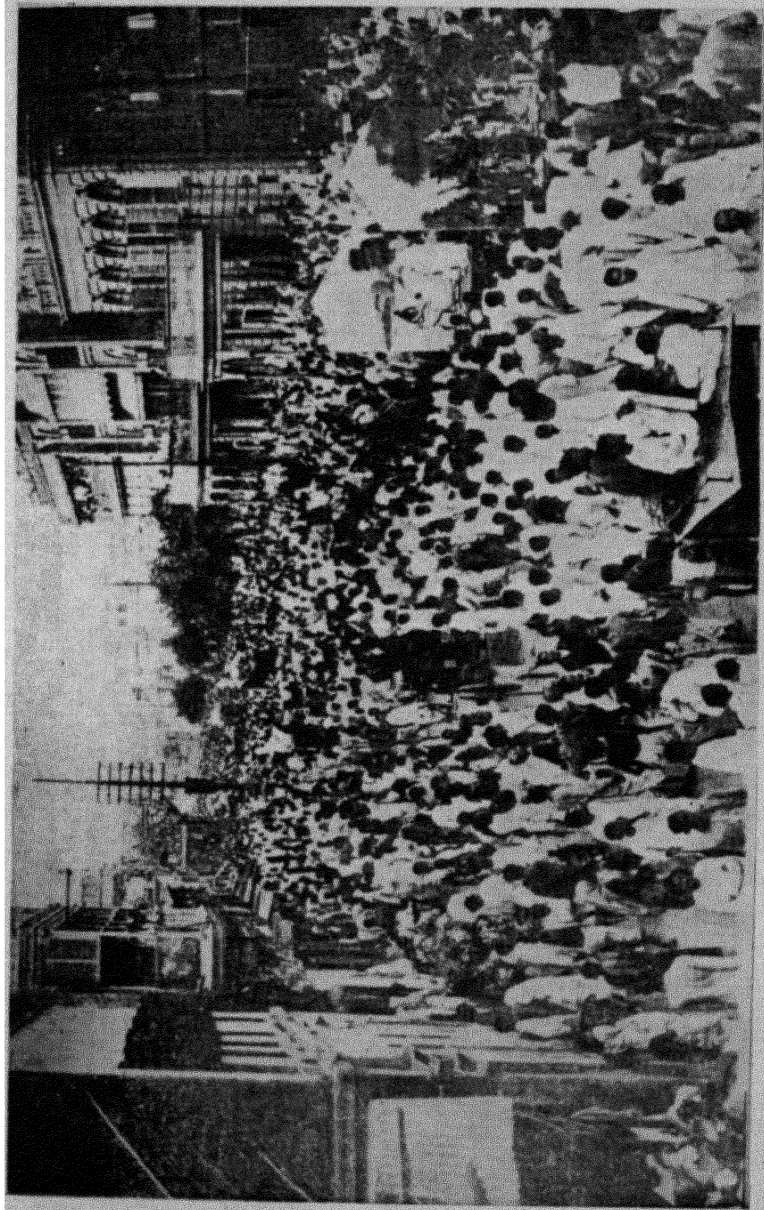
আমহার্স্ট স্ট্রীটে জেলেপাড়ার সঙের মিছিল
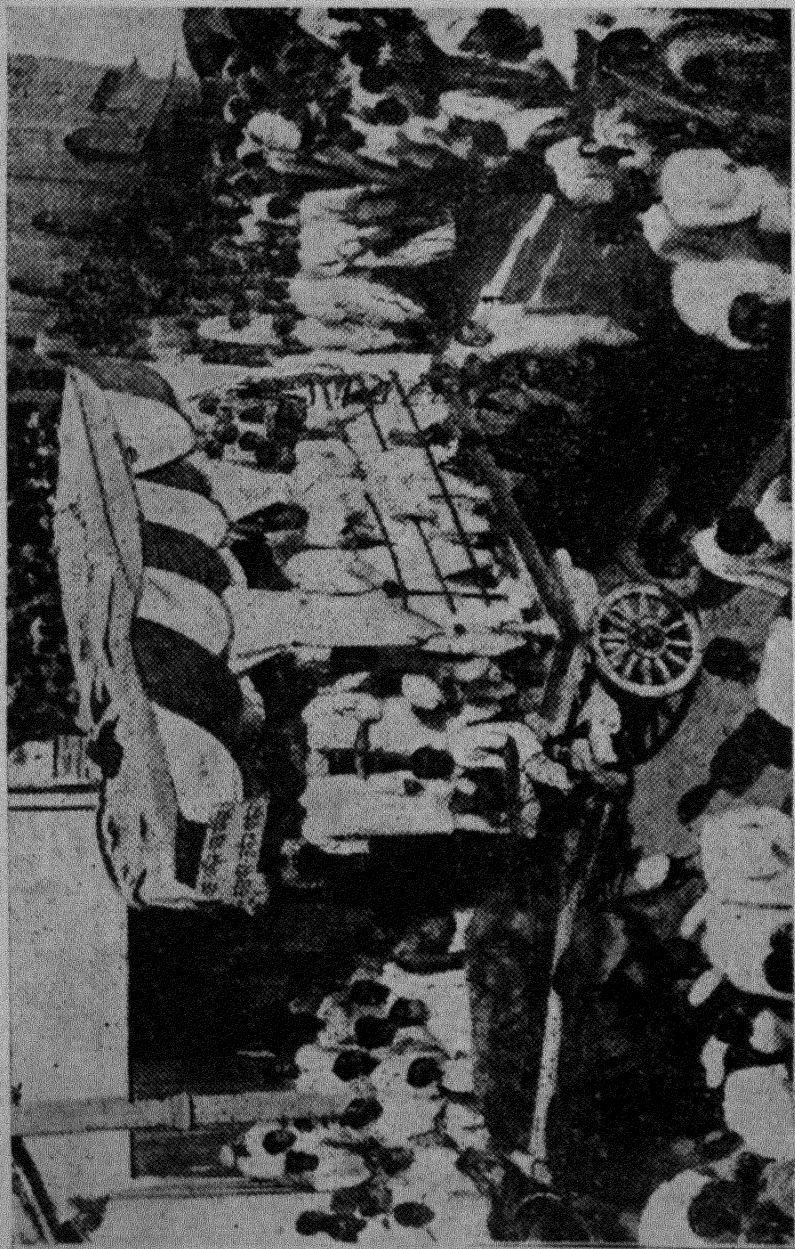
মহিষে-টানা গাড়িতে জেলেপাড়ার সঙ
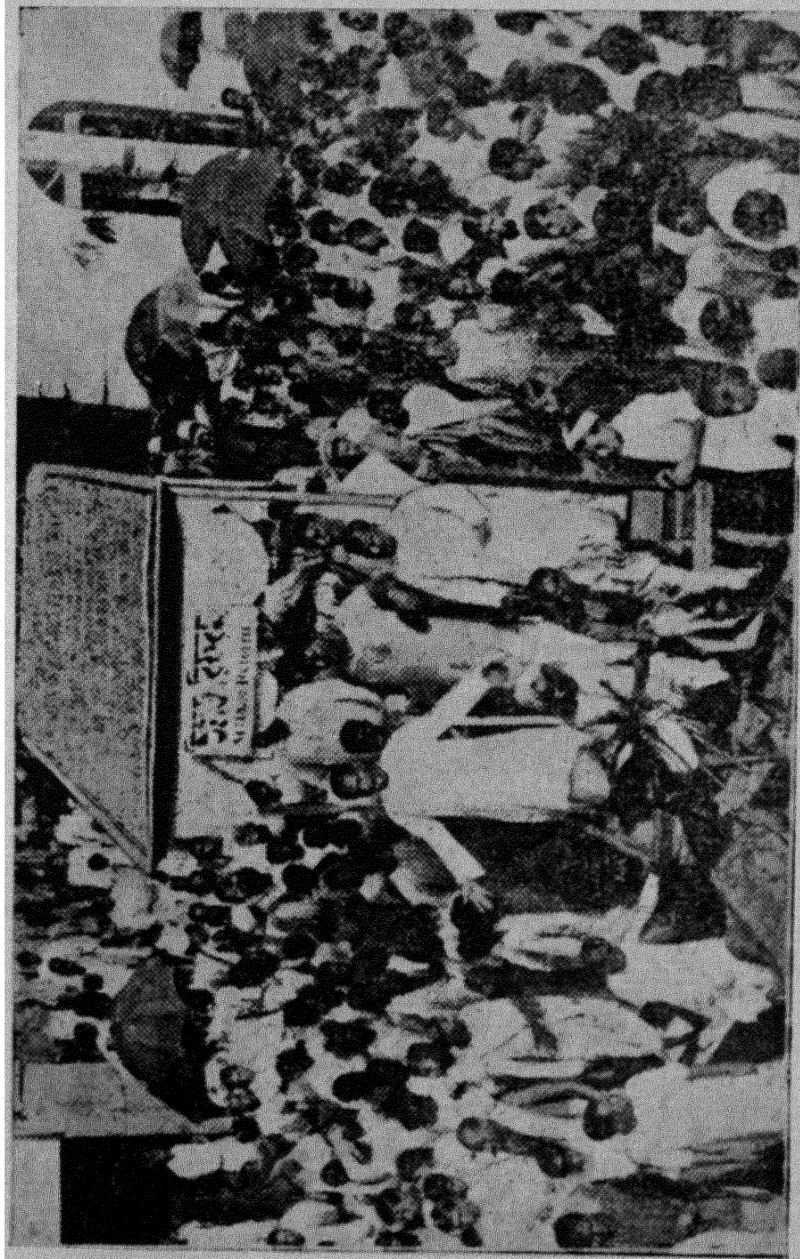
মহিষে-টানা গাড়িতে ছড়া কেটে চলেছে জেলেপাড়ার সঙ
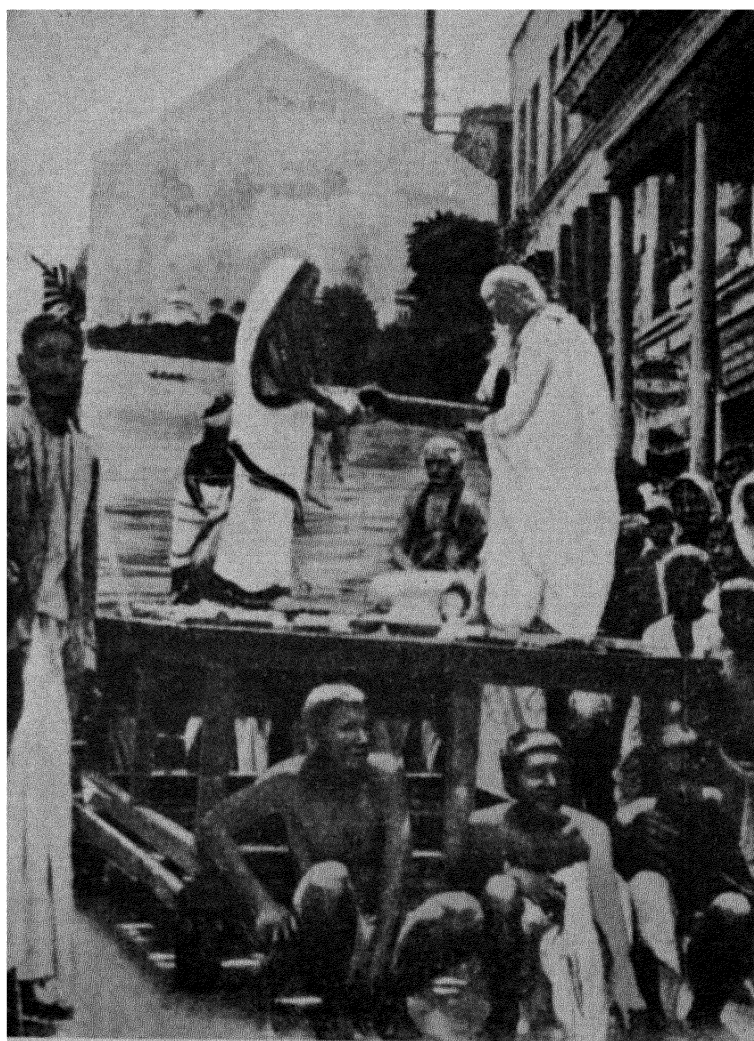
জেলেপাড়ার বসা-সঙ

ঠেলাগাড়ির উপর জেলেপাড়ার বসা-সঙ
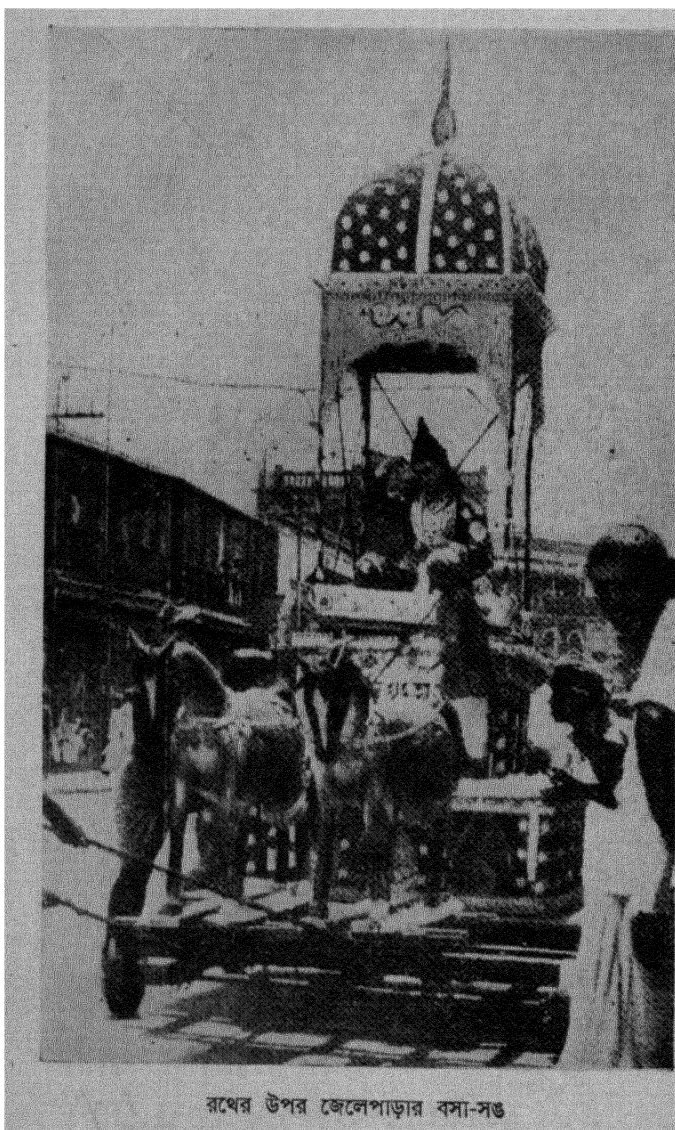
রথের উপর জেলেপাড়ার বসা-সঙ
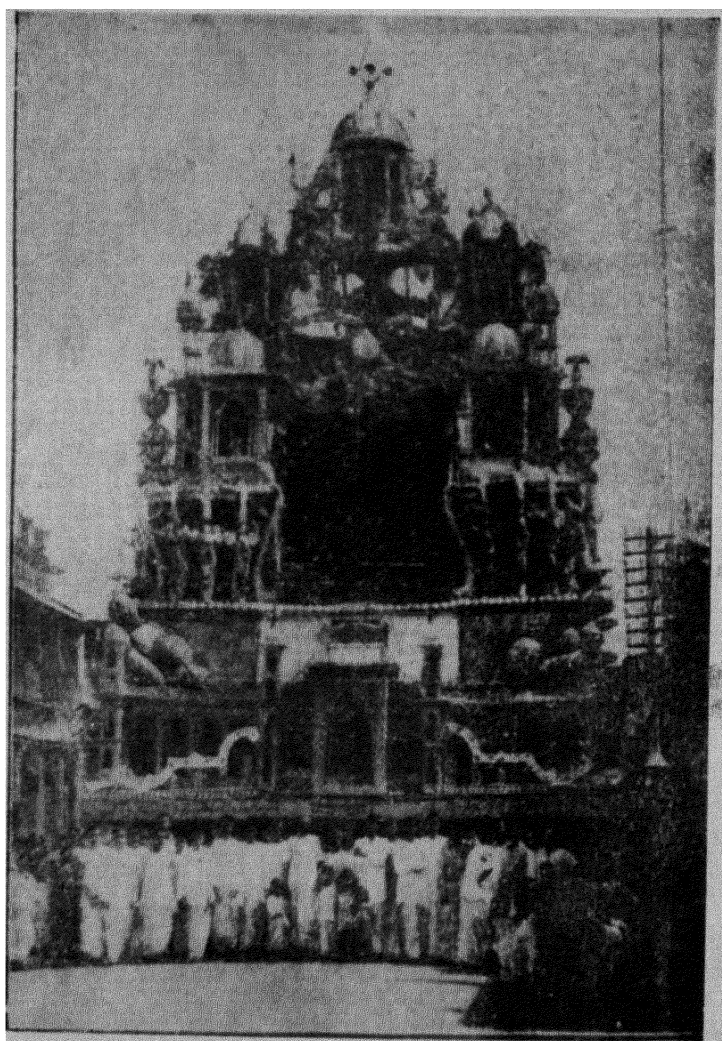
ঢাকার (উত্তর নবাবপুর) বড় চৌকি—১৩৪৪ সাল

ঢাকার নবাবপুর রথখোলার বড় চৌকি

ঢাকার জন্মাষ্টমীর সঙ ও রৌপ্যনির্মিত চৌকি
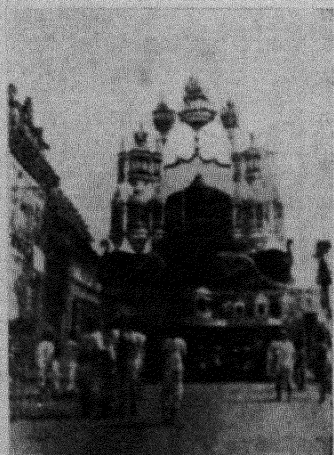
ঢাকার নবাবপুরের আর-একটি চৌকি

বিক্রি হত। বাজারটির নাম 'টিকটিকির বাজার'[১৩]। সঙের দল টিকটিকির বাজারে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করত, তারপর সেখানে জল, মিষ্টি, পান, তামাক খেয়ে আবার রওনা হত।

সঙের দল আমহার্স্ট স্ট্রীটের ভেতর দিয়ে এসে বহুবাজার স্ট্রীট পার হয়ে নেবুতলা লেন দিয়ে (বর্তমানে শশিভূষণ দে স্ট্রীট) আবার ফিরে আসত রমানাথ কবিরাজ লেনে। একসময় এই নেবুতলা লেনে একটি গির্জা (Old St. Jame's Church)[১৪] ছিল। নেড়া গির্জা নামে পরিচিত ছিল ওই গির্জাটি। নেড়া গির্জা তৈরি হবার আগে জায়গাটির নাম ছিল পদ্মপুকুর।

গোড়ার দিকে সঙের দল সাধারণত পায়ে হেঁটে চলত। অবশ্য এর একটি অংশ গরুর গাড়িতেও চড়ত। দু-একটি দলকে কলকাতা কর্পোরেশনের জঞ্জাল ফেলার গাড়িতে বাঁশের মাচা বেঁধে তার ওপর চড়ে যেতে দেখা গেছে। এই গাড়িগুলো মহিষে টানত। পরবর্তীকালে হার্ড ব্রাদার্স অথবা কুক কোম্পানির মহিষে-টানা ট্রাক-গাড়িতেই অনেকগুলি সঙ বের হত। তবে পায়ে-হাঁটা সঙের দল সংখ্যায় নেহাত কম ছিল না।

যে-যে পথ দিয়ে সঙ ঘুরত সেইসব রাস্তার দুই পাশে ও দুই দিকের বাড়ির বারান্দায়, ছাদে ও জানালায় আবালবৃদ্ধবনিতা সঙ দেখার জন্য উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকত। কলকাতার আশ-পাশের বিভিন্ন স্থান থেকেও অসংখ্য মানুষ এসে রাস্তায় ভিড় জমাত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসীম ধৈর্য ধরে তারা অপেক্ষা করত।

সে-সময় একটি দিনের জন্য মধ্য কলকাতার এই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের এক মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠত। এই উপলক্ষে অতিথি ও রবাহূতদের আদর-যত্ন করার জন্য গৃহকর্তাদের নেহাত কম ব্যয় হত না।

তখনকার দিনে চায়ের এত ব্যাপক প্রচলন হয়নি। সুতরাং ওই অঞ্চলের প্রায় সব বাড়িতে অতিথির জন্য তৈরি হত শরবত, ব্যবস্থা থাকত পান ও তামাকের। অনেকে শিশুদের জন্য আগে থেকে বাড়িতে দুধের ব্যবস্থাও করে রাখতেন। পথের দর্শকদের জন্য অনেক বাড়ির সামনে শামিয়ানা টাঙানো হত।

১৩ টিকটিকির বাজার অনেকের কাছে শিবচন্দ্র বিশ্বাসের বাজার নামে পরিচিত ছিল। রমানাথ দাস প্রণীত 'কলিকাতার মানচিত্র' (১৮৮৪ সালে প্রকাশিত) পুস্তকেও এর উল্লেখ আছে।

১৪ *Bengal Past and Present*, vol. 2, pt. 1, January-July, 1908, page 145

মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে অনেকে ছাদেও শামিয়ানার ব্যবস্থা রাখতেন।

সঙ প্রসঙ্গে রসরাজ অমৃতলাল বসু[১৫] বলেছিলেন, "ছোট, মন্দ, অশ্লীল প্রভৃতি বলিয়া আমরা আমাদের কত জিনিসই না হারাইয়াছি ও হারাইতে বসিয়াছি। ছোটকে বড়, মন্দকে ভাল, অশ্লীলকে শ্লীল করিয়া লইতে যদি আমরা চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের অনেক জিনিস নিজস্ব থাকিয়া যায় এবং জগতের দৃষ্টিতে এত ক্ষুদ্র—এত হেয় হই না।"

রসরাজ[১৬] আরও বলেছেন, "সং ছোট নয়, হীন নয়, অশ্লীল নয়। সকল দেশে সকল সময়ই কোন-না-কোন রূপে সং লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। তবে বাঙ্গালাদেশে কতকগুলি অশিক্ষিত, অমার্জিত রুচি লোকের হস্তে পড়িয়া এবং সঙ্গে শিক্ষিত সুধীগণের সহানুভূতি না পাইয়া সং দিন দিন অবনত হইতেছিল।"

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর সরস রচনার দ্বারা জেলে-পাড়ার সঙের সবিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

সঙ প্রসঙ্গে সেকালের বাংলা সংবাদপত্রগুলি থেকে খুব কম বিবরণ পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ সংবাদপত্রই দুষ্প্রাপ্য। একালের একটি সংবাদপত্র[১৭] থেকে যেটুকু মন্তব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা এখানে প্রদত্ত হল :

"কলিকাতার বিখ্যাত জেলেপাড়ার সং এই চৈত্র সংক্রান্তি বা চড়ক পূজার স্মৃতিচিহ্ন। পূর্বে কাঁসারীপাড়ার সং, জেলেপাড়ার সং প্রভৃতি বিখ্যাত ছিল। এখনও যাহা আছে, তাহাকে অশ্লীল বা কুরুচি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এই সংগুলি একসময়ে আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের একটা শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল। 'সং'গুলিকে উপেক্ষা না করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি এগুলিকে নব যুগের আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই কাজের মত কাজ হয়।"

জেলেপাড়ার সঙের সঙ্গে সচরাচর কোনরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংস্রব ছিল না। কিন্তু তৎকালীন ইংরেজ সরকার সঙের মিছিল, গান ও ছড়া রাজনৈতিক আন্দোলনমূলক বলে সন্দেহের চোখে দেখতেন।

১৫ জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস, অমৃতলাল ও জেলেপাড়ার সং, মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬, পৃষ্ঠা ৩০

১৬ পূর্বে উল্লিখিত রচনা

১৭ আনন্দবাজার পত্রিকা, মঙ্গলবার, ১ বৈশাখ, ১৩৩২

জেলেপাড়ার সঙ হাসির গান গেয়ে যেমন সকলকে প্রচুর আনন্দ দিত ঠিক তেমনি সমাজের অনাচার ও দুর্নীতির ওপর কশাঘাত করে দায়িত্বশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সমাজচেতনামূলক গান ও ছড়াগুলি এদিক দিয়ে নৈতিক শিক্ষার মূল্যবান উপাদান বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি ও জেলেপাড়ার সঙের গান

১৯১৭ সালের কথা। ইংরাজী সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ত যুদ্ধের খবর। সৈন্য সংগ্রহের কথা, সৈনিকদের মেসোপটেমিয়ায় নিয়ে যাবার কথা, যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির কাহিনী; কলকাতার বিডন স্কোয়ারে War-Loan বা যুদ্ধ-ঋণ সংগ্রহের জন্য সভার বিস্তৃত বিবরণ; বাঙালী যুবকদের সৈন্যদলে যোগদানের কথা, বেঙ্গলী-রেজিমেন্টের সংবাদ, ওয়ার-ফাণ্ড কনসার্ট প্রভৃতির সংবাদ সে-সময় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাকে ভরিয়ে রাখত। যুদ্ধের বিবরণ দেশবাসীর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ঠিক এই সময় যে-সংবাদটি জনচিত্তে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নচুরির সমাচার।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা[১৮] মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, "ইহা সাতিশয় দুঃখের বিষয় যে প্রথম বারের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি যাওয়ার পর দ্বিতীয় বার পরীক্ষা গৃহীত হইবার পূর্ব্বে তাহার প্রশ্নও চুরি যাওয়ায় ঐ পরীক্ষা নাকচ হইয়াছে, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে ১৫ই মের পূর্ব্বে আর পরীক্ষা গৃহীত হইবে না। ছাত্রদিগকে অনিশ্চয়ের যন্ত্রণার মধ্যে না রাখিয়া কবে পরীক্ষা হইবে, তাহাও শীঘ্র জানান উচিত। যাহারা এই বিভ্রাট ঘটাইতেছে, তাহারা অতি দুর্বৃত্ত এবং সমাজের শত্রু। তাহাদিগকে ধরাইয়া দিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সকলে সাহায্য প্রদান করুন।"

ছাত্ররাও আতঙ্কিত হয়ে বিভিন্ন কাগজে তাঁদের মতামত ছাপাতে লাগলেন। মুখে মুখে ঘুরতে থাকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নচুরির সংবাদ। কর্মকর্তাদের মিটিংয়ের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিরাট ছাত্রসমাবেশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ এপ্রিল, ১৯১৭ সালের সভার যে-বিবরণ একটি সংবাদপত্রে[১৯] প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল:

১৮ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৪, পৃষ্ঠা ১৪

১৯ *The Amrita Bazar Patrika*, April 17, 1917, page 4

"University Besieged by Anxious Students.

During the progress of this unusually prolonged meeting an immense crowd of students, numbering a thousand or more, assembled in the portico of the Senate House on the grand stair-case and along the footpaths for a considerable distance, as well as in College Square in their anxiety had arrived at in regard to the recent examinations which had been cancelled."

১৮ এপ্রিল, ১৯১৭ সালের সংবাদপত্রে[২০] এই প্রসঙ্গে আরও যে-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু অংশ হল এই :

"The University Scandal.

Report of the Committee of Inquiry.

It is understood that a special meeting of the Senate will shortly be held at an early date to consider the whole question connected with the recent leakage of examination papers. No date has yet been fixed for the meeting. It may be remembered that after the first leakage of Matriculation Papers the Senate, on the recommendation of the Syndicate, appointed a Committee consisting of Sir Ashutosh Mookerjee, Hon. Mr. Hornell, Dr. N. L. Sircar, Sir R. N. Mookerjee, Mr. Mahendra Nath Roy, Mr. T. O. D. Dunn and the Rev. Dr. George Howell to inquire into the whole matter."

যেহেতু 'জেলেপাড়ার সঙ' ছিল সমাজের দর্পণ সেই হেতু সঙের মুখ দিয়ে সমাজের নানা ভুল-ভ্রান্তির কথাও ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে বলা হত। লোকের সামনে তুলে ধরা হত বিশিষ্ট ও বিভিন্ন সামাজিক চিত্র। ওই বছর অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১৭ সালে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন জেলেপাড়ার সঙের বিভিন্ন পালা, গান ও ছড়া ছাড়াও আর-একটি বিশেষ গান রচিত হয়েছিল। সেই গানটি হল : 'বিদ্যার মন্দিরে সিঁদ'। গানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। সঙের দলে গানটি গীত হওয়ার পর যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল ও বহুদিন লোকের মুখে মুখে এর প্রচলন ছিল। 'বিদ্যার মন্দিরে সিঁদ' —এই গানটির রসগ্রহণ তাঁরাই করতে পারবেন যাঁদের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

২০ *The Amrita Bazar Patrika*, April 18, 1917, page 8

প্রণীত "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান জানা আছে। একালের পাঠকদের কথা মনে রেখে উপাখ্যানটির সারাংশের অবতারণা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করি :

বীরসিংহের কন্যা 'বিদ্যা' সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হয়ে প্রতিজ্ঞা করে, যে তাকে বিচারে পরাস্ত করতে পারবে তাকে সে স্বামিত্বে বরণ করবে। অনেক রাজপুত্র তার সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হল। সেই সময় কাঞ্চীনগরাধিপতি গুণসিন্ধু-পুত্র 'সুন্দর' বিদ্যালাভার্থ বর্ধমানে এসে 'হীরা' নামে মালিনীর বাড়িতে বাস করত। ওই মালিনী রাজকন্যা বিদ্যাকে প্রতিদিন ফুল দিয়ে আসত। সুন্দর একদা একটি বিচিত্র মালা গেঁথে মালিনীর হাত দিয়ে বিদ্যার কাছে পাঠিয়ে দেয়। বিদ্যা ওই মালা দেখে মুগ্ধ হয়। সুন্দর এক সুড়ঙ্গ তৈরি করে এবং সুড়ঙ্গ-পথে নিত্য বিদ্যার কাছে যাতায়াত শুরু করে। কিছুদিন পরে সুন্দর বিদ্যার ঘরে ধরা পড়ে। রাজার আদেশে সুন্দরের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। নগর-কোটাল ধূমকেতু তাকে মশানে বধের জন্য নিয়ে যায়।

জেলেপাড়ার সঙের গান 'বিদ্যার মন্দিরে সিঁদ' এখানে উদ্ধৃত হল :

বিদ্যার মন্দিরে এ সিঁদ কেটেছে কোন চোরে ?
সখীরা নেকী নাকি পড়লো ফাঁকি
    কেউ দেখেনি ঘুমের ঘোরে ॥
বিদ্যা সর্ববিদ্যা অধিকারী (১)
দেবের প্রসাদে গুমোর গো ভারি,
নইলে নারী হয়ে জয়ের জারি,
    করেন তিনি কোন জোরে ॥
বিদ্যা নিত্য পূজে আশুতোষে, (২)
    থাকে উপোসে,
আজকে পূজোর দেরী হলো
    মালিনীর দোষে,
সে আসেনি ভোরে,
সেই রোষে কি নন্দী ভৃঙ্গী
শিবের বরে সবাই সিদ্ধি
[illegible]
    [illegible]

চন্দ্রমোহন (৩) বদনখানি,
ঘোমটা দিয়ে ঢাকেন রাণী,
নিলেন বাইশ বুরুল (৪)
ফুলের শয্যা লজ্জায় বুঝি যান মরে,
জয়ী হতে প্রবেশ পরীক্ষায়,
পড়ুয়া বেশে এসেছিল হায়
গুণসিন্ধুসুত নব যুব রায় (৫) এই শহরে।
এখন ধূমকেতু (৬) তার ভাগ্যাকাশে
মশান ভাসে নয়ন ঝোরে॥

গানটি রচনা করেছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। এই গানের কয়েকটি শব্দের বিশদ অর্থ এখানে প্রদত্ত হল :

(১) সর্ব্ববিদ্যা অধিকারী = বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য। অপর পক্ষে = বর্ধমানাধিপতি বীরসিংহের কন্যা।

(২) আশুতোষ = স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সর্বাধিকারী মহাশয়ের পূর্বতন উপাচার্য। অপর পক্ষে = মহাদেব।

(৩) চন্দ্রমোহন = চন্দ্রভূষণ মৈত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার। অপর পক্ষে = সুন্দর মুখ।

(৪) বুরুল = বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রেজিস্ট্রার (Dr. P. J. BRUHL)। অপর পক্ষে = বুড়ো আঙুলের প্রস্থ, প্রায় এক ইঞ্চি।

(৫) যুব রায় = কাঞ্চি নগরাধিপতি গুণসিন্ধু-পুত্র সুন্দর যিনি বিদ্যালাভার্থী হয়ে বর্ধমানে আসেন। অপর পক্ষে = প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণ।

(৬) ধূমকেতু = বর্ধমানের শহর-কোটাল। অপর পক্ষে = দুষ্টগ্রহ।

ওই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নচুরি প্রসঙ্গে আরও একটি ছড়া কাটানো হয়েছিল। সেই ছড়াটির রচয়িতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। দুঃখের বিষয় সেই ছড়ার শিরোনাম ছাড়া অন্য অংশ কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। শিরোনামটি হল :

কলসী বেয়ে গড়িয়ে যায়
দীঘির পাড়ের কেলেঙ্কার।

ওই বৎসর উক্ত ছড়ার জন্য একটি মহিষের গাড়িতে বাঁশের মাচা করে তলায় একটি ফুটো-করা কলসী টাঙানো হয়েছিল। বৈশাখ মাসে ঝারা দেওয়ার জন্য

শিবঠাকুরের মাথায় যেভাবে ছিদ্র কলসী টাঙানো থাকে এবং সেই কলসীর তলদেশস্থ ছিদ্র থেকে যেভাবে বিন্দু-বিন্দু জল দেব-শিরে পড়তে থাকে তারই অনুরূপ একটি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফোঁটা-ফোঁটা কাদা-গোলা জল কলসীর তলা দিয়ে পড়ছিল এবং অভিনেতারা তা হাতে নিয়ে দর্শকদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে উক্ত ছড়া কেটে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিলেন।

মিস মেয়ো ও জেলেপাড়ার সঙ

দেশের চারিদিকে তখন স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ। সমগ্র দেশবাসীর চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন। স্বদেশী গান, দেশাত্মবোধক কবিতা ব্যাপকভাবে তখন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশের প্রায় ঘরে-ঘরে সাধারণ মানুষের কণ্ঠে তা প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এমন কি ভিখারীদেরও গাইতে শোনা যেত বহু অজ্ঞাত কবি রচিত স্বদেশী গান। যেমন—

> একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।
> হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
> মাগো, দেখবে ভারতবাসী।
> ওমা, কলের বোমা তৈরি করে,
> দাঁড়িয়েছিলাম লাইনের ধারে,
> মাগো, বড়লাটকে মারতে গিয়ে
> মারলাম ভারতবাসী।
> শনিবারে বেলা দুটোতে,
> লোক ধরে না হাইকোর্টেতে,
> ওমা, অভিরামের দ্বীপ চালান মা
> ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
> দশ মাস দশ দিন পরে
> তোর ক্ষুদিরাম আসবে ফিরে,
> চিন্‌তে যদি না পারিস মা,
> দেখ্‌বি গলায় ফাঁসি।

স্বদেশী গান ও দেশপ্রেমের কবিতার তীব্র উদ্দীপনা তো ছিলই, তার উপর দেশের মুক্তিকামী বীর সৈনিকেরা দলে-দলে স্বাধীনতা-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার জন্য সে কী অদম্য আকাঙ্ক্ষা! স্বাধীনতা-

আন্দোলনকে সর্বতোভাবে জয়যুক্ত করার জন্ত দেশের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী এবং বিপ্লবপন্থী পত্রিকাগুলি ইংরেজদের অবর্ণনীয় অত্যাচারেও লেখনী বন্ধ করেননি। সেদিনের সাংবাদিকরাও প্রকৃত পথনির্দেশকের এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে সে-সময় কলকাতায় মাঝে-মাঝে স্বদেশী মেলা বসত এবং সেইসব মেলায় বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রতিজ্ঞাগ্রহণ একটি পবিত্র ও বৈশিষ্ট্যময় অনুষ্ঠান রূপে পরিগণিত হত। স্বদেশী মেলায় নানারকম দেশী জিনিসের প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থার পাশাপাশি কুস্তি, লাঠিখেলা, যুযুৎসু ইত্যাদির আয়োজনও থাকত। কিন্তু প্রতি বছর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন মধ্য কলকাতা থেকে জেলেপাড়ার সঙের যে-মিছিল বের হত তা কোন রাজনৈতিক মতবাদের পোষকতা বা প্রতিবন্ধকতা করেনি। এটা ছিল জনসাধারণের মধ্যে নিছক আমোদ বিতরণের উদ্দেশ্যে গঠিত রক্ষণশীল সামাজিক সংস্থা এবং সঙের মুখ দিয়ে যে-সব সমাজ-চেতনামূলক ছড়া প্রচারিত হত তার আবেদন ছিল অমোঘ। যারা দেশবাসীকে অপমান করত এই সংস্থা তাদের ক্ষমা করত না, উপরন্তু সঙের মুখ দিয়ে জোরালো ভাষায় তার জবাব দেওয়া হত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্যাথেরিন মেয়ো নাম্নী এক বিদেশিনী মহিলা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা করে বই লিখেছিলেন। মিস মেয়োর এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক ও সচেতন করার জন্ত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি একদিকে যেমন লেখনী ধারণ করেছিলেন, অন্তদিকে তেমনি জেলেপাড়ার সঙের মুখের গানের মাধ্যমে মিস মেয়োর প্রতি কটাক্ষ করে যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়েছিল। সঙের মুখ দিয়ে আরও বলা হয়েছিল যে, ভারতীয়দের যদি কোন কুসংস্কার থেকেই থাকে তাহলে তার জন্ত দায়ী ইংরেজ সরকার। কেন না, ইংরেজ সরকার সুদীর্ঘ কাল শাসন করেও ভারতবর্ষ থেকে কুসংস্কার দূর করতে পারেনি। এ ব্যর্থতার গ্লানি শুধু ভারতবাসীর কেন, ইংরেজ সরকারকেও বহন করতে হবে।

জেলেপাড়ার সঙের এই ভূমিকা সম্পর্কে সেদিনের সংবাদপত্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। সংবাদপত্রটি[২১] এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে—

"Thousands of sightseers enjoyed songs and satires criticizing follies of political, Municipal and other celebrities. The most amusing [illegible] directed against

২১. The [illegible]

Miss Mayo's Mother India, conditions of high university graduates seeking humiliating jobs and against outstanding social evils."

মিস মেয়ো প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ একটি মাসিক পত্রিকায়[22] একটি সংখ্যায় এইরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল : "বইখানা আমেরিকায়, ইংলণ্ডে, ইউরোপের জার্মানী, সুইজার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছে। ইংলণ্ড আমেরিকার নানা কাগজে উহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছে। ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টের সভ্যদিগকে ঐ বহি বিনামূল্যে এক একখানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই-সকল তথ্য হইতে অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত, যে, লেখিকার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে "সভ্য" জগতের লোকদের মনে অবজ্ঞার উদ্রেক করা ; তাহা হইলে ঐ "সভ্য" জগৎ ইংরেজদের ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলিত রাখার বিরোধী হইবে না।"

মিস মেয়ো "মাদার ইণ্ডিয়া" লিখে ভারতবাসীকে যে অপমান করেছিলেন তার প্রতিবাদকল্পে কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিল। সেদিনের প্রতিবাদ-সভার সংবাদটি[23] হল এই :

"ভারত নারীর মিথ্যা কুৎসা প্রচারে ভারতের প্রচণ্ড বিক্ষোভ

গতকল্য রবিবার সায়াহ্নে ৬।। ঘটিকার সময় ভারতের নারীজাতির উপর মিস মেয়ো ও মিঃ পিলচার যে কুৎসিত মিথ্যা নিন্দার আরোপ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদকল্পে কলিকাতার টাউন হলে বিরাট জনসমাবেশ হইয়াছিল। কলিকাতার মেয়র মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

আরও একটি সংবাদপত্র[24] লিখেছিলেন :

" 'মাদার ইণ্ডিয়া' লিখিয়া মিস মেয়ো অর্থ যত উপার্জন করিয়াছেন তাহার অপেক্ষা বেশী অর্জন করিয়াছেন কলঙ্ক। তাঁহার কলঙ্কের ডালি বোধ হয় এখনও পূর্ণ হয় নাই,—তাঁহার অর্থের লালসাও বোধ হয় বাড়িয়া গিয়াছে। তাই মেয়ো বিবি 'ভগবানের ক্রীতদাস' নামক আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়া পুনরায় ভারতবর্ষকে কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই পুস্তকখানিতে লেখিকা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এমন সব মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন যাহা অত্যন্ত কুরুচি ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক।

২২. [illegible]
২৩. [illegible]
২৪. [illegible] পৃষ্ঠা [illegible]

কোন জাতির সুনাম অপহরণ করিবার এই যে কলুষিত প্রবৃত্তি, ইহা জগতের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইহা এক জাতির মনে আর এক জাতি সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার সৃষ্টি করিয়া জাতি বিদ্বেষের অনলকে বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া দিতেছে। ইহা আমাদের স্বাধীনতার দাবীকে অস্বীকার করিয়া জগতের চোখে আমাদিগকে অমানুষ ও বর্ব্বর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

মিস মেয়োকে কটাক্ষ করে জেলেপাড়ার সঙের যে-গানটি সে-বছর বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

সাগর পারের নাগর ধরা
স্বেচ্ছাচারিণী,
তারাই হল ভারত নারীর
কেচ্ছাকারিণী ॥

জেলেপাড়ার সঙ ও দাদাঠাকুর

শরৎ পণ্ডিত মহাশয় অর্থাৎ দাদাঠাকুর নামে যিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস রচনা জেলেপাড়ার সঙের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। সে আজ অনেক দিন আগেকার কথা।

কয়েক বছর আগেও কলকাতা শহরে যে-সব জিনিস দেখা যেত বর্তমানে তার অনেক কিছু দেখা যায় না। যেমন, মহিষে টানা ট্রাক-গাড়ি। এই গাড়িগুলি হার্ড ব্রাদার্স আর কুক কোম্পানি ভাড়া খাটাতেন। গাড়িগুলি বেশ বড় আকারের ছিল। ওইসব গাড়ি ভাড়া করে তার উপর চাঁদোয়া, ঝালর ইত্যাদি দিয়ে ভালোভাবে সাজিয়ে জেলেপাড়ার সঙ বের হত।

সে-সময় ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেশ-প্রেমিকদের সুসংহত প্রতিজ্ঞা আকাশে বাতাসে অনুরণিত হয়ে ফিরছে—"উঠব মোরা উঠব মোরা বিধির আদেশবাণী।"

এর কয়েক বছর পূর্বে এমনি একদিনে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, সেই ভয়াবহ স্মৃতি মনে পড়লে আজও ভারতবাসী লজ্জায়, ঘৃণায় ও ক্ষোভে-দুঃখে শিহরিত হয়ে ওঠে।

জেনারেল ডায়ার নৃশংসভাবে জনতার ওপর অজস্র গুলিবর্ষণ করেছিল। এই স্মৃতি-দিবস এগিয়ে এল। যেদিন জেলেপাড়ার সঙ বের হয়েছিল সেইদিনও ছিল 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস'।

সেই সময় জেলেপাড়ার সঙ জাতীয় ভাবের প্রচারের প্রচেষ্টা করেছিলেন। জেলেপাড়ার সঙের কণ্ঠেও সেদিন ছিল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বাণী। সেই বছর শরৎ পণ্ডিত মহাশয় অর্থাৎ দাদাঠাকুর জেলেপাড়ার সঙের জন্য ছড়া লিখেছিলেন এবং সেই ছড়া কাটানো হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জেলেপাড়ার সঙের প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। জেলেপাড়ার সঙের অনুকরণে খিদিরপুর অঞ্চল থেকেও সঙ বেরিয়েছিল। তা ছাড়া হাওড়ার খুরুট, শিবপুর, কাসুন্দিয়া এবং হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থানের পল্লীবাসীরা সঙের দল বের করেছিলেন। সেইসব সঙের ছড়া ও গানে জেলেপাড়ার সঙের গান ও ছড়ার প্রভাবই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কয়েক স্থানের সঙের গানে দেখা যায় যে, জেলেপাড়ার মতো একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে দু-চারটি কথা অদল বদল করে গান বা ছড়া রচিত হত। এ থেকেই বোঝা যায় যে, জেলেপাড়ার সঙের গান ও ছড়া সেকালে কত জনপ্রিয় ছিল। শরৎ পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় আরও অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিক ও কবি জেলেপাড়ার সঙের জন্য ছড়া ও গান লিখে দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

সংবাদপত্র ও জেলেপাড়ার সং

মহানগরীর পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েও কলকাতা ক্রমশ তার প্রসারিত বাহু বিস্তার করে চলেছে উপকণ্ঠের দিকে। বিপুল তার জনসংখ্যা, বিশাল তার ভৌগোলিক আয়তন। নিত্য নতুন পরিবর্তনের জোয়ারে বস্তি ভেঙে গড়ে উঠছে শত শত ইমারত আর প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত রাস্তা। প্রাচীন পল্লী বা রাস্তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হচ্ছে নতুন নাম। চারিদিকের নয়নাভিরাম সবুজ-শ্যামল পরিবেশ দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে কল-কারখানার ধূসর ধূমল রেখায়। চল্লিশ বছর আগেও শহর থেকে কয়েক পা দূরে গেলে চোখে পড়ত কলাবাগান, আমবাগান, তাল, নারিকেল ও সুপারি গাছের সারি। বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে ছুটে পালাত কাঠবেরালি। চোখে পড়ত পুকুর, ডোবা, খাল, বিল। পরিবর্তনের প্রবল স্রোতে সব-কিছুই অন্তর্হিত হয়েছে। কিছুদিন আগেও যে-সব উৎসব ও সমারোহ আমরা দেখতে পেতাম আজ সে-সব প্রায় অবলুপ্তির পথে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কলকাতার জনপ্রিয় জেলেপাড়ার সঙও এই অবলুপ্তি থেকে রক্ষা পায়নি।

কত যে পরিবর্তন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কোথায় সেই মাধববাবুর বাজার! আজ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ বিল্ডিং'। পূর্বেই বলা

[illegible]বাজার স্ট্রীটের টিকটিকির বাজারে জেলেপাড়ার সঙ কিছুক্ষণ বিশ্রাম [illegible] সেখানে বসে মিষ্টি মুখ করে, বিড়ি-তামাক-পান খেয়ে আবার সঙের দল পথ-পরিক্রমায় বের হত। তখনও কলেজ স্ট্রীট বাজার হয়নি। জেলেপাড়ার মেড়া গির্জার বাজারটিকে সে-সময় বলা হত ভুবনপালের বাজার। এমনি আরও কত কিছু ছিল যা আমরা ভুলতে বসেছি। জেলেপাড়ার সঙ প্রসঙ্গে আজও আমরা মাঝে-মাঝে বৃদ্ধদের মুখে অনেক গল্প শুনতে পাই।

কিন্তু এইসব প্রত্যক্ষদর্শী বৃদ্ধদের যেদিন আমরা হারাবো তারপর জেলেপাড়ার সঙ সম্পর্কে হয়তো অনেক মিথ্যা কাহিনী ইতিহাস হয়ে দাঁড়াবে। সেই কারণে সঙের গান, ছড়া ইত্যাদি ও অন্যান্য তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি এবং তথ্যসংগ্রহের কাজে অগ্রসর হয়ে জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সংস্রবে এসেছিলাম। জেলেপাড়ার সঙের ইতিহাস, গান ও ছড়া বিষয়ে সব-কিছুই তিনি জানতেন এবং সঙের শোভাযাত্রা পরিচালনা ব্যাপারে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি অকৃপণভাবে তথ্যাদি দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলেন, সেজন্য সম্প্রতি লোকান্তরিত বিশ্বাস মহাশয়ের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

জেলেপাড়ার সঙ সম্পর্কে সেকালের একটি সংবাদপত্রে[২২] নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল :

"Ring out the old
New year's Procession Passed off Peacefully

The passing of the Bengalee New year in Calcutta on wednesday was marked by the annual pantomime procession popularly known as the 'Jeliapara Sang' and the 'Charak Mela' in the suburbs.

According to their time honoured custom the Hindus, young and old, observe the day with deep devotion and piety. This day they forget their past disputes and embrace each other—friend and foe alike to begin a new chapter of their life with the advent of the new year.

With the dawn of the day hundreds of Hindus were seen proceeding to the river Ganges, where they offer their

usual bath, distributed alms to the poor and offered Pujas at the temple.

The Jeliapara Pantomime

In the afternoon thousands of men, women and children —thronged the route through which the procession passed. The whole of College Street from the Bowbazar crossing to Harrison Road junction was a seething mass of humanity all waiting for the procession to pass by house-tops and balconies were groaning under human load, while hundreds of spectators stood on the carriage-roof or sat on the branches of the roadside trees to have a full view of the procession.

The procession with various kinds of cartoons and Society-sketches left their headquarters in Akkur Dutt Lane in Wellington Square at 3 o'clock in the afternoon and proceeded through Wellington Street, College Street, Harrison Road, Amherst Street and returned to headquarters through Nebutalla Street at about 9 P.M. Through the route there is a solitary mosque adjoining the Medical College and the processionists passed by the mosque without playing music. The processionists were seen passing along the route in different batches and singing humourous songs and reciting topical sketches surrounded by thousands of spectators who, in holiday attire, followed them through the route, cheering the reciters at regular interval. The most interesting of the cartoons were "Village reform", "Quack doctor", "Briefless vakil", "Modern youngman", "Kalir Avatar", and the "Priest and his wife".

This procession it will be remembered was abandoned last year owing to communal trouble and the police this year did not leave anything to chance and took special precautions to guard against any untoward happenings.

The procession passed off peacefully."

বাংলা ১৩৩২ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুন জেলেপাড়ার সঙ অন্যান্য বছরের মতো রাস্তায় বেরোতে পারেনি এবং সেই কারণে কবিতাটি সবাই

মহাশয়ের বাড়ির উঠানে সঙের অভিনয় ও ছড়া কাটানো হয়েছিল। পরবর্তী বৎসর বহু সাধ্য-সাধনার পর পুলিশের কাছ থেকে সঙের সাধারণ পরিক্রমার রাস্তা মেছুয়াবাজার স্ট্রীট-এর পরিবর্তে হ্যারিসন রোড দিয়ে সঙ ফিরে আসার অনুমতি লাভ করেছিল। মিছিলের এই পথ-পরিবর্তনের বিষয়ে একটি সংবাদপত্র[২৬] নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন :

"Moving Pantomime"
Annual Procession in Calcutta

The Jelliapara Sang (Pantomime) which is held annually on the last day of the Bengali year, passed off peacefully in Calcutta yesterday. Last year, the procession did not come out owing to the acute communal tension prevailing at the time and this year the route was modified so as to avoid Mechuabazar where Mohammedans predominate."

প্রসঙ্গত নিম্নলিখিত ছড়াটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

এখন জ্বরের নাইক সাইন,
টেম্পারেচার নাইনটি নাইন,
আইন কিম্বা কুইনাইন
করছে অবস্থা নর্মাল্।
কমিশনার স্যার টেগার্ট,
(যার) মাথায় আছে পার্ট,
আর বুকের ভিতর হার্ট
এই দিশি আর্টটা রাখতে বজায়
অর্ডার দেছেন ফর্মাল॥

এইরকম বহু গান ও ছড়া ফেলে-আসা দিনের নানা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনে নানারকম পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বসু[২৭] লিখেছেন :

"১৯২৪ সালে এপ্রিল মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতার প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর দেশবন্ধু তাঁহার অভিভাষণে, বহু ভাবে ও বহু রূপে দরিদ্র নারায়ণের সেবাই যে কর্পোরেশনের আদর্শ তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ

২৬ *The Statesman*, April 14, 1927, page 5

করেন এবং এই আদর্শ কার্যে পরিণত করার জন্য সুচিন্তিত কর্মপন্থারও আভাস দেন।"

সেই সময় জেলেপাড়ার সঙ বলেছিল

নিত্য নতুন চাচ্ছে নেশন
দণ্ডে দণ্ডে ফিরছে ফ্যাসন
তাইতে ভাসান কর্পোরেশন
এপ্রেলেতে নতুন সেসন
খলল এবার মুন্সিপাল।

কর্পোরেশনের দুর্নীতি-প্রসঙ্গে জেলেপাড়ার সঙ মন্তব্য করেছিল :

নাশ কর্ত্তে কি আর দাস
এঁদের দাঁড় করালেন সি. আর. দাশ,
(তাই) লোকে কতই কচ্ছে আশ
এঁরা ঘুরবেন নাকো এ পাশ-ও পাশ,
থাকবেন সোজা পথে।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছিল :

ঝাড়ু দিয়ে ঝাড়ুদার, রাস্তা করে পরিষ্কার,
কর্ত্তে তাতে তিরষ্কার,
চাপরাসির আবিষ্কার, ওভারসিয়ার পান পুরস্কার,
চাপরাসিরে কর্ত্তে সুশাসন।
এই যে এত লোক লস্কর, এরা কি সবাই তস্কর ?
তাই প্রজার জীবন করে দুষ্কর, যো সো করে
কর বাড়াতে খোলা খাস বিচারাসন॥

সেকালের কলকাতায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল দুপুর একটার সময় কেল্লা থেকে তোপের গর্জন। ওই সময় তোপের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জেলেপাড়ার সঙ ছড়া কেটেছিল :

আবার দেখুন একটার তোপ,
একদম হয়ে গেল লোপ,
টাইমের ঘাড়ে ইকোনমি
দিলে কোপ জোরসে।

২৭ শ্রী উপেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, (১৩৫৪), পৃষ্ঠা ৪৮

তীর্থস্থানে লম্পট ও নেশাখোরের উপদ্রব বাড়তে দেখে জেলেপাড়ার সঙ কশাঘাত করতে ছাড়েনি। সঙের মুখ দিয়ে বলা হয়েছিল :

দেবতারা সব নিদ্রাগত,
নৈলে মানুষের কি সাহস এত
Garden Party চলছে কত
কালীঘাটের পীঠস্থানে।
আগুনের জ্বালা ধরে অঙ্গে
দেখে দেখে পুণ্যভূমি সাধের বঙ্গে
রঙ্গিণী ভঙ্গিনী সঙ্গিনী সঙ্গে
ভদ্দর মদ্দরা যান সাগর সঙ্গম স্থানে।
এই শিবরাত্রে সেই দিন,
দেখে এসেছে এই দীন,
বাবুবেশে কত লজ্জাহীন
ঘোমটা খোলা খেমটা নাচ
নাচাচ্ছেন তারকনাথে বসে।
পূজতে যেথা সতীনাথে
কত সতী পতি সাথে
গঙ্গাজল বেলপাতা হাতে
গেছেন রোদে তেতে থেকে উপোসে॥

আ শু তো ষ মু খো পা ধ্যা য়ে র তি রো ধা নে

বাংলা ১৩৩১ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার (২৫ মে, ১৯২৪) দেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো এইদিন বাংলার পুরুষসিংহ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পাটনায় প্রাণত্যাগ করেন। সেদিন এই অপ্রত্যাশিত ও মর্মন্তুদ সংবাদ শুনে সারা দেশে হাহাকার পড়েছিল। শুধু বাংলাদেশের মানুষ কেন, সমগ্র ভারতবাসী এই মহীরুহ-সদৃশ মনীষীর লোকান্তরের আকস্মিকতায় রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ ও বিশেষ করে শিক্ষা-জগতের সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়ের কতখানি নিবিড় যোগ ছিল তা সেদিন তাঁর শবানুযাত্রায় হাজার-হাজার শোকার্ত মানুষের স্বতোৎসারিত শ্রদ্ধাঞ্জলির মর্মস্পর্শী দৃশ্য থেকেই প্রমাণিত হয়েছিল।

সেদিন দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই প্রতিভাবান পুরুষের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়েছিল।

দেশের অগণিত মানুষ সে-সময় নানাস্থানে শোকসভার আয়োজন করে শ্রদ্ধানতচিত্তে তাঁর স্মৃতিচারণ করে। পরে রসা রোডের নাম পরিবর্তন করে আশুতোষ মুখার্জী রোড রাখা হয়। চৌরঙ্গী ও ধর্মতলার সংযোগস্থলে অর্থাৎ বর্তমান চৌরঙ্গী স্কোয়ারে আজও এই বিরাট পুরুষের যে পূর্ণাঙ্গ ব্রোঞ্জ-মূর্তিটি বিরাজমান তা কারও দৃষ্টি এড়ায় না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনেও তাঁর মূর্তি রক্ষিত আছে। শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি ভবন 'আশুতোষ বিল্ডিং' নামে অভিহিত হল এবং ভবানীপুরে স্থাপিত হল আশুতোষ কলেজ ও স্মৃতি-মন্দির। এইরূপে নানাভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন দেশের মানুষ ও বহু প্রতিষ্ঠান। বাংলা ১৩৩১ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে জেলেপাড়ার সঙ-ও এই নির্ভীক তেজস্বী পুরুষেব মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছিল। সঙের মুখ দিয়ে বলা হয়েছিল :

আজ শিবের গাজন শিবের ভজন
শিবের পূজন চড়ক-চৈত্র শেষে।
হায়! হায়! আশুতোষের পূজোয় বসে
দেখি আশু নাইকো দেশে
    আমাদের আশু নাইকো দেশে॥
কোত্থেকে এলি কাল হাঁ করে গাল
    একতিরিশ সাল,
দিতে দিকপাল ধরে কালের গরাসে।
জগতে যার নাম ঘোষে
জ্ঞান জিনে বিশ্বকোষে
বিদ্যাবীর সেই আশুতোষে
করলি নিধন (ওরে) রোষে না তরাসে।
মনে হলে কোন আফসোস
বড়কেই লোকে দেয় দোষ
তাই কি তুমি করে রোষ
বাঙালীর আদরের আশুতোষ
না বলে না কয়ে লুকালে অন্তরে ?

বুঝি তোমার ছিল বিশ্বাস
শুনলে বাংলা শেষ নিশ্বাস
হবে মূর্চ্ছাপন্ন হতাশ্বাস
তাই পাশ কাটিয়ে চলে গেলে
যেন অন্তর্ধান মন্তরে।
পাটনা! তুমি কি আতঙ্কে
আশুতোষে পেয়ে অঙ্কে
ডুবে গেলি ঘোর কলঙ্কে
বাংলার সেই শশাঙ্কে কবলি রাহু গ্রাস।
অসুরেব দর্পচুর,
আশুতোষ যে মহাসুর
তেজে মর্ত্তোর ভবানীপুর
কৈলাসে ভবানীপুরে করছেন এখন বাস॥

সঙের ছড়া নিয়ে মামলা

সেকালের মানুষের মধ্যে সহজ ও শান্তিপূর্ণ জীবনধারণের সঙ্গে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের অবতারণাও কম হত না। কষ্ট হলেও অনেকে সঙ সেজে অপরকে আনন্দ দিতেন এবং তাব জন্য উৎসাহ উদ্দীপনারও অন্ত ছিল না। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন এইসব মানুষ, তাই তাঁদের পক্ষে চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গরমে মাথার ওপর মধ্যাহ্নের খররৌদ্র নিয়েও সঙ সেজে রাস্তায় নামা সম্ভব হত।

অন্যকে নিছক আনন্দ দেবার জন্য কত না আগ্রহ, কত না আয়োজন! পথে-ঘাটে বিশাল জনতা, যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়, বাতাস বন্ধ হবার উপক্রম—এরই মধ্যে জেলেপাড়ার সঙের কুশীলবরা কষ্ট করে পথের মানুষকে আনন্দ দান করতেন। তখনকার দিনে সঙের পরিক্রমার ট্রাম-রাস্তা ছিল পাথর-বাঁধানো। পাথর রোদে তেতে গরম হয়ে থাকত, তার ওপর দিয়ে খালি পায়ে চলা খুব সহজ ছিল না; কিন্তু সঙের দল পায়ে ঘুঙুর বেঁধে খালি পায়েই নাচতে নাচতে এগিয়ে যেত।

সেকালে দূরের মানুষকে শোনাবার জন্য এখনকার মতো লাউডস্পীকারের ব্যবস্থা ছিল না। দূরের মানুষ যাতে শুনতে পায় সেজন্য সঙ চিৎকার করে ছড়া

কাটত আর দর্শকরা বিশেষ আগ্রহ-সহকারে দাঁড়িয়ে সেইসব ছড়া ও গান শুনত। কৌতুকপ্রিয়তা তখনকার সর্বস্তরের মানুষের প্রাণধর্মের অন্যতম সহজ ও সুস্থ লক্ষণ বলে পরিগণিত হত। হাসির কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করত না কেউ। প্রাণখোলা হাসি ও ব্যঙ্গ-পরিহাসই ছিল যুগধর্ম, এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলে জেলেপাড়ার সঙকে সর্বরসের ভাণ্ডারী বললে বিশেষ অত্যুক্তি হবে না।

জেলেপাড়ার সঙের কর্তৃপক্ষরা তাঁদের ব্যবহৃত ছড়া বা পালা ছাপিয়ে বের করতেন না। তখনকার দিনের বহু শক্তিশালী লেখক ও কবি জেলেপাড়ার সঙের ছড়া, গান ও পালা লিখেছিলেন। ১৩২১ সাল থেকে যে-সব লেখক ও কবি গান বা ছড়া লিখেছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, রসময় লাহা, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, শরৎ পণ্ডিত, মনোমোহন গোস্বামী, সতীশচন্দ্র ঘটক, নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন এবং কবিশেখর কালিদাস রায়। অধিকাংশ গানে সুর দিয়েছিলেন ভূতনাথ দাস।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জেলেপাড়ার সঙের কর্তৃপক্ষরা ছড়া বা পালা ছাপাতেন না। কিন্তু সেকালের কোন-কোন ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন লোক নিজেরাই দু-চারটে ছড়া লিখে তা পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে বিক্রি করতেন। সেইসব পুস্তিকার পৃষ্ঠাঙ্ক ষোল থেকে আটচল্লিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। দাম নির্ধারিত হত দুই পয়সা থেকে পাঁচ পয়সা। এই ধরনের পুস্তিকার কোন-কোনটিতে সোডা-লেমনেড কিংবা আয়ুর্বেদীয় ওষুধের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত।

পুস্তিকাগুলির মলাটে মুদ্রিত থাকত 'চৈত্র-সংক্রান্তির ছড়া', 'চড়ক-সংক্রান্তির ছড়া', 'চৈত্র মাসের ছড়া' ইত্যাদি। কোন-কোন পুস্তিকায় জেলে-পাড়ার সঙের প্রথম দিকের অর্থাৎ প্রায় শতবর্ষ পূর্বেকার কিছু-কিছু গান সংকলিত হত। এইসব পুস্তিকা প্রসঙ্গে জেলেপাড়ার সঙ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও ওয়াকিবহাল ব্যক্তি জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ও বলেছেন যে, সেকালে এক শ্রেণীর ব্যবসা-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছড়া ও গান রচনা করে বইয়ের আকারে ছাপিয়ে সেগুলি বিক্রি করতেন। তাঁদের সঙ্গে জেলেপাড়ার সঙের কর্তৃপক্ষের কোন সম্পর্ক ছিল না। সাধারণত এই বইগুলিকে বলা হত 'বটতলার বই'। ওইসব বইয়ের অন্তর্ভুক্ত রচনাকে যদি কেউ জেলেপাড়ার সঙের ছড়া বলে মনে করেন তাহলে ভুল হবে। আলোচ্য বইগুলিতে মুদ্রিত কোন-কোন ছড়া ও গানের মধ্যে প্রায়ই জেলেপাড়ার সঙের ছড়া ও গানের কয়েক ছত্র বা তার অনুকরণে কিছু দুর্বল রচনা জোড়া-তালি

দিয়ে ওইসব ব্যবসায়ীরা বেশ ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন। অবশ্য এইরূপ কোন-কোন পুস্তিকায় জেলেপাড়ার সঙের ১৩২১ সালের আগেকার কয়েকটি ছড়া ও গান অবিকৃত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল না।

বাংলা ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে 'জেলেপাড়ার সঙ' নামে এইরূপ একটি চটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির প্রথমেই উল্লেখ আছে :

জেলেপাড়ার সঙ বের হচ্ছে শুনে
লোকের মুখে,
বৎসরের হিসাব নিকাশ সবার কাছে
নিয়ে এলুম বুকে।
একটি আনা খরচ করে
নিয়ে যাও যতনে ধরে।
মনের সাধে বসে
পড়ে শুনাও সবার ঘরে।

অথচ কলকাতায় দাঙ্গার জন্য উক্ত বছরে কোন সঙ রাস্তায় বের হয়নি ; সেই কারণেই তার পরের বছরে সঙের মুখ দিয়ে বলা হয়েছিল :

বিগত বত্রিশ সন
পাননি সঙ-এর দরশন,
তার কারণ, পুলিশের বারণ—
ক্ষমা ভিক্ষা তাই করছি নিবেদন।

সম্প্রতি লোকান্তরিত জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় আমাদের জানিয়েছিলেন যে, ১৩৩২ সালের প্রকাশিত 'জেলেপাড়ার সঙ' বইটি দেখে যদি কেউ মনে করেন এটি সত্যিকারের জেলেপাড়ার সঙের বই, তাহলে ভুল হবে।

মনোমোহন গোস্বামী লিখিত 'হোমরুল' পালা জেলেপাড়ার সঙের কর্তৃপক্ষরা গ্রহণ করেছিলেন ও সঙের মুখ দিয়ে উক্ত পালার ছড়া কাটানো হয়েছিল। কিন্তু সে-বছর, অর্থাৎ ১৩২৪ সালে, সঙের পরিক্রমার পথে অনেকের চোখে পড়েছিল 'জেলেপাড়ার সঙ' বইটি। ওই বইতে মনোমোহন গোস্বামী লিখিত 'হোমরুল' পালার ছড়া ও গান ছাপিয়ে রাস্তায় বিক্রি করা হচ্ছিল। বইটি দেখে জেলেপাড়ার ছেলেরা আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং বহু তর্ক ও চিৎকারের পর শেষ-পর্যন্ত তৎকালীন জেলেপাড়ার সঙের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওই বইয়ের প্রকাশকের বিবাদ ঘটে এবং সেই বিবাদের ধাক্কা পুলিশ থেকে কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিল।

মনোমোহন গোস্বামী ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা লেখক এবং অভিনেতা। কয়েকটি নাটকও তিনি লিখেছিলেন। মনোমোহন গোস্বামী প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত[২৮] লিখেছেন, "১৯০৫ সালের ৬ই মে (১৩১২, ২২শে বৈশাখ) মনোমোহন গোস্বামী মহাশয়ের 'পৃথ্বীরাজ' লইয়া অমরেন্দ্রনাথ গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের উদ্বোধন করিলেন। 'ঘুঘু' প্যান্টোমাইনও সঙ্গে ছিল।"

এইসব বই বা পুস্তিকা প্রসঙ্গে জেলেপাড়ার সঙের উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকরা জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়ে একটি সংবাদপত্রে[২৯] যে-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত হল :

"কলিকাতায় জেলেপাড়ার সং

৩০শে চৈত্র রবিবার 'জেলেপাড়ার সং' নিম্নলিখিত রাস্তা দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইবে। রমানাথ কবিরাজ লেন, ঠাকুরদাস পালিত লেন, অক্রুর দত্ত লেন, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট (নেবুতলা), শাঁখারীটোলা লেন, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন ও ঠাকুরদাস পালিত লেন হইয়া রমানাথ কবিরাজ লেনে আসিবে। আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাজারে 'জেলেপাড়ার সং' নামে যে বই বিক্রয় হয় তাহা আমাদের বই নহে, আমাদের সং-এর কোন বই বাহির হয় না। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস ও শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র গরাই, ২৩।২, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা।"

ফকিরচাঁদ গরাই

জেলেপাড়ার ফকিরচাঁদ গরাই ছিলেন একজন প্রকৃত হৃদয়বান্ মানুষ। পেশায় একজন প্রসিদ্ধ মৎস্য-ব্যবসায়ী হয়েও পল্লী এবং সমাজের উন্নতির জন্য তিনি নানাভাবে অর্থব্যয় করতেন, কিন্তু ঢাক পিটিয়ে সেই দানের কথা কখনও জাহির করতেন না। তাঁর সকল দান একান্ত গোপনে প্রদত্ত হত, কিন্তু পল্লীবাসীর কাছে এই মহৎ হৃদয়ের কথা গোপন ছিল না। জেলেপাড়ার সকল পল্লীবাসী তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। শুধু তাই নয়, তিনি পল্লীবাসীর একান্ত ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় এবং পরিচালনায় বহু দিন বন্ধ থাকার পর ১৩২০ সালে জেলেপাড়ার সঙ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেছিল।

২৮ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৯৪৭), পৃষ্ঠা ২২১

২৯ বঙ্গবাণী, ২৫ চৈত্র, ১৩৩৬ সাল (৮ এপ্রিল, ১৯৩০ সাল) পৃষ্ঠা ৩

এ-কথা না বললেও চলে যে, জেলেপাড়ার সঙ ছিল সারা বাংলাদেশের গৌরবের বস্তু। ফকিরচাঁদ ছিলেন জেলেপাড়ার সঙের প্রধানতম উদ্যোক্তা, এক কথায় দলপতি। কলকাতার কৈবর্ত সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতারও একান্ত আপন-জন ছিলেন তিনি।

১৩২৫ সালে ভাদ্র মাসে জেলেপাড়ার সঙের প্রাণপুরুষ ফকিরচাঁদ গরাই ইহলোক ত্যাগ করেন। ওই বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন জেলেপাড়ার সঙের যে-মিছিল বের হয়েছিল তাতে ফকিরচাঁদের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ করে ছড়া কাটানো হয়েছিল।

সে-বছর অন্যান্য উদ্যোক্তারা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সঙ বের করেছিলেন এবং অপরাপর কর্মী ও অভিনেতারা একটা নিয়ম রক্ষার জন্যই যেন সঙ সেজে পথে নেমেছিলেন। ফকিরচাঁদকে হারিয়ে জেলেপাড়ার, তথা কলকাতার মানুষ সেদিন সত্যি-সত্যি মনোবেদনায় ফকির হয়েছিলেন।

অমৃতলাল বসু

জেলেপাড়ার সঙের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যাঁরা-যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল বসু অন্যতম। তিনি এই দলের জন্য বহু ছড়া ও গান লিখেছিলেন। তাঁর সরস রচনা জেলেপাড়ার সঙের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। অমৃতলাল ছিলেন বাংলা মঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের প্রতিভাবান্ পুরুষ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনায় তাঁর একরকম স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা ছিল। তিনি জেলেপাড়ার সঙকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে জেলেপাড়ার সঙ তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে ত্রুটি করেনি। ১৩৩৬ সালের বর্ষ বিদায় জানাতে গিয়ে জেলেপাড়ার সঙের মুখ দিয়ে অমৃতলালের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছিল। ১৩৩৬ সালের জেলেপাড়ার সঙের সংবাদ সেকালের একটি কাগজে[30] ছাপা হয়েছিল। সংবাদটি হল এই :

"জেলেপাড়ার সঙ

নূতন নূতন গান ও ছড়া

সহস্র সহস্র লোকের সমাগম

গতকল্য রবিবার কলিকাতার চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে জেলেপাড়ার সং বাহির হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই এই চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে সং বাহির হইয়া থাকে।

৩০ বঙ্গবাসী. ১ বৈশাখ, ১৩৩৭, (১৪ এপ্রিল, ১৯৩০), পৃষ্ঠা ৬

এই উপলক্ষে বহু সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। সহস্র সহস্র মহিলা ছাদের উপর বসিয়া এই তামাশা দেখিয়া থাকেন, বহু লোক মফঃস্বল হইতেও ইহা দেখিতে আসেন। ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিল এবং কলিকাতার জেলেপাড়ার সং প্রসিদ্ধ।

বেলা ১টার সময় সং বাহির হইবার কথা ছিল। বেলা ১১টার সময় হইতেই ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড ইত্যাদি রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। বেলা ১ ঘটিকার মধ্যে ট্রাম-বাস সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বহু দোকানদার এই উপলক্ষে নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী, খেলনা, বাঁশী ইত্যাদির দোকান খুলিয়া প্রচুর বিক্রয় করিয়াছে। বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে জেলেপাড়া হইতে সং বাহির হয়।

অন্যান্য বৎসর রসরাজ ৺অমৃতলাল এই উপলক্ষে নানা প্রকার ছড়া ও গান রচনা করিয়া দিতেন। এবার রসরাজ নাই। কিন্তু তাহা সত্বেও গতকল্য যে সকল সং বাহির হইয়াছিল তাহা সকলের প্রাণেই একটা নূতন ভাবের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। এবারকার ছড়াতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। জেলেপাড়ার সং-সম্প্রদায় জাতীয় ভাবের প্রচারের প্রচেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া সকলেই যারপরনাই সুখী হইয়াছেন। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহারা এইরূপ জাতীয় প্রচেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইবেন না।

জেলেপাড়ার সং যাঁহারা এ বৎসর পরিচালিত করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র গরাই, শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস ও শ্রীযুত জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।"

১৩৩৬ সালে শেষবারের মতো জেলেপাড়ার সঙ বের হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আর কখনো এই সঙ রাস্তায় বের হয়নি।

জেলেপাড়ার সঙ আরো একবার বন্ধ হয়েছিল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ যে-বছর কলকাতায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিয়েছিল। তারপর ১৩২০ সালে পুনরায় তা আত্মপ্রকাশ করে। পরে ১৯২৬ সালে (বাংলা ১৩৩২ সালে) কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য সঙ বের হতে পারেনি।

রক্ষণশীলের ভূমিকায় জেলেপাড়ার সঙ

সেকালে বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে চুল ছোট করে ছাঁটার শখ দেখা দিতেই সঙের মুখ দিয়ে শ্লেষ করা হয়েছিল। গ্রামের চাষী সেজে তার মুখ দিয়ে আক্ষেপ করতে শোনা গিয়েছিল :

আমার পদ্মমুখী মন্দ সেজে
ফেলবে ছেঁটে চুল।
বন উজাড় করে কার লেগে আর
আনব পেড়ে ফুল॥
শহর থেকে আসবে শুনি
সভ্য হবার ঢেউ,
বউ ছুঁড়ি চুষবে বিড়ি
ঘুচিয়ে মুখের মউ।
(তার) হাঁটুর নিচে নামবে না আর
রঙীন শাড়ীর ঝুল॥

সে-বছর সারা ভারতবর্ষে কন্যার বিবাহের নিম্নতম বয়স ধার্য করে আইন প্রচলিত হল। সেই আইন 'শারদা আইন' নামে পরিচিত। সর্দার হরবিলাস শারদা এর প্রণেতা। রক্ষণশীল জেলেপাড়ার সঙ ১৯২৯ সালে এরও প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল :

বিয়ে নয় ঠাকুর পুজো সোজা ছেলেখেলা,
বর-কনের চোখের কোণে মন-মজানো মেলা।
(তাই) না উঠলে পালক না-বালককে মেয়ে দেওয়া
শুনছি বিষম ভুল,
বিয়ে বিয়ে করে যখন মেয়ে হবে পাগল,
তখন তারে ধরে দেবে জুটিয়ে একটা ছাগল।
না হলে গোল বাধাবে হরবিলাস,
দারোগা দেখাবে রুল॥

জেলেপাড়ার সঙ জনসাধারণের মধ্যে নিছক আমোদ-প্রমোদ বিতরণের উদ্দেশ্যে গঠিত রক্ষণশীল ভাবাপন্ন সামাজিক সংস্থারূপে পরিগণিত হত তা পূর্বেই বলা হয়েছে। রাজনীতির তরঙ্গের—তা উত্তালই হোক কিংবা মৃদুই হোক—সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকলেও পরোক্ষভাবে তার একটি গঠনমূলক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। সেকালে জেলেপাড়ার সঙ তাই ছড়া কেটে বলেছিল ·

মৎস্যে লক্ষ্য রেখে চক্ষে,
বাবুদের সুখ ধরে বক্ষে,

আর মা লক্ষ্মীদের এয়োত রক্ষে,
ঝোলে ঝালে অম্বলে ভাজায়।
জল ছেড়ে মুছে গাত্র,
সাজি সংয়ের সহযাত্র,
এই নগরের পাত্র-পাত্রে
জমাতে মজায়॥

এই প্রসঙ্গে এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জেলেপাড়ার সঙের প্রভাব বহুভাবে বহু ক্ষেত্রেই বিস্তৃত হয়েছিল। বাংলাদেশের অনেক শহর এবং গ্রাম থেকেও জেলেপাড়ার অনুকরণে অনুরূপ সঙ বের হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইগুলিতে জেলেপাড়ার সঙের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায় এবং তার গান ও ছড়ার দু-চারটি কথা অদল-বদল করে অনুকরণ করা হত। যেমন, ১৩৪৪ সালে কাসুন্দিয়ার সঙের একটি গানের ('যুগের হাওয়া') এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

পু : পদ্মমুখী মদ্দ সেজে ফেলবে কেটে চুল,
স্ত্রী : বোলতামুখো মাগী সেজে বাঁধবে এলো চুল।
পু : দুদিন পরে টানবি বিড়ি প'রবি পাঞ্জাবি,
স্ত্রী : তোরাও তো বাদ যাবি না প'রবি নাক্‌ছাবি।
(উভয়ে) দু'দিন কেবল কর না সবুর সভ্যতার এ
ভাঙবে ভুল।

জেলেপাড়ার সঙের 'আমার পদ্মমুখী মদ্দ সেজে ফেলবে ছেঁটে চুল' গানটি সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে জেলেপাড়ার সঙের গান ও ছড়া সেকালে কত জনপ্রিয় ছিল।

খিদিরপুরের সঙ

বর্তমান খিদিরপুর অঞ্চলের মনসাতলা আর প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার মনসাতলার কথা শুনলে অনেকেই বিস্মিত হবেন, এ-কথা না বললেও চলে। শুধু মনসাতলা কেন, তখন খিদিরপুরের চারিদিকে ছিল অজস্র পুকুর ও ডোবা এবং ছোট-বড় অনেক বাগান। বর্তমানের মতো এত

রাস্তা ও গলি তখন ছিল না। অধিকাংশই কাঁচা রাস্তা, পাকা রাস্তা বলতে ছিল কয়েকটি ইঁট-খোয়া-ফেলা পথ। চারিদিকে মাটির ঘর এবং টিন ও খোলার বস্তি। এক বস্তি থেকে আর-এক বস্তিতে কাঁচা অপরিসর পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হত। ধনীদের বড় পাকা বাড়ি সেকালে যে ছিল না তা নয়। কিন্তু তার সংখ্যা তখন খুব কম।

প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বে খিদিরপুর থেকে সঙ বের হত। পঁচিশ-তিরিশ বছর হল সেই সঙ বের হওয়া বন্ধ হয়েছে। খিদিরপুরের এই সঙকে বলা হত 'এম-তলা, এন-বাগান (মনসাতলা, নারকেল-বাগান)-এর সঙ'। সেকালের নারকেল-বাগান বস্তি অর্থাৎ তরফদার ট্যাঙ্ক ফার্স্ট লেন (পরে উক্ত গলির গণেশ সরকার লেন নামকরণ হয়) থেকে সঙ বের হত। এই সঙ বের করতেন শ্রী হরিপদ সেন এবং তাঁকে যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কয়েক জনের নাম, বিশেষ করে মন্মথনাথ তরফদার, সন্তোষকুমার অধিকারী প্রভৃতি পল্লীবাসীর নাম উল্লেখযোগ্য।

খিদিরপুরের সঙ একাদিক্রমে পর-পর তিন দিন বের হত। চৈত্র-সংক্রান্তি, ১ বৈশাখ ও ২ বৈশাখ। ২ বৈশাখের সঙকে বলা হত বাসী সঙ।

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন দুপুরে মেথর-ঝাড়ুদার সেজে সঙ বের হত। সারা বছরের দুঃখ-বেদনা, বিষাদ ও মনের কালিমা সাফ করার প্রতীক হিসাবেই গ্রহণ করা হত 'মেথর-ঝাড়ুদারের' রূপ। সঙ সাজবার জন্য অনেকে শখের ঢেউ খেলানো বাবরি চুলও কামিয়ে ফেলত। ঝাঁটা-বুরুশ, কোদাল-ঝুড়ি, ময়লা ফেলার গাড়ি, সবই ছিল সঙের নিজস্ব জিনিস। ওইসব নিয়ে সঙের দল গান ধরত :

ধাঙড় মেথর আমরা মশাই থাকি শহরে,
বাবুয়ানা করে মশাই আমাদের মেরে।
জমাদারের মেয়ের বিয়ে, খাবেন সব ভদ্র গিয়ে,
নিমন্ত্রণ করছি মশাই মিনতি করে।

এই গান গেয়ে জানিয়ে দেওয়া হত— ১ ও ২ বৈশাখ সঙ বের হবে।

খিদিরপুরের সঙ কেন বের হল, এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ শ্রী হরিপদ সেন মহাশয় বলেছেন, "সেকালে খিদিরপুর অঞ্চলের অধিকাংশ ধনীদের অহংকার ও সাধারণ মানুষের প্রতি কী ধরণের ঘৃণা ও জঘন্য ব্যবহার ছিল সেকথা আজ সংক্ষেপে বলে শেষ করা যাবে না। ধনীরা নানাভাবে

গরিবদের অপমান করত। কিন্তু ওরাই ছিল সেদিন সমাজের মাথা, যেহেতু ওদের টাকা ছিল। ওদের আসল রূপ সমাজের কাছে ধরিয়ে দেবার জন্য আমরা অর্থাৎ সাধারণ খেটে-খাওয়া গরিব মানুষেরা সঙ বের করেছিলাম।"

শ্রী সেন আরও জানিয়েছেন যে, সেকালে সমাজচেতনা-মূলক ছড়া ও গান রচনা করে তাঁরা সঙের মুখ দিয়ে তা সকলকে শোনাতেন। যেমন, 'মিটিংকা কাপড়া' নাম দিয়ে একটি গানও রচিত হয়েছিল। কোন-এক নেতা বাড়ির কাপড়-জামা ইত্যাদি সব-কিছু বিলাতী জিনিস ব্যবহার করতেন। কিন্তু জনসভায় আসতেন খদ্দর পরে। সেই কারণেই রচিত হয়েছিল এই 'মিটিংকা কাপড়া' গান।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় খিদিরপুরের সঙের একটি ছড়া সেদিন ওই অঞ্চলের লোকের মুখে-মুখে ঘুরত। ছড়াটি হল :

বউমা আমার সেয়না মেয়ে
চরকা কিনেছে।
ঘরের কোণে আপন মনে
সুতো কেটেছে॥

খিদিরপুরের সঙের ছড়া ও গান রচনা করতেন শ্রী হরিপদ সেন, শ্রী মন্মথনাথ তরফদার ও গোলোকবাবু। সঙ প্রতি বছর ৬।১ তরফদার ট্যাঙ্ক ফার্স্ট লেন (নারকেলবাগান বস্তি) থেকে বের হয়ে মনসাতলা, গঙ্গাধর ব্যানার্জী লেন, হরিসভা লেন, রামকমল মুখার্জী স্ট্রীট, বেড়াপুকুর, রমানাথ পাল রোড, পদ্মপুকুর, বিশুবাবু লেন, মোহনচাঁদ রোড, মাইকেল দত্ত স্ট্রীট হয়ে তরফদার ট্যাঙ্ক ফার্স্ট লেনে ফিরে আসত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সঙ দুপুরে বের হত। কিন্তু প্রতি বছর ১ ও ২ বৈশাখ সঙ বের হত সন্ধ্যা ছয়টায়। বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে আড্ডায় ফিরে আসতে প্রায় রাত একটা থেকে দেড়টা বাজত। সঙের সঙ্গে থাকত কয়েকটি গ্যাসের আলো। সাধারণত পায়ে হেঁটে ঘুরলেও কয়েকটি সঙের জন্য রিক্শার ব্যবস্থা করা হত। কয়েক বছর কয়েকটি বিশেষ সঙের জন্য গরুর গাড়িরও ব্যবস্থা হয়েছিল। এদের সঙ্গে থাকত নানারকম বাদ্যযন্ত্র, আর এইসব সঙ দেখবার জন্য বিভিন্ন পথে, বাড়ির অলিন্দে ছাদে নানা মানুষের রীতিমতো ভিড় হত।

খিদিরপুরের আর-একটি সঙের দল বের হত ভূকৈলাস রোড থেকে। এই সঙ

কয়েক বছর বের করেছিলেন পূর্ণচন্দ্র আঢ্য মহাশয় এবং তারপর তা বন্ধ হয়ে যায়।

পদ্মপুকুরের গোষ্ঠমেলার সঙ

পূর্বে খিদিরপুর পদ্মপুকুরে সঙের মেলা বসত। এই মেলার সঙ সেকালে গোষ্ঠমেলার সঙ নামে পরিচিত ছিল। পদ্মপুকুরে ময়ূরপঙ্খী নৌকা সুন্দর করে সাজিয়ে সঙ তার উপর বসে গান গাইত। তা ছাড়া সেকালে এই অঞ্চলে সারি গানও গাওয়া হত। স্থানীয় পল্লীবাসীরা চাঁদা করে পদ্মপুকুরের ময়ূরপঙ্খী নৌকা, সঙ, গান এবং নানারকম উৎসবের ব্যবস্থা করতেন।

বাংলা ১৩৩০ সালের গোষ্ঠমেলার সঙের যে-সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ওই সঙ এবং মেলার জন্য পল্লীবাসীরা একটি সমিতি গঠন করে, চাঁদা উঠিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। ১৩৩০ সালে সঙ পরিচালনার জন্য সম্পাদক ও কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন যথাক্রমে পান্নালাল দে ও সারদাপ্রসাদ চন্দ্র। তা ছাড়া যাঁদের সাহায্যে সেই বছর উক্ত অনুষ্ঠান হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন পুরঞ্জন ঘোষ ও অন্যান্য পল্লীবাসীরা।

পদ্মপুকুরের চারিদিকে প্রশস্ত এলাকায় মেলা বসত। সঙ বের হত ১ বৈশাখ। সঙের মুখ দিয়ে বলা হয়েছিল :

বছরের প্রথম দিনটা,
থাকিস্‌নি হয়ে ক্ষীণটা।
ভগবানের এ চিড়িয়াখানা,
ছুটো ডিগবাজি খানা।

পদ্মপুকুরে নানারকম সঙের অবতারণা হত। ছোট-ছোট ছেলেরা কৃষ্ণ, বলরাম এবং রাখাল সেজে মেলার চারিদিকে ঘুরত। সঙ সে-সময় গান ধরত :

উঠ উঠ ও নিপট কপট ও কাল কানাই,
গোকুল আকুল বড়, ব্যাকুল হয়েছি তাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের জাগ-গানের কথা। জাগ-গান প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন[৩১] লিখেছেন :

৩১ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হারামণি, (১৯৬২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২৮/.

"জাগ গান উত্তরবঙ্গের প্রিয় গ্রাম্য গান। রাখাল বালকেরা সমস্ত পৌষমাস ধরিয়া রাত জাগিয়া দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া থাকে। জাগ গান পশ্চিমবঙ্গে আছে কিনা জানি না। জাগ শব্দটী সম্ভবতঃ জাগরণ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। গোরক্ষবিজয়ে 'জাগরণ' পাওয়া যায়। মধ্যযুগে আমরা ' মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে' জানিতে পাই। মঙ্গলচণ্ডীর গান রাত্রি জাগরণ করিয়া সম্পাদিত হইত। এবং জাগ গানও রাত্রি জাগরণ করিয়া গীত হয়। অন্য কোন গ্রাম্য গান রাত্রি জাগরণ করিয়া দলবদ্ধ ভাবে গীত হয় না। অবশ্য সাধারণ গ্রামবাসীদের পক্ষে রাত্রিই কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লইবার উপযুক্ত সময় এবং বিশ্রাম লইবার সময়ই আমোদ উৎসব করিবার পক্ষে শ্রেয়ঃ। পূর্ব্ববঙ্গে গ্রাম্য উপাখ্যান বা পরমকথা বা রূপকথা বলিবার প্রশস্ত সময় রজনী। সমস্ত পৌষমাস ধরিয়া জাগ গান গাহিয়া রাখাল বালকেরা সংক্রান্তির দিনে মাঠে যাইয়া উত্তরবঙ্গের সর্ব্বত্র এই উৎসব আহারাদির দ্বারা পরিসমাপ্তি ঘটায়। এই জাগ গান সোনাপীর, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করিয়া বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাখাল বালকদের গভীর যোগাযোগ রহিয়াছে।"

পদ্মপুকুরের গোষ্ঠমেলার সঙ বের করার কারণ প্রসঙ্গে উদ্যোক্তারা বলেছিলেন, "ধনীর নাক সিট্‌কানোতে সেখানে গরিবকে আড়ষ্ট হতে হয় না। বড় ছোটর এক আদর। প্রাণখোলা হাসি, মনখোলা মেলা-মেশা, অথচ ধর্মের ওপর তার ভিত্তি, তার নাম মেলা। ছোটকেই প্রকৃত বড় বলে জগতে প্রচার করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে রাখাল-বালকদের সঙ্গে বৃন্দাবনে যে লীলা করেছিলেন, সেই গোষ্ঠবিহারের পুনরাভিনয়ের মধ্য দিয়ে আনন্দময় পবিত্র দিনকে স্মরণ করার জন্যই সঙের মেলা।"

তালতলার সঙ

প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে কলকাতার তালতলা অঞ্চলের 'হাড়িপাড়া' থেকে সঙ বের হত। হাড়িপাড়ার বর্তমান নাম ডাক্তার লেন[৩২]। একদা তালতলা অঞ্চলের একটি বিরাট এলাকা হাড়িপাড়া নামে পরিচিত ছিল। পরে

৩২ A. K. Ray, *Census of India*, 1901, vol. VII, Calcutta, Town and Suburbs. part I. page III.

ডাক্তার লেন, ডাক্তার দুর্গাচরণ ব্যানার্জী লেন প্রভৃতি রাস্তার নামকরণ হয়। দুর্গাচরণ ডাক্তারকে সেকালের মানুষ 'সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি' মনে করতেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা।

দুর্গাচরণ ডাক্তার লেনের দু-পাশের অধিকাংশই ছিল খোলার বস্তি, মাটির ঘর। ওই গলিতে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা পাশাপাশি বাস করতেন। শোনা যায়, চৈত্র মাসে উক্ত গলির সংলগ্ন একটি মাঠে গাজনের সন্ন্যাসীরা সঙের আড্ডা করে নিতেন।

তালতলার গাজনের সন্ন্যাসীরা নানারকম সঙ সেজে ঘুরতেন। তা ছাড়া কালীপূজার দিনে তালতলা অঞ্চলের ডাক্তার লেন রাস্তাটি বহু মাটির পুতুল বা বসা-সঙ দিয়ে সাজান হত। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তালতলার বসা-সঙ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল এবং কলকাতার বিভিন্ন পল্লী থেকে বহু নর-নারী এই বসা-সঙ দেখতে আসতেন।

বেনেপুকুরের সঙ

কলকাতার ইন্টালি বাজারের সামনে দিয়ে আরও একটু দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে রাস্তার দু-ধারে সবুজ গাছের সারি। জোড়া গির্জা পেরিয়ে ইলিয়ট রোডের পূর্ব মুখে ও নোনাপুকুর ট্রাম-ডিপোর পিছনেই বিখ্যাত বেনেপুকুর পল্লী। বেনেপুকুর অঞ্চলেও এককালে বহু পুকুর ও ডোবা ছিল। উক্ত পল্লী থেকে চৈত্র-সংক্রান্তির ঠিক আগের দিন 'লীলাবতীর গান' ও সঙ বের হত।

প্রায় পঁচিশ বছর হল বেনেপুকুরের সঙ বের হওয়া বন্ধ হয়েছে।

বেনেপুকুরের সঙ বের হত রাত্রে। দুই ব্যক্তিকে হর-গৌরী সাজানো হত। হর-গৌরীর সঙ্গে বহু ব্যক্তি বিচিত্র রকমের সঙ সেজে রাস্তায় নানা রঙ্গ-রসের অবতারণা করত, সঙের সঙ্গে কয়েকজন আলো নিয়ে ঘুরত, কেউ-কেউ মেয়ে সেজে বরণডালা মাথায় করে বিভিন্ন পথে গান গেয়ে বেড়াত। সঙ্গে থাকত নানারকম বাদ্যযন্ত্র। ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রীট, বেনেপাড়া লেন, জাননগর রোড, বেনেপুকুর রোড, লিন্টন স্ট্রীট ঘুরে 'বাবা ঠাকুর তলা' শিবমন্দিরে গিয়ে পরিক্রমা শেষ হত।

তখনকার বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র লীলাবতীর পূজা হত। এখনও কোন-কোন স্থানে কলাবতীর পূজার ব্যবস্থা আছে। এই পূজার দিন সায়াহ্নে বাত্তি

দিতে হয়। গ্রামের মেয়েরা ওইদিন উপবাস করেন। চলতি কথায় বলা হয় নীলের উপোস। বাতিদানকে বলা হয় নীলের বাতি। এই প্রসঙ্গে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়[৩৩] বলেছেন, "কোথা হইতে লীলাবতী ও কলাবতীর পূজা চড়কের সহিত সংশ্লিষ্ট হইল তাহা বলা বড় সুকঠিন। ঐ লীলাবতীর পূজার দিন অষ্টমূর্ত্তির পূজা ও হোম হইয়া থাকে।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অন্যান্য অঞ্চলের মতো বেনেপুকুরেও অনেক পুকুর ও ডোবা ছিল। বাগান-বাগিচারও অভাব ছিল না, ফলে সমগ্র অঞ্চলটি জুড়ে স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশ বিরাজ করত। লিন্টন স্ট্রীটের বাবাঠাকুর তলার কাছে ছিল একটি পুকুর, আর বেনেপাড়া লেনের মধ্যে ছিল দুটি। বর্তমানে যেখানে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ সেইখানেও ছিল কয়েকটি পুকুর ও ডোবা। লিন্টন স্ট্রীটের যে-মুখ বর্তমানের সি. আই. টি. রোডে পড়েছে, পূর্বে ওই অঞ্চল হাতিবাগান নামে পরিচিত ছিল। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়[৩৪] লিখেছেন—"জনপ্রবাদ, এই কলকাতা আক্রমণের সময়, এই স্থানের একটি বাগানে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদলভুক্ত হস্তীগুলি রক্ষিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই 'হাতীবাগান' নামকরণ হইয়াছে।"

বেনেপুকুরের গাজনও বহুদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

শিবপুরের সঙ

প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে শিবপুরের কালীকুমার মুখার্জী লেন থেকে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সঙ বের হত। বিকেল চারটে নাগাদ সঙের দল বিভিন্ন সাজে পথে বেরিয়ে পড়ত; সঙ্গে থাকত নানারকম বাদ্যযন্ত্র। ধর্মতলা লেন, শিবপুর রোড, রামমোহন মুখার্জী লেন প্রভৃতি বিভিন্ন পথ ও পল্লী পরিক্রমার পর সঙের দল যখন কালীকুমার মুখার্জী লেনে ফিরে আসত সেই সময় প্রায় ভোর হয়ে যেত। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ রকম সঙ থাকত—যেমন, বেদে-বেদেনী, বরযাত্রী, জুয়াড়ী, ডাক্তার, ধনবান বাবু, চাঁদা আদায়কারীর দল, ইত্যাদি। গান ছাপিয়ে বিলি করার রেওয়াজও ছিল বলে শোনা যায়।

৩৩ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৮৪৩, পৃষ্ঠা ২৫

৩৪ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের, (১৯১৫), পৃষ্ঠা ৫৮৭

সেকালে শিবপুর গঙ্গার ঘাটে মহিলাদের স্নানের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল না। ধর্মপ্রাণা স্নানার্থিনীদের বাধ্য হয়ে অসংখ্য পুরুষদের পাশাপাশি স্নান করতে হত এবং শিবপুরের সঙ সেই কারণে নিন্দাসূচক ব্যঙ্গোক্তি করে গান বেঁধেছিল। মহিলা সেজে সঙ গান ধরত :

কেমন করে খোলা ঘাটে
নাইবো বল না।
শতেক ছোঁড়া ঘাটে আছে
হট্‌তে বল না॥

জুয়াড়ী রেস খেলে ফিরছে, পকেটে পয়সা নেই। ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে পা আর চলে না। পকেটে শুধু পড়ে আছে দুপুরে কেনা কয়েক দানা ছোলা-ভাজা। গাড়িভাড়ার পয়সাও নেই। উদাসভাবে জুয়াড়ী সেজে সঙ গান ধরত : "ঢোল ভেঙেছে, খোল ভেঙেছে", ইত্যাদি।

সমাজের আরও নানা প্রসঙ্গ সঙের মাধ্যমে পল্লীবাসীর সামনে তুলে ধরা হত, যেমন, বিয়ে-পাগলা বুড়োর কথা। বুড়ো বর সেজে সঙ চলত হাঁটতে-হাঁটতে আর ঘাড়-কাঁপা বুড়ো বরের সঙ্গে চলত একদল বরযাত্রী। মাঝে-মাঝে বরযাত্রীরা গান ধরত :

গণ্ডা ষোল বয়স হল,
বিয়ের বয়স কি গেছে চলে।
মেয়ের বাপের মান রেখেছি,
নিন্দুকেরা কি না বলে॥

তারপর বরযাত্রীর একজন গান ধরত :

ময়দা মাখ ময়েন দিয়ে।
ভাজ লুচি ভাল ঘিয়ে॥

সেকালের একশ্রেণীর অসৎ ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে এই শিবপুরের সঙ ছড়া কাটত। ওইসব অসৎ ব্যক্তি বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় বন্যা হলে গানের দল বের করে চাঁদা তুলত। পরে সেই টাকা নিজেরাই আত্মসাৎ করত। শিবপুরের সঙ তাদের লক্ষ্য করে বলেছিল :

চারিদিকে দেখি শুধু একি,
খাঁটি নেই সব দেখি মেকী।

বাবু সব রংদার সং,
মুখে ঝুটা বাত্, কত ঢং।

শোনা যায় শিবপুরের অধিকাংশ সঙের গান রচনা করতেন অমূল্যচন্দ্র দাস এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সঙের গানে সুর দিতেন এবং সঙের মিছিল পরিচালনা করতেন অমূল্যচন্দ্র দাস। তিনি কলকাতার সার্ভে জেনারেল অফিসে চাকরি করতেন এবং শিবপুরে 'অমূল্য মাস্টার' নামে পরিচিত ছিলেন। শিবপুরের সঙের দলের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন কণ্ট্রাক্টার। গৌরীবাবুর গান-বাজনার শখ ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গৌরীশঙ্কর নাট্যসমাজ। এই নাট্যসমাজের দ্বারা যাত্রাগান অভিনীত হত। অমূল্যচন্দ্র দাস উক্ত যাত্রার দলে মহিলা-চরিত্রে অভিনয় করতেন এবং ভালো নাচতেও পারতেন। গৌরীশঙ্করবাবু এবং অমূল্য মাস্টারের জন্যই ওই অঞ্চলের যুবকদের মধ্যে সংগীতচর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অমূল্যচন্দ্র দাস সঙের অভিনেতাদের গান-বাজনা শেখাতেন বলে সকলে তাঁকে 'মাস্টার' বলত। শিবপুরের সঙ প্রায় দশ বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে বের হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে জনৈক বৃদ্ধ পল্লীবাসী বলেছেন, "আজকালকার ছেলেদের কাছে সেইসব সঙের মিছিল বিস্ময়ের বস্তু। সঙের মাধ্যমে যেমন সমাজের অনাচারের ওপর কশাঘাত করা হত, তেমনি সাধারণ মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য আয়োজনও কম থাকত না।"

খুরুটের সঙ

শিল্প নগরী হাওড়ার খুরুট অঞ্চল থেকেও এককালে সঙ বের হত। এই সঙের মিছিলকে বলা হত 'খুরুটের রং-ঢং-সং'। খুরুটের সঙ বের হত দোলের দিন। সকালে ধর্মীয় আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠত খুরুট শীতলা সংগীত সমাজের সভ্যবৃন্দ। আবীর-সহযোগে স্বাগত জানাত বসন্তঋতুকে, রঙের আলতা পরিয়ে দিত ফাল্গুন-চৈত্রের পায়ে। তারপর দুপুরে স্নান-আহার পর্ব শেষ করে নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে বিচিত্র সজ্জায় সঙ বের হত। দোলের দিন রং-খেলার দিন, আনন্দ-উৎসবের দিন। খুরুটের সঙ লোকরঞ্জক গান গেয়ে মানুষের মনেও রং ধরিয়ে দিত।

খুরুটের সঙের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে সতীশচন্দ্র দাস মহাশয়ের কথা। সতীশচন্দ্রের ডাক-নাম 'ভূতি মাস্টার'। একদা তাঁর বাড়ি ছিল কলকাতার গড়পার অঞ্চলে। তিনি তৎকালীন মনোমোহন থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেন। বেহালা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর কিছু অধিকার ছিল। সংগীত-শিক্ষক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গড়পার অঞ্চলের একটি যাত্রাদলের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। সংগীত রচয়িতা ও সুরকার হিসেবেও তাঁর কিছু প্রসিদ্ধি ছিল। তা ছাড়া দল গঠন করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল সতীশচন্দ্রের। খুরুটনিবাসী শ্রী রাজকৃষ্ণ হাজরা মহাশয় তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "একবার কেউ ভূতিবাবুর সান্নিধ্যে এলে তিনি তাঁকে আপন করে নিতেন। সেই কারণে সকলে তাঁকে ভালোবাসতো।" তথ্য সংগ্রহের জন্য খুরুট অঞ্চলের অলি-গলি যেখানে-যেখানে আমরা ঘুরেছি, সর্বত্রই সকলে একবাক্যে ভূতি মাস্টারের কথা বার-বার শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। একজন নিঃস্ব মানুষ তাঁর চরিত্র-মাধুর্য ও ভালোবাসা দিয়ে ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের হৃদয় জয় করেছিলেন।

খুরুটের সঙ প্রসঙ্গে খুরুটনিবাসী শ্রী অমর চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন, "সতীশচন্দ্র কলকাতা থেকে বসবাস উঠিয়ে দিয়ে হাওড়ায় আসেন এবং খুরুট অঞ্চলে এক ভাড়া-বাড়িতে বাস করতেন। তাঁরই উদ্যোগে বাংলা ১৩২০ সালে হাওড়া পঞ্চানন চ্যাটার্জী লেনে স্থাপিত হয়েছিল 'খুরুট শীতলা সংগীত সমাজ'।"

সতীশচন্দ্র দাস অর্থাৎ ভূতি মাস্টার একাধারে ছিলেন খুরুট শীতলা সংগীত সমাজের গানের মাস্টার ও গীত রচয়িতা। খুরুটনিবাসী শ্রী ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খুরুটের সঙের কয়েকখানি পুস্তিকা দেখিয়েছিলেন আমাদের। অধিকাংশ পুস্তিকা যোল পৃষ্ঠার। ওইগুলিতে উল্লেখ আছে— গান ও পালা সতীশচন্দ্র দাস প্রণীত, প্রকাশক—শ্রী মহাদেবচন্দ্র শী। প্রধান পৃষ্ঠপোষক—শ্রী কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়োগশিল্পী ও পরিচালক—সতীশ-চন্দ্র দাস। সভাপতি—শ্রী গৌরমোহন রায়। সম্পাদক—শ্রী সৌরেন্দ্রমোহন সাঁতরা। অধ্যক্ষ—শ্রী নূটবিহারী শী। সুরশিল্পী—শ্রী কানাইলাল মণ্ডল।

খুরুটের সঙ বের করার খেয়াল ভূতি মাস্টারের মাথা থেকে বেরিয়েছিল। তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতি বছর দোলের দিন সকালে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র-সহ নগর-সংকীর্তন বের হত। বাংলা ১৩২৮ সালে খুরুটের 'রং-ঢং-সং'-এর সূচনা। প্রথম সঙের দল অবশ্য দোলের দিন বের হয়নি, হয়েছিল সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে।

তারপর নানা কারণে প্রায় দু-তিন বছর খুরুটের সঙ বেরুতে পারেনি। বাংলা ১৩৩২ সাল থেকে দোলযাত্রার দিন আবার খুরুটের সঙ বের হয়েছিল।

সঙ বের হবার কয়েক দিন আগে থেকে খুরুট অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীর-পত্র লাগিয়ে পল্লীবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হত—"বের হবে খুরুটের রং-ঢং-সং"। একাদিক্রমে প্রায় চোদ্দ বছর খুরুটের সঙ বের হয়েছিল। খুরুটের সঙ হাওড়ার জয়নারায়ণবাবু আনন্দ দত্ত লেন থেকে বের হয়ে ঘুরত খুরুট রোড, হারকোর্টস লেন, বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেন, জি. টি. রোড, পঞ্চাননতলা রোড, কৈলাস ব্যানার্জী লেন, কালীপ্রসাদ ব্যানার্জী লেন, নরসিংহ দত্ত রোড, কালাচাঁদ নন্দী লেন, খুরুট সারকুলার রোড ঘুরে আবার ফিরে আসত জয়নারায়ণবাবু আনন্দ দত্ত লেনে।

সঙ বের হত দোলের দিন প্রায় বেলা একটায়। হাওড়ার নানা পল্লী ও রাস্তা পরিক্রমান্তে ফিরে আসতে প্রায় রাত তিনটে-চারটে হত। সচরাচর সঙ হাঁটা-পথে ঘুরত। কিন্তু কয়েকটি সঙের জন্য রিকশা গাড়ির ব্যবস্থা থাকত।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাঁরা প্রধান ও অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, মহাদেব শী, নূটবিহারী শী, প্রাণকৃষ্ণ কাঁড়ার, রমানাথ সাউ, কানাই মণ্ডল, সৌরেন্দ্রমোহন সাঁতরা, সুধাংশু পাল, প্রফুল্ল জাঠী, অমর চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য পল্লীর আরও অনেকে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতেন।

খুরুটে প্রায় ত্রিশ রকমের সঙ বের হত। প্রতি বছর পরিকল্পনা করা হত নতুন ধরনের সঙের। তা ছাড়া থাকত নতুন গান ও ছড়া। মিছিল শুরু হত ভিল (ভারতীয় আদিম জাতি বিশেষ)-এর সঙ দিয়ে। আর শেষে থাকত তর্জা গানের দল।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুতে খুরুটের সঙ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল। সঙের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছিল :

হে বঙ্গ কর্মবীর, উন্নত শির, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত,
রাজনীতি গগন মাঝে, এখনও বিরাজে, তব স্বর প্রদীপ্ত !

দেশপ্রাণ শাসমলের মৃত্যুতে খুরুটের সঙের শ্রদ্ধাঞ্জলি ছিল এইরূপ :

তোল তোল তোল তান, মিলিত কণ্ঠে গান।
বল জয় বল জয়, জয় জয় দেশপ্রাণ।

তখন সারাদেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন চলছিল। খুরুটের সঙের মুখেও স্বদেশী আন্দোলনের কথা উদ্দীপ্ত আবেগ ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে।

সে-সময় বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের প্রতিজ্ঞা ছিল দেশকর্মীদের কণ্ঠে। খুরুটের সঙ আতরওয়ালা সেজে বিদেশী 'সেণ্ট'-এর বদলে দেশী আতর ব্যবহার করার জন্য গান গেয়ে অনুরোধ জানাত এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জনের কথাও বলত। সঙের দলের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হত পল্লীবাসীর কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে। যে-যে স্থানে সঙের দল দাঁড়িয়ে গান গাইত কিংবা ছড়া কাটত, সেইসব স্থানে পূর্বে লিখে রাখা হত—"এই স্থানে সঙ থামিবে"। দেওয়ালের গায়ের উক্ত লেখা দেখে দলে-দলে নর-নারী সেইসব জায়গায় সঙের গান শোনার জন্য অপেক্ষা করতেন।

কাসুন্দিয়ার সঙ

হাওড়ার কাসুন্দিয়া থেকে যে-সঙ বের হত তাকে বলা হত 'সঙ-বাহার'। এই সঙ চড়ক উপলক্ষে ২১ নম্বর গণেশ মাঝি লেনের শীতলা মন্দির থেকে বের হত।

কাসুন্দিয়ার সঙ 'মায়ের মন্দিরের সঙ' নামেও পরিচিত ছিল। বাংলা ১৩৩৬ সালের পয়লা বৈশাখ এই দলের সূচনা হয় এবং পর-পর দু-বছর পয়লা বৈশাখ সঙ বের হবার পর তৎকালীন কর্মকর্তারা ঠিক করেন যে, পয়লা বৈশাখের পরিবর্তে চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে বের করবেন। তারপর থেকে সঙ চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে বের হত। মোট তের বছর কাসুন্দিয়ার সঙ বের হয়েছিল। কাসুন্দিয়ার পল্লীবাসীরা কেন সঙ সাজতেন একথা তাঁরা একটি ছড়ায় বলেছিলেন :

মোদের এ সঙ নয় শুধু কালি মেখে সঙ সাজা,
নয়কো শুধু হালকা হাসি, নয়কো শুধু মজা।
সংসারেতে সাজার ওপর সাজেন যিনি যে যা,
তারি ছবি দেখাই সবে সহজ ভাষায় সোজা।
সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি আদি,
বলতে গিয়ে কারো প্রাণে ব্যথা দি যদি।

ক্ষমা করবেন, সবার কাছে এই মোদের মিনতি,
সত্যের ভাষণ, সত্যের গানই মোদের সঙ-এর নীতি।

কাসুন্দিয়ার সঙ চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বেলা প্রায় চারটেয় বের হত। মায়ের মন্দির থেকে রওনা হয়ে কাসুন্দিয়া রোড, গদাধর মিস্ত্রী লেন, হালদার পাড়া, হাওড়া সার্কুলার রোড (বর্তমানে নেতাজী সুভাষ রোড), তাঁতিপাড়া প্রভৃতি রাস্তা ঘুরে, রাত কাটিয়ে ভোর বেলায় ফিরে আসত। এখানেও কয়েকটি সঙের জন্য রিকশা গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। প্রায় উনিশ-কুড়ি রকমের সঙ বের হত।

সঙের মুখ দিয়ে বলা হত, ফাঁকি দিয়ে যদি বড় হতে চাও তাহলে 'ধামাধরা' হও। এর জন্য চাই কয়েকটি জিনিস। কেমন করে অপরের মন জুগিয়ে চলতে হবে তা জানা চাই, মোসাহেবি করার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হবে এবং ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকের খোশামুদে পার্শ্বচর হয়ে ঘুরতে হবে। ভালো-ভাবে শিখতে হবে চাটুকারের কাজ। কাসুন্দিয়ার সঙ নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে গান ধরত :

এই ধামাই মোদের কলিযুগের একমাত্র উপায়।
বিনা ধামা ধরা সংসার করা একালে সম্ভব নয়॥

কাসুন্দিয়ার সঙ স্বদেশী আন্দোলনের কথাও ছড়া কেটে বলত। সঙের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রী বিভূতি মুখোপাধ্যায়, শ্রী বঙ্কিমবিহারী পাড়ুই, শ্রী মণিমোহন নাথ, শ্রী কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। সঙের পরিচালক ছিলেন শ্রী বিভূতি মুখোপাধ্যায়। শ্রী মুখোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী সত্যচরণ মাঝি।

বাসুবাটীর সঙ

হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের একটি ইষ্টিশান, নাম বলরামবাটী। এই স্থানটি হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত। বলরামবাটী ইষ্টিশান থেকে নেমে বেশ-কিছুটা ভেতরে গেলে বাসুবাটী গ্রাম। এই গ্রামে এককালে বৈচিত্র্যপূর্ণ সঙের আসর বসত। প্রায় দশ-বারোটি গ্রামের শত-শত নর-নারী বাসুবাটী গ্রামে এসে সমবেত হতেন আসরে। গান গেয়ে এবং অভিনয় করে বাসুবাটীর সঙেরা দর্শকদের আনন্দ বর্ধন করতেন।

জেলেপাড়া, কাঁসারীপাড়া, খিদিরপুর, শিবপুর, খুরুট, কাসুন্দিয়া প্রভৃতি স্থানের সঙ যেমন নানারকম সাজে সজ্জিত হয়ে মিছিল করে বিভিন্ন পথে ঘুরত, বাসুবাটীতে কিন্তু সেইরূপ সঙের মিছিল বের হত না। এখানে যাত্রার আসরের মতো সঙের আসর বসত।

বাসুবাটী গ্রামটির চারিদিকে সবুজ শ্যামল শস্য-ভরা খেত। আশ-পাশে কলাবাগান, আমবাগান। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে চোখে পড়ে গ্রামবাসীর বাসগৃহ। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তাল ও নারকেল গাছের সারি। চারিদিকে চোখ-জুড়ানো শোভা। এই সুন্দর পরিবেশে গ্রামের একটি মাঠে সঙের আসর বসত। মাথার ওপর নীল আকাশ, আর তারই নিচে চাষীরা নানারকম সঙ সেজে গান ধরতেন। চাষাদের সাবলীল অভিনয় ও গানে মুখরিত হয়ে উঠত বাসুবাটী গ্রাম। যথেষ্ট দর্শক হত। কাছে-পিঠের আরও অনেক গ্রাম, যেমন—মধুবাটী, বিশ্বেশ্বরবাটী, শিবরামবাটী, রাজারামবাটী, জগৎ-নগর, শ্রীরামপুর, শিমূলপুকুর ইত্যাদি অঞ্চলের নর-নারী এই সঙের আসরে সমবেত হতেন।

বাসুবাটীর সঙের আসর দুর্গাপূজার সময় কয়েক দিন ধরে বসত। দুর্গাপূজা বাঙালী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উৎসব। একদিকে আনন্দময়ীর আগমনে বাঙালীর গৃহ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই, অন্যদিকে বর্ষার অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারা বন্ধ হয়ে ধরণীর সর্বত্র ঝলমল করে শরতের প্রসন্ন হাসি। কৃষকের মনেও এ-সময় অফুরন্ত আনন্দ, আর তার উচ্ছল অভিব্যক্তি যেন বাসুবাটীর এই শারদীয় সঙের আয়োজনে।

দুর্গাপূজার সময় যেমন সঙের আসর বসত, ঠিক সেইভাবে চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনেও পুনরায় অনুরূপ আসর বসত। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাসুবাটীর সঙের আসরে অভিনয় করতেন স্থানীয় চাষীরা। গান ও পালা তাঁরাই রচনা করতেন এবং তার মধ্যে তাঁদের সুখ-দুঃখের ছবি বিচিত্র আবেদনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

এইসব গান ও পালার মধ্যে জমি ও ফসলের কথাই প্রাধান্য লাভ করত, বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া শহরের নানা কথা, দেশ ও সমাজের নানা সমস্যা নিয়েও তাঁরা ছড়া ও গান রচনা করতেন। আসরে সঙ বলদ ও লাঙ্গল নিয়ে অভিনয় করত। লাঙ্গল নিয়ে চাষী গান ধরত :

গেছলাম আমি মাঠে
হেমন্ত জমি চষিতে,
চাষ-আবাদের ধুম পড়েছে
জল লেগেছে সব জমিতে।

আর-একটি পালায় সঙ সাহেবী পোশাক পরে আসরে আবির্ভূত হত। চাষীর ছেলে বিদেশে চাকরি করতে গিয়ে কোন-এক বড় শহরে কিছুদিন বাস করেছিল এবং সেখানে সাহেবী পোশাকে চলা-ফেরা করত। বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সে গ্রামে ছুটে এসেছে। তখন চাষের সময়, চাষ না করলেও নয়। সেই কারণেই সাহেব সেজে লাঙ্গল কাঁধে মাঠে নামতে হল। বাবার মৃত্যুতে সে বেদনায় মর্মাহত। সাহেব সেজে সঙ গান ধরত :

কি ঝকমারি করতে চাকরি
গেলাম বিদেশে,
বাবা আমার গেল মারা
দেখতে পেলাম না এসে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবাসী স্বাধীন হল। দেশের দিকে-দিকে উড়তে লাগল স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতাকা। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতবাসী আনন্দে আত্মহারা। সেই সময় বাসুবাটীর সঙের কণ্ঠেও ছিল স্বাধীন ভারতের জয়গান। বহু গান সেদিন রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করছি :

দেশবাসীর কথা মত,
ঘরে আমি কেটে সুতো,
কাপড় বুনে মনের মত,
পরছি বহু দিন,
এতদিনে মোরা
হয়েছি স্বাধীন।
ভারতবাসী থাকব সুখে,
মুখে বল জয় হিন্দ্।

স্বাধীনতার আগের অর্থাৎ ইংরেজ আমলের দুর্দশার কথা বাসুবাটীর গ্রামের চাষীদের মুখে শুনবার সুযোগ পেয়েছি আমরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন চলছিল।

বহু দেশকর্মী তখন কারাগারে। সেই সময় সারা বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ। বাজার থেকে কাপড় অদৃশ্য হয়েছিল, পরে যদিও কন্ট্রোলের মাধ্যমে কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু তবুও অসৎ ব্যবসায়ীরা মানুষকে প্রতারিত করেছে নানাভাবে।

সেদিনকার বস্ত্রের অভাবের কথা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন শ্রী সোমনাথ লাহিড়ী[৩৫] মহাশয়। শ্রী লাহিড়ী এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "ভারত সরকারের নির্দেশে বস্ত্র-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান সমস্ত ব্যাপারের খবরদারী করিবার ভার আছে ভারতীয় টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড নামক কমিটির হাতে। ঐ বোর্ডের অফিস বোম্বাই শহরে। উহার মোট সভ্যসংখ্যা ২৫ জন, তাহার মধ্যে ১৫ জন কাপড়ের কলের মালিক এবং আর ৭ জন সভ্য কাপড়ের বড় বড় ব্যবসায়ী।

"কাপড় বাজারের 'রাঘব বোয়াল' লইয়া গঠিত এই কন্ট্রোল বোর্ড নাকি অনেক বিবেচনার পর স্থির করিয়া দিয়াছে যে, বাংলাদেশের প্রত্যেক লোক বৎসরে মোট দশ গজ করিয়া কাপড় কিনিতে পারিবে। অর্থাৎ যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে মাত্র দুখানি ধুতি কিংবা দুখানা শাড়ী কিংবা ঐরূপ পরিমাণের অন্য কাপড় দিয়া সম্বৎসর চালাইতে হইবে। অন্য সময়ে হইলে এরূপ প্রস্তাব লোকে ঠাট্টা বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু ব্যবসায়ী ও সরকার পরিকল্পিত এই ঠাট্টাই বর্তমানে জোর করিয়া লোকের উপর চাপানো হইয়াছে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে উহা আজ লজ্জাসম্ভ্রমহানি এমন কি জীবন হানিরও মর্মান্তিক পরিণতি ডাকিয়া আনিয়াছে। সেজন্যই উহাকে আর ঠাট্টা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতেছে না, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত বাঙ্গালীর ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে।"

সেদিন বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ ও নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পুলিসের গুলিও চলেছিল। সাধারণ মানুষ দোকানের সামনে বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও কাপড় সংগ্রহ করতে পারত না। কাপড় সেদিন ছিল চোরাবাজারের দখলে। ব্যবসায়ীরা নানারকম অসৎ পন্থা অবলম্বন করত। বাসুবাটীর সঙ সেইসব অসৎ ব্যবসায়ীদের প্রতি ঘৃণা দেখিয়ে নিম্নলিখিত গান রচনা করেছিলেন :

কি মজা করলো গবৃমেণ্ট কাপড় দিয়ে কন্ট্রোলে
ভোর বেলা যাচ্ছি ছুটে একখানা পাব বলে।

৩৫ শ্রী সোমনাথ লাহিড়ী, কাপড় চাই, (১৯৪৫), পৃষ্ঠা ১

বাঁশ, তালপাতা আর কাগজ দিয়ে তৈরি এক প্রকাণ্ড ঘড়ি নিয়ে সঙ আসরে নেমে গান ধরত :

আমি ভাই বড় মিস্ত্রী।

কয়েকজন ফেরিওয়ালা সেজে আসরে অবতীর্ণ হত। সঙ আস্ত নতুন ইঁট নিয়ে সুর করে গান ধরত :

আপনারা কি চান,
রক্তমুখী সাবান।

আর-একজন ফেরিওয়ালা ধানের গোলায় জড়ানোর জন্য যে মোটা খড়ের দড়ি ব্যবহৃত হয় তা দেখিয়ে বলত, 'চাই চুল বাঁধার কাব ফিতে'।

বাসুবাটীর সঙের আর-একটি পালা সেকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু সেই পালাটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে পারিনি।

এই পালাটিব কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি এখানে। স্থান—চাষের জমির সন্নিকট। সময়—দুপুর। ভোর থেকে জমিতে কাজ করে চাষী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মুড়ি আর জল নিয়ে বউয়েব সেখানে যাওয়ার কথা। একটু বেলা করে বউ স্বামীর জন্য মুড়ি, অন্যান্য খাদ্য আর জল নিয়ে গেল। এদিকে স্বামী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। কথা বলবে না। আহার করবে না। স্বামীর অভিমান ভাঙাবার জন্য বউ গান ধরলো :

খাও না ওগো মুড়ি,
তোমার চরণে গড করি,
একলা মানুষ, কাজে বেহুঁশ,
করব কত তাড়াতাড়ি।

চাষী বউকে অপমান করল। বউ ঘরে এসে ছোট দেওরকে বলল এই ঘটনার কথা। মুড়ি-জল মাঠে নিয়ে যেতে দেরি হয়েছে বলে তার দাদা তাকে অপমান করেছে। তাই সে আর এখানে থাকবে না, বাপের বাড়ি চলে যাবে। এই কথা শুনে দেওর গান ধরলো :

বউদিদি যেও না বাপের ঘর,
তোমার চরণে করি গড়।
তুমি বাপের ঘর যাবে,
আমার দশা কি হবে।

বাসুবাটী গ্রামের সঙের গান ও পালা রচনা করতেন গ্রামের কবি শ্রী মথুরমোহন মালিক। মথুরমোহন মাঠের কাজ সেরে গ্রামের চাষীদের নিয়ে মুখে-মুখে গান ও ছড়া রচনা করতেন। সঙের আসর পরিচালনা করতেন শ্রী অমূল্য পাল এবং আরও অনেকে। গানের সুর দিতেন শ্রী সুধীর হালদার। বিকেল চারটেয় সঙের আসর বসত। শেষ হত প্রায় রাত দশটায়। সঙের আসরে গ্যাসের এবং অন্যান্য আলোর ব্যবস্থা থাকত। বাসুবাটীতে প্রথম সঙ বের হয়েছিল প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে। তারপর প্রতি বছর সঙের আসর বসত। প্রায় দশ-বারো বছর হল সঙের আসর বসা বন্ধ হয়েছে। আসরে ঢোল, কাঁসি, খোল, মন্দিরা ও হারমোনিয়াম প্রভৃতি ব্যবহৃত হত।

এই গ্রামের অধিবাসীদের মুখে শুনেছি, বাসুবাটীর নিকটবর্তী বারুইপাড়া এবং জলাপাড়া গ্রামে এককালে সঙের প্রতিযোগিতা হত। বৈশাখের দ্বিতীয় দিনে জলাপাড়ায় চড়কের মেলা বসত। বারুইপাড়ায় মেলা বসত ৮ বৈশাখ।

এই দুই গ্রামের মেলা 'বাসী চড়ক' উৎসব নামে পরিচিত ছিল। উক্ত দুই গ্রামের মেলায় সঙের প্রতিযোগিতা হত। কাছে-পিঠে থেকে বহু গ্রামের মানুষ নানারকম সেজে গান ও পালা রচনা করে প্রতিযোগিতায় যোগদান করত। যে গ্রামের দল ভালো অভিনয় করে দক্ষতা দেখাত কিংবা হাসির গান শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করত সেই গ্রামের সঙকে পুরস্কার দেওয়া হত। বিভিন্ন গ্রাম থেকে এইসব সঙ যোগদান করত। সে-সময় ওই অঞ্চলের আরও কয়েকটি গ্রামে সঙের প্রতিযোগিতা এবং সঙ নিয়ে বেশ মাতামাতি চলত।

জনাই-বেগমপুরের সঙ

জনাই এবং বেগমপুর হুগলী জেলার দুইটি বেশ বিখ্যাত জায়গা। এখানকার সঙ প্রসঙ্গে শ্রী রেণুপদ মুখোপাধ্যায়[৩৬] মহাশয় লিখেছেন, "বেগমপুরের সং এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই সং-এর প্রচলন আরম্ভ হয়। সামাজিক শিক্ষণীয় বিষয় সকল নির্ম্মল ব্যঙ্গে, কৌতুকে ও রহস্যাদিতে প্রকাশ করা হইত। জনসাধারণের উৎসাহের ও আনন্দের সীমা

৩৬ শ্রী রেণুপদ মুখোপাধ্যায়, সেকালের জনাই, (১৩৫৭), পৃষ্ঠা ২১

থাকিত না। ইহা চৈত্র মাসের শেষে জনাইয়ে আসিয়া সমস্ত জনাই গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত।"

শ্রী রেণুপদ মুখোপাধ্যায়[৩৭] এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, "জনাইয়ের অধিবাসীরাও এক দিন পরে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে) বেগমপুরে যাইয়া সং গাইয়া আসিত। জনাই, বেগমপুর যেন সুখের, আনন্দের বিশ্রাম ভূমি বলিয়া মনে হইত। এখনও সং হয় বটে, কিন্তু সে উৎসাহ নাই, সে আনন্দও নাই।"

এককালে জনাই-বেগমপুরের সঙ ছিল বিখ্যাত। এই সঙ কত বছর পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল অনেক অনুসন্ধান করেও তার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, সূচনাকালের উদ্যোক্তা হিসাবে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন না। গ্রামের বৃদ্ধরা বলেন, সে-সময় সঙ-প্রসঙ্গে কাগজপত্র রেখে দেবার প্রয়োজন বোধের অভাবেই সব লুপ্ত হয়ে গেছে। তা ছাড়া যাঁরা হয়তো কিছু বলতে পারতেন, সেইসব প্রবীণ ব্যক্তি কেউই আজ বেঁচে নেই।

বেগমপুরের শ্রী ব্রজেন ভড় মহাশয়, বর্তমানে যাঁর বয়স প্রায় আশি বছর, এই প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁর জ্ঞান হওয়া অবধি থেকেই জনাই-বেগমপুরের সঙ দেখেছেন।

জনাইয়ের সঙ চৈত্র মাসের সংক্রান্তি অথবা মাসের শেষ দিকে কোন ছুটির দিনে বের হত। আদান, পায়রাগাছা, বাঁশগাছা, হাটপুকুর প্রভৃতি সন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা জনাইয়ের তরফের হয়ে একই সঙ্গে বেগমপুরে সঙের গান গাইতে যেত। অপর পক্ষে বেগমপুর থেকে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখে অথবা কোন ছুটির দিন জনাই গ্রামে সঙ পাঠান হত। বেগমপুরের দলের সঙ্গে ছোট তাজপুর, খরসরাই, উত্তর আদান থেকেও বহু দল যোগদান করত। এ ছাড়া জনাই এবং বেগমপুরের দল কলকাতা থেকেও ভালো গায়ক নিয়ে যেতেন।

প্রায় নয়-দশ বছর হল এই অঞ্চলের সঙ বের হওয়া বন্ধ হয়েছে। শেষ সময়কার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন মঙ্গলময় মুখোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি মেন্দার। এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন বেগমপুরের গোকুল হাম্বির ও খরসরাইয়ের শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দাস।

৩৭ পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৯১

ইদানীংকালের অনেক গ্রামবাসীর মতে, জনাইয়ের সঙের পৃষ্ঠপোষকদের নাম করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে নন্দলাল মুখোপাধ্যায়, পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়, মাখনলাল মুখোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কমলাপত্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যাস এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রামবাসীর নাম।

বেগমপুরের সঙের দলের উদ্যোক্তা, পৃষ্ঠপোষক ও গান রচনাকারীদের মধ্যে যে কয়েক জনের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাঁরা হলেন দীননাথ লাহা, পূর্ণচন্দ্র দত্ত, বৈকুণ্ঠ দত্ত, প্রবোধ সেনগুপ্ত, উমাপদ ভূঁই। কয়েকজন স্থানীয় লোক শ্রী ব্রজেন ভড ও শ্রী নিতাইচরণ ভড়ের নাম উল্লেখ করলেন। তাজপুর গ্রামের পঞ্চানন দাস, খরসরাই গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের নামও কয়েকজন গ্রামবাসীর কাছে শুনেছি।

সাধারণত সন্ধ্যার সময় সঙ বের হত। সঙ বেরুবার আগে এক ব্যক্তি হনুমান সেজে থাকত। হনুমান দেখে সকলে জানতে পারত যে সঙ বের হতে আর দেরি নেই। তারপর সঙের দল বিভিন্ন স্থানে গান গেয়ে এগিয়ে চলত। অনেক সময় সঙের দলের বিষয়বস্তু সংখ্যায় এত বেশি হত যে পথ-পরিক্রমা শেষ হতে ভোর হয়ে যেত। সঙের উদ্যোক্তারা কিছু জলযোগের ব্যবস্থা রাখতেন এবং সঙ ফিরে যাওয়ার সময় তাদের আপ্যায়ন করে জলযোগ করানো হত।

শ্রীরামপুরের সঙ

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর থেকে এক সময় দুইটি সঙের দল বের হত। একটি দল রওনা হত জি. টি. রোড থেকে। এই দলকে বলা হত 'কালীপাড়ার সঙ'। এই সঙের পরিচালনার ভার ছিল স্থানীয় তন্তুবায় সমিতির উপর। আর-একটি সঙের দল বের হত শ্রীরামপুর বটতলা থেকে। এই দল 'বটতলার সঙ' নামে পরিচিত ছিল। বটতলার সঙের গান সাধারণ মানুষের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। অনেক পল্লীবাসী আমাদের জানিয়েছেন যে, এখনও বটতলার সঙের গানের দু-চার ছত্র অনেকের মুখে শোনা যায়।

শ্রীরামপুর বটতলার সঙের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বর্গত গঙ্গাধর ঘোষ। শুনলাম তিনি শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে চাকরি করতেন। তাঁর মৃত্যুর

পর অধরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই দলের প্রধান উদ্যোগী হন। তা ছাড়া বটতলার স্থানীয় যুবকেরাও সঙ বের করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন।

শ্রীরামপুরের কালীপাড়া ও বটতলা এই দুই দলের সঙ নীল-ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বের হত। সন্ধ্যা হলে ছেলেরা মেয়ে সেজে বরণ-ডালা, জলের কলসী, শঙ্খ ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত এবং সঙের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে সমগ্র পল্লী মুখরিত হয়ে উঠত।

আবার সঙ বের হত রাত প্রায় ন'টার সময়। দুই দল অর্থাৎ কালীপাড়া এবং বটতলার সঙ প্রায় একই সময় একই রাস্তায় পরস্পরের মুখোমুখি হত। কোন্ দলের সঙ আগে যাবে, কোন্ দলের সঙ পরে, এই নিয়ে কয়েকবার কলহের সূত্রপাত, এমনকি মারামারি হবার উপক্রম হয়েছিল। পরে এইসব দেখে-শুনে সঙের কর্মকর্তারা কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে কোন্ দল ঘুরবে তা ঠিক করে নিয়েছিলেন। যে-যে রাস্তা দিয়ে কালীপাড়ার সঙ যেত, সেই পথ দিয়ে বটতলার সঙ ঘুরত না।

শ্রীরামপুরের এই দুই দল 'ময়ূরপঙ্খী নৌকা' তৈরি করতেন। বাঁশ, কাগজ, কাপড়, রং ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর করে একটি ময়ূরের মুখ সহ নৌকা তৈরি করে সেইটি গরুর গাড়িতে তোলা হত। তার ওপর কয়েকটি সঙ দাঁড় ধরে নানারকম গান গাইত। তা ছাড়া সেই সঙ্গে থাকত মাটির তৈরি প্রকাণ্ড শিব ঠাকুরের মূর্তি। শিবঠাকুর চলেছেন বিয়ে করতে, গাজনের সন্ন্যাসী ও সঙের দল বরযাত্রী। শ্রীরামপুরের সঙের মিছিলকে বলা হত হর-গৌরীর বিয়ের মিছিল। বটতলার সঙের একটি পুরাতন গান এই উপলক্ষে গাওয়া হত। গানটি হল এই :

চল রে তেড়ে, বুড়ো এঁড়ে,
লগ্ন বয়ে যায়।
তোর তরে, মোর বুড়ো শিবের
বিয়ে হওয়া দায়॥

বটতলার সঙের সঙ্গে কয়েকজন বাউল সেজে গান গেয়ে বিভিন্ন পথে ঘুরত। এই বটতলার সঙের গানকে সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন শ্রী গৌরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্বান্ ব্যক্তি, একটি নাম-করা ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। বর্তমানে ইস্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করে শ্রীরামপুরে বাস করছেন। বটতলার লোকেরা বলেন, যেমন তাঁর কবিত্ব

শক্তি, বর্ণনা-নৈপুণ্যেও তেমনি তিনি সহজসিদ্ধ। তাঁর রচিত গান শুনে শ্রীরামপুরের শ্রোতারা সবিশেষ মুগ্ধ হতেন। প্রথম দিকে একান্ত গোপনে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গান ও ছড়া রচনা করে সঙের কর্মকর্তাদের দিতেন, কিন্তু পরে আর নিজেকে গোপন করে রাখতে পারেননি। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর গান ও ছড়া রচনার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাঁর লিখনভঙ্গি সকলের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। আজও শ্রীরামপুরবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন যে শ্রী গৌরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে বটতলার সঙ ধন্য হয়েছিল। তাঁর রচিত কয়েকটি গানের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল; যেমন, শিবঠাকুরের বন্দনা :

বিশ্ব বন্দন ভস্ম চন্দন
নয়ন নন্দন ভঙ্গ।
রাজিত সুন্দর রজত কন্দর
বিশাল বিষধর সঙ্গ ॥

বটতলার সঙ সন্ধ্যার বন্দনা রূপে যে-গানটি গাইত তার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

কে রে ওই রাঙ্গা পায় পরশে রাঙ্গায়,
অনুরাগ রঙ্গে সাঁঝের ছায়ায়,
কার বাঁশি বাজে, পাপিয়ার মাঝে,
সরসী হিল্লোলে তটিনী বেলায়।

বছরের গেজেটের মতো শ্রীরামপুরের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বটতলার সঙের গান রচিত হত। কখনও সমাজ সংস্কার বা শিক্ষার উদ্দেশ্যেও নতুন-নতুন গান ও ছড়ার অবতারণা করা হত সঙের মাধ্যমে। মিউনিসিপ্যালিটির কাজের ত্রুটি হলে কটাক্ষপাত ও শ্লেষ করে গান রচিত হত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'টুনিমুনি শ্মশান ঘাটের' কথা। শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভের স্নানের ঘাটের পাশে 'টুনিমুনির শ্মশান ঘাট'। পূর্বে ঘাট বাঁধানো ছিল না। এমন কি রাত্তে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। সেই কারণে শ্মশান-যাত্রীদের যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে শবদাহ করতে হত। বটতলার সঙের মুখ দিয়ে শ্মশানঘাটের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তাদের বলা হয়েছিল :

যাও যাও যাও যাও সবে যাও
টুনিমুনির ঘাট।
প্রত্যয় না হলে কথায়
গিয়ে দেখ কেমন ঠাট॥

উক্ত গান গাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই মিউনিসিপ্যালিটির প্রচেষ্টায় এবং অনেক ব্যবসায়ীর বদান্যতায় পাকা ঘাট, শবযাত্রীদের বিশ্রামের জায়গা এবং আলোর ব্যবস্থা হয়েছিল।

তৎকালীন শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তাদের কলহকে কেন্দ্র করে গান রচিত হয়েছিল। যেমন—

মরিব ডুবে সখি,
এঁদো ডোবার কালো জলে,
সাধের লেখা প্রেমলিপি,
বঁধু আমার পায়ে ঠেলে।
বসন্তের বায় সখি
লাগে না লাগে না ভাল,
সত্য সে যে ধূর্ত্ত চোর
চাটু-পটু ঘোষ আলো।
লাজ মান বেচা আমার
সবই বুঝি বৃথা হল,
বঁধুয়ার আমার
রাতুল চরণ তলে……।

আদর্শ নারী-শিক্ষা প্রসঙ্গে সঙের মুখ দিয়ে বলা হয়েছিল :

কে আছ কোথায় জননীরূপা গো
ভারতবাণী।
শঙ্খ করে মা প্রচার সজ্যে
নারী শিক্ষার বাণী॥
চাহি না গো মোরা বেণু-বীণা করা
চরণ চপলা বালা।
ভাষ্য মুখরা নায়িকা প্রখরা
কিংশুক ফুলমালা॥

চাহি সেবাগুণে সাজাবে হিরণে
পাত্তার কুটিরখানি।
... ...

—ইত্যাদি

বটতলার সঙের গান সেকালের শ্রীরামপুরের আরও বহু ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। তখনকার শ্রীরামপুরের কয়েকজন নাম-করা চিকিৎসকদের নিয়ে গান রচিত হয়েছিল। এই গানের মধ্যে বহু ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, জনৈক চিকিৎসকের বাড়ির ছাদে ঠাকুর ঘর তৈরি করার ঘটনা, ধাত্রীশিক্ষা-কেন্দ্রের কথা, জনৈক চিকিৎসকের গাড়ি কেনার কথা, ইত্যাদি। এইরকম একটি গানের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

গাও নবীন বরষ গীতি
জয়তু চিকিৎসক মরভয় বারক,
তারক শঙ্কর কৃতী
গাও নবীন বরষ গীতি।
জয় মঠ-মসজিদ মিশ্রণ লাগিল,
নবীন ভবন ননীলাল,
নারীকুল-তারণ ধাত্রী বিবর্ধন
জয়তু বসন্ত রসাল।
ইউনিক লজ-ধর পোত শকটচর,
তারা প্রসন্ন স্বতন্ত্র,
বচন হড়বড়ি জয়তু তিনকড়ি,
বিকট পকেট ধৃত যন্ত্র।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মাটির তৈরি শিবঠাকুরের মূর্তি নিয়ে সঙের দল বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরত। পরিক্রমা-পথে যে-বাড়িতে গৌরীমূর্তির পূজা হত সেই বাড়িতে গিয়ে সঙের দল উঠত। সঙের দল যেন বরযাত্রী; সেই বাড়ি থেকে ফল-মিষ্টি খেয়ে অনেক রাতে যে যার বাড়ি ফিরত। পরের দিন সকালে দল বেঁধে হর-গৌরী নিয়ে যুবকেরা বিসর্জনের মিছিল বার করতেন। শুনলাম, বটতলার সঙ প্রায় পনেরো-কুড়ি বছর হল বন্ধ হয়েছে।

মেদিনীপুরের সঙ

মেদিনীপুর শহরের সঙ সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি তা প্রধানত শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ জানা[৩৮] মহাশয়ের সংকলিত গ্রন্থ থেকে। শ্রীজানা লিখেছেন, "মেদিনীপুর শহরে প্রতি বৎসর বৈশাখ সংক্রান্তিতে 'মীরবাজারের সং' বাহির হইত। ঐ সংএর দলকে ভয় বা সমর্থন করেন না—এই রকম লোক মেদিনীপুর শহরে কেহই নাই। সারা বৎসরে সরকারী বে-সরকারী ভেদে শহরে যত দুর্নীতি ও উচ্চস্তরে যে সব কেলেঙ্কারী ঘটিত এই সংএর মাধ্যমে তাহাদের তীব্র কশাঘাত হইত।"

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ জানা মহাশয় ওই প্রসঙ্গে এ-কথাও বলেছেন যে, শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় মীরবাজার সঙের দলের মূলাধার। শ্রী জানা[৩৯] লিখেছেন, "তিনি নিজের প্রচার চাননি বলেই ঐ সব মনোজ্ঞ ছড়া-গাথা আজও বহুলাংশে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তথাপি ওই শ্লেষাত্মক মধুর গাথাসমূহের দু'একটি যা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল। 'আখাম্বা ভর্জা' শীর্ষক গাথার বন্দনায় কবি বলছেন :

উকিল মোক্তারে বন্দি' জোড় করে পানি
দয়া করে খাওয়াইও না,—নাকানি চুবানি।
হাকিম হুকিমে বন্দি', পুলিশে সৈনিকে,
ছুতো ধরে লাঠি, গুলি চালাইও না এদিকে!
'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির' মতই সব দলে
বন্দিলাম, কেউ যেন, হঠাৎ, মালা না দেয় গলে!
সর্বের মধ্যে ভূতে বন্দি', আর, সিংহবেশী গাধা
'চোরা কারবারীদের বন্দি' দেখো একটু দাদা।"

মেদিনীপুর জেলায় দক্ষিণ খলহরা এবং অমৃতবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম থেকেও সঙ বের হত। এখনও মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে গাজন উপলক্ষে সঙ বের হয়।

৩৮ শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ জানা (সংকলক), কবি দীপিকা, মেদিনীপুরজেলার কবিপরিচয় (১৩৬৬), পৃষ্ঠা ৩১

৩৯ পূর্বে উল্লিখিত বই, পৃষ্ঠা ৩২

বীরভূমের সঙ

রামপুরহাট বীরভূম জেলার একটি মহকুমা। এখানে বড় হাট বসে। নানাস্থানের জিনিসপত্তর এই হাটে পাওয়া যায়।

লাল মাটি আর কাঁকরের দেশ বীরভূম। কী শহরের আশেপাশে, কী গ্রামাঞ্চলে, প্রায় সর্বত্রই আম, জাম, পাকুড়, বট, খেজুর, নারিকেল, তাল প্রভৃতি গাছে ঘেরা সবুজ প্রান্তর চোখে পড়ে। ছবির মতো ছোটো-ছোটো গ্রামের শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ মনকে গভীর তৃপ্তি দেয়। রামপুরহাটের নিকটবর্তী এমনি একটি গ্রামের নাম কুকুম। রামপুরহাট থেকে বাসে করে যেতে হয়, সময় লাগে প্রায় আধ-ঘণ্টা।

শোনা যায়, একদা এই কুকুম গ্রাম থেকে বিভিন্ন পূজা-পার্বণে সঙ বের হত। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, দোলপূর্ণিমা প্রভৃতি উপলক্ষে সঙের দল গ্রামের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ত। তা ছাড়া সারা বৈশাখ মাস ধরে সন্ধ্যায় সংকীর্তন শোনা যেত। বৈশাখের শেষে কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে অষ্টপ্রহর হত। অনেক সময় চব্বিশ প্রহরের পর ঘটা করে ধুলোটের[৪০] উৎসব হত। ধুলোট অর্থাৎ সংকীর্তনের পর ভাবাবেশে ধুলায় গড়াগড়ি এবং তদুপলক্ষে উৎসব। সেই সময়ও সঙ দেখা যেত।

কুকুম গ্রামের সাদাসিধে মানুষরা নানারকম সঙ সেজে বের হতেন। কেউ সাজতেন বৈরাগী, হাতে থাকত একতারা। কেউ সাজতেন সন্ন্যাসী, মাথায় জটা প্রকাণ্ড দাড়ি, সারা দেহে ছাই মেখে ঘুরতেন, হাতে থাকত বিরাট ত্রিশূল। এইভাবে নানান ভেক ধরে সঙ ঘুরত। তা ছাড়া মুখোশধারী নানারকম সঙ থাকত। রাক্ষস-রাক্ষসী, হনুমান, ঘোড়া, সিংহ, আরও কত কি মুখোশ পরে সঙ বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করত। তা ছাড়া সঙের মধ্যে সিংহ, বাগ, হাতি, শিয়াল, ইত্যাদি পদবীর লোকেরও অভাব ছিল না।

৪০ শ্রী হরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ বা শ্রীপাট বিবরণী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, "মাধববাবু কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ও মাধববাবুর বাজারের প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই নবদ্বীপে গানমেলার প্রথম উদ্যোগী, বড় আখড়াই এই মেলার আদিস্থান; কলিযুগাদ্যা মাঘী পূর্ণিমার স্মরণ-উপলক্ষেই ইহা সূচিত হয়। নগরকীর্তনকালে মাধববাবু ভক্তগণের উপর দুই হাতে রজঃ নিক্ষেপ করিতেন, এই ঘটনা হইতে এই পর্ব্বের নাম হয় 'ধুলোট' উৎসব। ১২৫০ সালে এই ধুলোট পর্ব্ব আরম্ভ হয়।"

সঙের দল বের হত সন্ধ্যায়। সঙের সঙ্গে থাকত মশাল, গ্যাসের বাতি, হ্যারিকেন লণ্ঠন, ইত্যাদি। সঙের গানের সঙ্গে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থাকত, যেমন—একতারা, খঞ্জনি, ডুগডুগি, খোল, মাদল, চড়বড়ে, বাঁশি, রামশিঙা, জগঝম্প ও হারমোনিয়াম। কয়েকটি গ্রাম ঘুরে সঙের দল যখন কুরুম গ্রামে ফিরত সে-সময় রাত প্রায় একটা কিংবা দুটো বেজে যেত। সেই রাত্রে অথবা পরের দিন বিরাট আকারে দল বেঁধে চলত ভোজনের পালা।

কুরুম গ্রামের সঙ প্রথম বের হয়েছিল প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে। তারপর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সঙ বছরের বিভিন্ন সময় নিয়মিত রূপে বের হত। লোক-পরম্পরায় শোনা যায়, ১৯৩৫ সাল অথবা তার কাছাকাছি কোন সময় থেকে কুরুম গ্রামের সঙ বন্ধ হয়েছে।

সঙের সূচনার কথা বলতে গেলে বলতে হবে আরও কয়েকটি কথা। সূচনাপর্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হল এই যে, কুরুম গ্রামে শিক্ষিত সমাজ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি যাত্রাদল। সেই যাত্রাদলে যেমন ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা, ঠিক তেমনি নিম্নবিত্ত ও নিরক্ষর গ্রামবাসীরাও অনেকে যোগদান করেছিলেন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সেই যাত্রাদল গড়ে উঠেছিল এবং সে-সময় যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিল। সেই যাত্রাদলের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র সিংহ (বড়বাবু), ডাক্তার যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মজুমদার, সারদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র সিংহ, রজনীকান্ত হাজরা প্রভৃতি গ্রামের মাতব্বর-স্থানীয় লোকেরা। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় যাত্রাদলের মাধ্যমে সঙের দল গড়ে উঠেছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষ খুব উৎসাহের সঙ্গে সঙ সাজতেন। বিদেশী সরকারের চোখে এটা ছিল সাধারণ গ্রাম্য মানুষের রঙ্গ-রস, আবোল-তাবোল খেলা। তারপর যখন সারা দেশব্যাপী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দেখা দেয়, সেই সময় কুরুম গ্রামের সঙের কণ্ঠেও ধ্বনিত হল সমাজচেতনামূলক ছড়া ও গান।

গ্রামের অন্যান্য সমস্যার কথাও সঙের মুখ দিয়ে বলা হত। যারা অন্যায় কাজ করত বা গ্রামবাসীর অসুবিধার সৃষ্টি করত, প্রকারান্তরে তাদের কথা সঙের মুখ দিয়ে বলা হত। এই কারণে সঙকে সকলেই ভয় করত। কিন্তু সেইসব গান বা পালা লিখিতভাবে সংরক্ষিত না হওয়ায় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। মাত্র দু একটি গান কয়েকজন বৃদ্ধদের নিকট থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সংগ্রহ করে দিয়েছেন বীরভূম-নিবাসী শ্রী নগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার মহাশয়। যাঁরা

সেকালে সঙ সাজতেন তাঁদের সহযোগিতাও শ্রী মিত্র মজুমদার মহাশয় লাভ করেছিলেন।

সঙ প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সমাজের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে গান রচিত হত। সেকালে কুকুম গ্রামের নানা স্থানে আগুন লাগার উৎপাত দেখা দেয়। খড়ের গাদা, সার গাদা, খোলা মাঠের কোন চালা-ঘর হঠাৎ আগুন লেগে জ্বলতে থাকে। ক্রমে প্রায় গ্রামের বিভিন্ন স্থানে আগুন লাগা একটা নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আজ এর বাড়ি, কাল আর-এক জনের বাড়িতে আগুন ধরতে থাকে। সে এক বিভীষিকা! গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। অনেকে জনৈক গ্রামবাসীকে সন্দেহ করলেন। আগুনের লেলিহান জিহ্বায় যখন পল্লীবাসীর ঘর পুড়ে ছাই হত তখন অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আর-একজনের চোখে উপচে পড়ত পৈশাচিক আনন্দ। কিন্তু সে-ব্যক্তি এত চতুর ছিল যে তাকে অপরাধের প্রমাণ-সহ ধরা যেত না। সেই কারণেই ঘটনা সমাবেশে তাকে প্রচ্ছন্নভাবে সঙের মধ্যে এনে সেই পিশাচের উদ্দেশে সঙ গান ধরেছিল:

ওহে ঠাকুর—ঠাকুর গোঁসাই
সবার পেথম পেনাম জানাই।
কিন্তু দাদা কি কব ছাই—
হল কি রোগ আগুন জ্বালাই!

সুখের বিষয়, এর নীতিগত ফল ভালো হয়েছিল। বিবেক-দংশনের ফলে এবং সঙের কশাঘাতে ও ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনায় সে-ব্যক্তি সত্যসত্যই আগুন লাগিয়ে অপরের অনিষ্টসাধন থেকে নিবৃত্ত হয়েছিল।

সঙের মুখ দিয়ে শুধু কুকুম গ্রামের কথাই বলা হত না, কাছাকাছি অন্যান্য গ্রামের বিভিন্ন কানাঘুষো, উড়ো কথা, যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, তার সংশোধন প্রয়োজনে সেইসব কথা নিয়েই গান রচিত হত। যেমন, বীরভূমের কোন এক গ্রামের জনৈক বৃদ্ধ জমিদার প্রায় আশীবছর বয়সে ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলেন—এদিকে ঘরে ছিল তাঁর তিন বউ। সঙের মুখ দিয়ে তাই বলা হয়েছিল:

খুড়ো মশায় শুনছো ওগো
খবর জবর ভারি,
মজা কি শুন তারি!

আশীর কোঠায় ঠাকুরজামাই,
করেন শুনি কি মজাটাই!

কুকুম গ্রামের জনৈক গরিব চাষী বিভিন্ন স্থান থেকে 'চারো'তে দুয়ান-অদুয়ান এঁড়ে সংগ্রহ করে তার তালবাগড়া-ঘেরা, খড়-ছাওয়া গোয়াল ঘরে রাখত এবং তাই থেকে ভাগে জমি চাষ-আবাদ করত। 'চারো' অর্থাৎ যাকে সোজা কথায় বলা হয় মাসিক অথবা বাৎসরিক একটা ভাড়া-ব্যবস্থা। আর 'দুয়ান' হল চাষের উপযোগী, এবং 'অদুয়ান' যাকে চষতে শিখিয়ে উপযোগী করে নেওয়া হত। টাকা চুক্তি মতো মাসে বা বছরের শেষে এঁড়ের মালিককে দিতে হত। বর্ষার সময় চাষ-আবাদ লেগে গেলে হঠাৎ অতি চড়া দরে সে অতিরিক্ত ঠিকা জমিও ওই এঁড়ে দিয়ে চষে দিত, এবং তা থেকে সে-সময় তার দু-চার পয়সা বেশ আয় হত। তার এঁড়েই ছিল জীবনের একমাত্র সম্বল। একবার অসময়ে বৃষ্টি নামায় জনৈক গ্রামবাসী রাতের অন্ধকারে তার জীর্ণ সেই গোয়ালঘর থেকে এঁড়ে চুরি করে নিয়ে যায় এবং চুপিচুপি লাঙল দিয়ে জমি চষে ফেলে। সেই লোকটিও ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। এঁড়ে-সহ ধরা পড়লে তাকে গ্রামের দশজনের সামনে ঠিক হাজির করা হত। সাধারণত গ্রামের ভেতর এই ধরনের বিচারে রায় হত জরিমানা ও নানারূপ শ্লেষ করে কথা শোনানো। শাসনের অঙ্গ হিসাবে কখনও দু-একটি চড়-চাপড়ও দেওয়া হত। কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্রে শুধু সন্দেহভাজন বলেই সঙের মাধ্যমে তাকে গান শোনানো হয়েছিল:

ওগো ঠাকুর গোঁসাই প্রবর,
ওহে এঁড়ে চোর—
এঁড়ে চুরি করে চাষ
করেছ বিস্তর।

এখানেও এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, এই গানের পর সেই গরিব চাষীর গোয়াল থেকে আর এঁড়ে চুরি হয়নি।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ সেদিন এই গ্রামেও এসেছিল। কুকুম গ্রামের মানুষ বরাবর স্বাধীনতা আন্দোলনের পূজারী ছিলেন। দিকে-দিকে সবার কণ্ঠে সেদিন বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের প্রতিজ্ঞা। সমগ্র বাংলাদেশ সে-সময় স্বদেশী আন্দোলনের এক প্রবল বন্যায় উত্তাল। বিদেশী কাপড়, চিনি, ইত্যাদি বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য সকলে গ্রহণ করো—এই ছিল

সেদিনকার কুরুম গ্রামের সঙের কথা। বিদেশী চিনি বর্জন[৪১] প্রসঙ্গেও গান রচিত হয়েছিল :

> হালে হালে দেখব কত হাল !
> হবো আর কত নাজেহাল ॥
> নইলে ভাই,
> গো-রক্তে হয় চিনি সাফাই !
> নইলে হয় না মোটা দানাই !
> ইংরেজ আজ কি চাল চালাই !
> রাখবে না আর জাতের বালাই !!

বিদেশ থেকে পণ্য-দ্রব্য আমদানি বন্ধের জন্য এবং বিশেষ করে বিদেশী চিনি যাতে কেউ ক্রয় না করে, এইজন্য 'গো-রক্তে হয় চিনি সাফাই' ইত্যাদি কথা সরল গ্রামবাসীর কাছে প্রচার করা হয়েছিল।

গ্রামের বিভিন্ন চণ্ডীমণ্ডপে, গিরিশচন্দ্র সিংহের বৈঠকখানায়, অথবা ডাক্তার যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মজুমদারের ডাক্তারখানায় বসে গিরিশচন্দ্র সিংহ, ডাক্তার যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মজুমদার, সারদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে সন্ধ্যার সময় গল্পের আসর জমাতেন। তামাক খেতে-খেতে আর গল্পগুজবের মধ্য থেকে এঁরা রসবস্তু সংগ্রহ করে গান রচনা করতেন। দেশসেবক সুরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের সঙ্গেও এই গ্রামের সঙের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্যও সঙের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হত।

৪১ এই প্রসঙ্গে নির্ভীক সাংবাদিক সখারাম গণেশ দেউস্কর ভারতে চিনির কারখানার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "গত ১৮৯৪ সালে ভারতে সর্বশুদ্ধ ২৬৪টি চিনির কারখানা ছিল। ১৯০০ সালে উহাদের সংখ্যা ২০৩ হইয়াছিল, ১৯০৩/৪ সালে কমিয়া ২১টি হইয়াছে। বীটের চিনির প্রসার বাড়িয়া দেশের শর্করা-ব্যবসায়ীদিগের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে? বৈদেশিক শর্করা, হয় গো-শূকরাদি পশুর শোণিত, না হয় শ্মশানভূমি হইতে সংগৃহীত অস্থিময় অঙ্গার সহযোগে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই কারণে আজকাল কোনও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-মুসলমান আর বৈদেশিক শর্করা ব্যবহার করেন না। যাঁহারা খাদ্যাখাদ্যের বিচার করা কুসংস্কার মূলক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগেরও বৈদেশিক শর্করা ব্যবহার করা অনুচিত। কারণ, উহাতে স্বদেশীয় শর্করা ব্যবসায়ীদিগের অনশন-মৃত্যু-জনিত পাপ স্পর্শ করে।" দেশের কথা, পরিশিষ্ট, (তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, মাঘ ১৩১২ সাল), পৃষ্ঠা ৪৪

শেষের কয়েক বছর যাঁরা সঙ সেজেছিলেন এবং অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবিরাজ সীতানাথ সেন, অনাদি খাটাস, করুণা খাটাস, অপূর্ব হাড়ি, হরিমোহন সিংহ, পার্বতীচরণ সিংহ ও বিভূতি দাস। হরিমোহন সিংহের সঙ বেশির ভাগ ধুলোট কীর্তনের সময় বের হত এবং এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরে বিভিন্ন সঙ-সাজনদার নিয়ে সঙ বের করেছিলেন কুকুম গ্রামের আরও কয়েকজন অধিবাসী।

চব্বিশ পরগনার নিশ্চিন্তপুরের শৈব উৎসব

সুন্দরবন অঞ্চলের নিশ্চিন্তপুর গ্রামে চৈত্র মাসে খুব ঘটা করে শিবঠাকুরের পূজা হয়। সন্ন্যাসীদের বন্দনা-গানে নিশ্চিন্তপুরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সঙের দলও যোগ দেয়। সন্ধ্যায় গ্রামের পূজামণ্ডপে পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে রচিত গানের আসর বসে। নিশ্চিন্তপুরের 'শিব-মেনকার ঝগড়া', 'রাই-কানাইয়ের বিবাদ' প্রভৃতি গান আপামর সাধারণের কাছে খুবই প্রিয়। এমনি একটি গানের কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত হল :

শিব—সাপের এক পৈতা গলায় মেনকা কয় লাজে মরে যাই,
মেনকা—তুই নাকি হবি রে বাপ, গুণের জামাই।
শিব—কে আছ মা গিরিপুরে ভিক্ষা দাও আমারে,
মেনকা—কিসের ভিক্ষা চাস রে বাছা বল না সত্য করে।
শিব—আমারে বিদায় কর মা দিয়ে উমাশশী,
মেনকা—আমার উমার জন্য কি বাপ হয়েছ সন্ন্যাসী।

রাধাপুরের শৈব উৎসব

হাওড়া জেলার রাধাপুর গ্রাম চৈত্র মাসে শৈব উৎসবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষে সঙের দল নানারকম ব্যঙ্গ ও হাসির গান গেয়ে থাকে। গ্রামের

কবিরা সঙের জন্য ছড়া ও গান রচনা করেন। বাগনান স্টেশন থেকে প্রায় ষোল মাইল দক্ষিণে রাধাপুর গ্রাম। রাধাপুরের সঙের গানের কয়েকটি লাইন এইরূপ :

টাকা তোমার মান্য ত্রিসংসারে,
হে টাকা তোমার মান্য ত্রিসংসারে।
তুমি হও ধন্য, তুমি গণ্যমান্য,
নরাধম নগণ্য না থাকো যার ঘরে॥

শিতলাদেবীর স্নানযাত্রার মিছিল

প্রতি বৎসর শীতলাদেবীর স্নানযাত্রা উপলক্ষে উত্তর-হাওড়া উৎসব-মুখর হয়ে ওঠে। প্রতি মাঘী-পূর্ণিমায় সালকিয়া অঞ্চলের শীতলা মন্দিরগুলি থেকে সাড়ম্বর শোভাযাত্রা ও গীতবাদ্য-সহ প্রতিমা বের করা হয়। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণান্তে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে স্নান-পূজা সম্পন্ন করার পর আবার শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। লক্ষাধিক নর-নারী শীতলাদেবীর এই স্নানযাত্রার মিছিল দেখার জন্য বড় রাস্তা এবং গঙ্গার ধারে সমবেত হন।

ঢাকার মিছিলের সঙ

সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের একটি অন্যতম অঙ্গ সঙের মিছিল। সঙের মিছিলে আনন্দ-উল্লাসের অজস্র উপকরণ যেমন অনিবার্য বলে বিবেচিত হত, তেমনি শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের দিকটিও কখনো অবহেলিত হয়নি। স্বদেশী আন্দোলন অথবা অনুরূপ দেশব্যাপী দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মধ্যেও লোক-সংস্কৃতির এই প্রবহমাণ ধারাটি সাবলীলভাবে সর্বস্তরের মানুষের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যে যুক্ত হয়েছিল তা কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের সঙের আলোচনা-

প্রসঙ্গে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতায় জেলেপাড়ার ও কাঁসারী-পাড়ার সঙ বের হত চৈত্র-সংক্রান্তির দিন শৈব উৎসবের অঙ্গ হিসাবে। কিন্তু ঢাকার মিছিল ছিল বৈষ্ণব উৎসব এবং জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই মিছিল বের হত।

ঢাকার মিছিলের সৌন্দর্য ও জৌলুস বৃদ্ধি করত একদল হাতি। সেকালে ঢাকার পিলখানার হাতিগুলিকে নানা সাজে সাজিয়ে প্রধান-প্রধান রাজপথের ওপর দিয়ে মিছিল পরিচালনা করা হত। এই প্রসঙ্গে একজন বিদেশী লেখক[৪২] লিখেছেন: "A company of elephants, ponderous and magnificent, stands drawn up in line, waiting to take its place in the long procession as it passes."

ঢাকার মিছিলের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সোনার ও রূপার চৌকি, অর্থাৎ সিংহাসন। বৈষ্ণব-ভক্তদের দেব-দেবীর মূর্তি এইসব চৌকির শোভাবর্ধন করত। মিছিলের সঙ্গে থাকত নানারকমের সঙ। তারা গান গেয়ে, ছড়া কেটে ঢাকার বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করত। বন্দুক, অসি, বর্শা, নিশান, ছত্র, আসাসোঁটা, খাসগেলাস, বল্লমধারী পদাতিক ও অন্যান্য সাজসজ্জা পরিহিত সঙ মিছিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। ঢাকার মিছিলের প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল বড় চৌকি। বাঁশ, কাগজ, রাং, কাপড়, মোম, চুমকি, ইত্যাদি নানারকম জিনিস দিয়ে এই চৌকি তৈরি করা হত। বড় চৌকির ভেতরে পৌরাণিক ও সাময়িক কাহিনী, যুদ্ধ, দুর্গ, সার্কাস, ঘোড়দৌড়, বেলুন, বিমান, পুতুল-নাচ, ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর ও বিস্ময়কর বিষয়ের সমাবেশ ঘটত।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঢাকার ইসলামপুরের মিছিলের সঙ্গে যে সঙ বের হত তারা স্বাধীনতার সৈনিকদের লক্ষ্য করে নিম্নলিখিত গান গেয়েছিল:

চলে যায় দিন ভেবে দেখ,
এমন দিন আর পাব কোথায়।
সাধের বেড়ি পরবো পায়,
যাব সাধের জেলখানায়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের এক শ্রেণীর লোক আন্দোলনকে ব্যর্থ বা বিপথে পরিচালনা করার জন্য ইংরেজ সরকারকে নানাভাবে সাহায্য

৪২ F. B. Bradley-Birt, *Dacca, The Romance of an Eastern Capital*, second edition, 1914, page 196

করেছিল। সেইসব ইংরেজ-চাটুকারদের লক্ষ্য করে ইসলামপুরের সঙ গান গেয়েছিল :

কতকগুলি পাষণ্ড
গোলামগিরি বোঝে না,
ঘরে গেলে পড়ে থাকে,
মনের ধান্দা ছোটে না।
তাতে বলে হিতবাণী,
বলতে গেলে শোনে না,
দণ্ডধারী গাধা পিটলে,
ঘোড়া কভু হয় না।
ধরে যখন কান মলা দেয়,
তখন বাঁকা থাকতে পারে না।

ঢাকার মিছিল এবং সোনা-রূপার মূর্তি প্রসঙ্গে সরকারী নথিপত্রে[৪৩] উল্লেখ আছে যে, "The most beautiful parts of the procession are the gold and silver shrines some of which are worth from Rs. 15,000 to Rs. 20,000, which are dragged along on bullock carts, and at night are illuminated with Bengal fires."

ঢাকার মিছিল উপলক্ষে স্থানীয় ডাকঘর যে বন্ধ থাকত তার সমর্থন পাই সেকালের একটি সাময়িক পত্রিকা[৪৪] থেকে : "In consequence of the Janmastami Gakulastami the Post Office will remain closed to day. Our Postal Department do not get many holidays. We hope the staff will enjoy their well-earned and brief respite from their ardous duties."

ঢাকার আর-একটি সংবাদপত্রে[৪৫] সেদিন নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল : "JONMOSTOMI. One *Gazetted* holiday for *Jonmostomi* Hindu festival, occurred on Friday last 2nd instant, but its annual processions have been fixed for 5th and 6th instant, when Dacca will be visited by large crowds of holiday-

৪৩ B. C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers, Dacca*, (1912), page 66

৪৪ *Eastern Bengal and Assam Era*, Dacca, Sept. 1, 1915, page 5

৪৫ *The Bengal Times*, Dacca, Sept. 3, 1904, page 5

seekers from far and near. For convenience of visitors, special trains will run between Naraingunge and Dacca on both those dates, during regular intervals, at suitable hours, regarding information for which application should be made to station masters of these places."

মিছিল প্রসঙ্গে ঢাকার সাময়িক পত্রিকায়[৪৬] আরও একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল: "JANMASTAMI. We hear the Nawabpura procession which appeared on 6th instant was not at all good but the Islampur *tamasha* on the following day was generally voted very fine This Festival is not be compared to what this carnival was in former years when a large number of richly caparisoned elephants made a great feature of the procession. People used to gather in large crowds, and the noise of the multitude could be heard some distance. Sometimes accidents occurred, but this year nothing untoward happened, owing doubtless to excellent police arrangements"

ঢাকার মিছিল প্রসঙ্গে আর-একটি সংবাদপত্রে[৪৭] উল্লেখ পাওয়া যায়: "The infantry volunteers were posted on both days in the college, and the cavalry moved up and down the roads on elephants, under the direction of their commandant The crowd on these our great festival days in Dacca, was we think as great as usual and perfectly orderly and quiet."

পূর্বে ঢাকার নবাবপুর এবং ইসলামপুরের মিছিল একই দিনে বের হত। নবাবপুরের মিছিল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। শোনা যায়, একদা নবাবপুরের কোন লোক ইসলামপুরের বাসিন্দাদের ধর্মকর্মহীন বলে উপহাস করেন। এই উক্তিতে ইসলামপুরের অধিবাসীদের প্রাণে আঘাত লাগে। এর পর ইসলামপুর-বাসীরা পল্লীর উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হন। অনেকে পল্লীবাসীর কাছে নবাবপুরের অনুকরণে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে কৃষ্ণ বলরাম সাজিয়ে মিছিল বের করার প্রস্তাব দেন। এবং সেই থেকে ইসলামপুরের মিছিলের সূত্রপাত।

ঢাকার মিছিলের সূচনা সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৪৬ *Eastern Bengal and Assam Era*, Sept. 11, 1915, Page 5

৪৭ *The Dacca News*, 22nd August, 1857, Page 342

নানা ব্যক্তি নানা সময়ের উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভুবনমোহন বসাক[৪৮] মহাশয় লিখেছেন, "বর্তমান সময় যে-স্থানে পিরু মুনশীর পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উত্তরাংশে আজানুলম্বিত জটাজূটধারী দীর্ঘকায় এক মহাপুরুষ সাধু বাস করিতেন।...অত্যল্পকাল মধ্যেই ঐ সাধু মহাত্মা প্রভূত প্রতিপত্তিশালী হইলেন এবং একে একে অনেক ভক্তমণ্ডলী সেই স্থানে আরতির সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলেরই দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইল এবং বঙ্গাব্দ ৯৬২ (ইং ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে) কিম্বা তৎপরবর্ত্তী সালের ভাদ্র মাস হইতে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে ভক্তমণ্ডলী ও প্রতিবেশী সুকুমারমতি বালকদিগকে পীতবসন পরিধান করাইয়া ও বিচিত্র শোভিত পতাকাদি হস্তে শ্রীশ্রীরাধিকার জন্মোৎসবে সংকীর্ত্তন বাহির হইতে আরম্ভ করে। উক্ত কীর্ত্তন শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরের পূজা মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রদক্ষিণ করিত এবং সুকুমারমতি বালকদিগের 'জয় রাধারাণী কি জয়' শব্দে দিক্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিত। এই কীর্ত্তন অনুমান ১০।১২ বৎসর রীতিমত বাহির হইবার পর সাধুর উৎসাহে ও জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত বসুক ও নাগদাসদিগের চেষ্টায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সামান্য চাঁদা সংগৃহীত হইত এবং রাধাষ্টমীর কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে জন্মাষ্টমীর নন্দোৎসবের সময় অপেক্ষাকৃত জাঁকজমকের সহিত একটি মিছিল বাহির করিবার প্রস্তাবনা হয় এবং এই প্রস্তাবে সকলেই একমত হন।"

অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[৪৯] একটি নিবন্ধে লিখেছেন: "বাঙ্গালা ৯০২ সাল ইংরেজী ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নবাবপুর নিবাসী পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণদাস বসাক মুচ্ছুদ্দি "লক্ষ্মীনারায়ণ" চক্র নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। জন্মাষ্টমী মিছিল সেই লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রের প্রীত্যর্থে কৃষ্ণদাস মুচ্ছুদ্দি কর্ত্তৃক তদবধিই চলিয়া আসিতেছে।"

১২৫৮ সালে রাস্তায় মিছিল নিয়ে নবাবপুর ও ইসলামপুরের দলের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয় এবং ১২৫৯ সালে এই নিয়ে দুই পক্ষে দাঙ্গাও বেধেছিল। ১২৬০ সালে উভয় পক্ষ মিছিল বের করার ব্যাপারে সরকারী অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন করলে ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা শহরের শান্তিরক্ষার কথা বিবেচনা করে রায়সাহেবের বাজারের সাঁকো যাতে কোন দল অতিক্রম না করে এবং প্রত্যেক

৪৮ ভুবনমোহন বসাক, ঢাকা জন্মাষ্টমী মিসিলের ইতিহাস, ১৩২৪, পৃষ্ঠা ১

৪৯ অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা জন্মাষ্টমী মিছিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, শান্তি, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩৫, পৃষ্ঠা ২৫৭

পক্ষই এই সাঁকো থেকে অন্যূন পঞ্চাশ গজ দূর থেকে মিছিল সহ প্রত্যাবর্তন করে তার নির্দেশ দেন। এই আদেশের পর নবাবপুর-পক্ষ মিছিল বের করা বন্ধ করেন। ওই বছর ইসলামপুরের মিছিল বের হয়েছিল।

শোনা যায়, ১২৬২ সালে সরকারের পক্ষ থেকে উভয় দলকে ডেকে পাঠানো হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয়, যে-বছর নবাবপুরের লোকেরা প্রথম দিন মিছিল বের করবে ঠিক তার পরের দিনই ইসলামপুরের মিছিল বের করার অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর এক বৎসর নবাবপুর-পক্ষ প্রথম দিন, ইসলামপুর পক্ষ দ্বিতীয় দিন এবং পরবর্তী বৎসর ইসলামপুর-পক্ষ প্রথম দিন ও নবাবপুর-পক্ষ দ্বিতীয় দিন—এই নিয়মে মিছিল বের করতেন।

রামরাজাতলার মিছিল

প্রাচীন কালের আর-একটি উল্লেখযোগ্য মিছিল হল রামরাজাতলার মিছিল। অতি সম্প্রতিকালেও এই মিছিলের জৌলুস কমেনি। কয়েক বছর আগে এই মিছিল চাক্ষুষ করে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এক শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে রামরাজাতলার 'রামরাজা', বাকসাড়া পল্লীর 'নবনারী' এবং ইছাপুরের 'শৌমচণ্ডী' প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য সহস্র-সহস্র নর-নারীর ভিড় হয়েছিল। মেলা অবশ্য কয়েকদিন আগে থেকেই বসেছিল। ওইদিন ভোর থেকে হাতা, খুন্তি, বঁটি, কাটারি, ধামা, ঝুড়ি, শাঁখ, খেলনা, নানারকম মাটির ও কাঠের পুতুল, সিঁদুর-আলতা, ইত্যাদি নিয়ে পথের দু'পাশে সারি-সারি দোকান জমে উঠেছে। ভোর থেকে তালপাতার ভেঁপুর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তালপাতার ভেঁপু আর মুখোশের চাহিদা লক্ষ্য করার মতো। এর প্রধান ক্রেতা ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা। একটু বেলায় মাইকের আওয়াজ কানে এল। যে যাঁর মাইক মারফত ছায়াছবির গান বাজিয়ে সমবেত শ্রোতাদের শোনাচ্ছিলেন। চারিদিকে উৎসবের পরিবেশ—যে-পরিবেশ কলকাতা শহরে বিভিন্ন পল্লীতে দুর্গাপূজার সময় চোখে পড়ে। সেই পরিবেশ, সেই উদ্দীপনা চোখে পড়ল হাওড়ার

দাকু´লার রোড, রামচরণ শেঠ রোড ও সাঁত্রাগাছির মোড়েও। কলকাতার বিভিন্ন পল্লীতে দুর্গাপূজার বিজয়ার দিন যেমন খাবারের দোকানের সামনে রাস্তার ধারে চৌকি পেতে নানারকম মিষ্টি সাজাতে দেখা যায়, এখানকার বিভিন্ন রাস্তায় মিষ্টির দোকানেও ওইভাবে খাবার সাজানো হয়েছে। শুনলাম, মিছিল দেখবার জন্য বড় রাস্তার ধারে প্রায় প্রতি বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী এবং রবাহূতের আগমন হয়। মিছিল বের হবার পূর্বেই নিরঞ্জন শোভাযাত্রা পরিক্রমার পথের দু-দিকে বাড়ির বারান্দা, ছাদ, জানালা এবং রাস্তায় নর-নারীর ভিড় বাড়তে থাকে।

হাওড়া থেকে প্রায় চার মাইল দূরে রামরাজাতলা। আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে বাহান্ন নম্বর বাস ধরে শীতলাতলায় নেমেছিলাম। তারপর দু-দিক দেখতে-দেখতে পৌঁছে গেলাম শঙ্কর মঠ অবধি। দুপুরেই ইছাপুর বারোয়ারির শোমচণ্ডী প্রতিমা সাকু´লার রোডের ওপর গাড়িতে উঠিয়ে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছিল। শোমচণ্ডী বিরাট মূর্তি। একপাশে মহাদেব (সাদা মূর্তি), আর-এক পাশে ইন্দ্র (রং হলদে)। তা ছাড়া সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুটি জগদ্ধাত্রী-মূর্তি, অন্যান্য দেবতা এবং কয়েকটি পরীর মূর্তিও ট্রাকের ওপর সাজাতে দেখা গেল। শুনলাম, কাছেই ইছাপুর শোমচণ্ডীতলা। ওই-স্থানে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে চার মাস পূজা হয় এবং শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার রামরাজার সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া হয়।

যাঁরা পথের পাশে বসে আরাম করে গল্প করছিলেন, ঢাক-ঢোলের আওয়াজ পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দেখা গেল, প্রথমেই এগিয়ে আসছে 'শোমচণ্ডী' প্রতিমার মিছিল। মিছিলের আগে কাপড় ও কাগজের তৈরি ঘোড়া বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে-নাচতে এগিয়ে এল।

ঘোড়া-নাচের সঙ্গে প্রায় দশ-পনের জন ঢুলির বাজনার ঐকতান। তারপর সঙ। রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে এল তাসা-বাদকের দল। বহু ব্যাণ্ডপার্টিও পর-পর নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। স্থানীয় ইছাপুর ব্যায়াম সমিতির সভ্যরাও সজ্জিত হয়ে এক সঙ্গে অতি নিপুণভাবে নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছেন। এর সঙ্গে আছে আরও বহু দল। মাঝে-মাঝে আনন্দ-উল্লাসে কয়েক জনকে নাচতেও দেখলাম। তারপর একদল গায়ক দেবীর বন্দনা-গান গেয়ে চললেন। গানটি হল :

অভয়দায়িনী অভয়া জননী
প্রণতি লহ মা ভুবনমোহিনী।
হর পাপ-তাপ চণ্ডিকা জননী
যোগীর বাঞ্ছিত যোগের যোগিনী॥

তারপর দেখা গেল দুটি 'নব-নারী'র মূর্তি। রামরাজাতলার নিকটবর্তী বাকসাড়া নামক পল্লীতে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত 'নবনারী কুঞ্জর' নামে বারোয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। আটজন প্রধানা সখী-সহ শ্রীরাধিকা একটি হস্তীর আকার ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। এটাই হল নবনারী কুঞ্জরের পরিচয়। দুটি প্রতিমাই দেখবার মতো। উক্ত প্রতিমার সঙ্গে গান-বাজনা, ঢুলি এবং ব্যাণ্ডপার্টি এগিয়ে চলল।

গোরুর গাড়ি অগ্রসর হচ্ছে সাবিত্রী-সত্যবানের মূর্তি নিয়ে। তারপর বিরাট যমরাজের মূর্তি, নারায়ণের মৃন্ময় মূর্তি, রামরাজার অনুগত ভৃত্য বীর হনুমানের বিরাট মূর্তি, গানের দল, আরও কত কী মিছিল করে এগিয়ে গেল।

মিছিলের সঙ্গে ছিল নানারকম সঙ। একজন সেজেছিল খাঁড়া-হাতে কালী, আর-একজন অসিহস্তে অসুর। মাঝে-মাঝে কালী এবং অসুরের যুদ্ধ, তার সঙ্গে বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র যুক্ত হয়ে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। আর-একটি ছিল বেদেনীর ভাল্লুক-নাচ। তা ছাড়া গাড়ির ওপর হনুমান-সঙটি দেখেও অপেক্ষমাণ জনতার কম আনন্দ হয়নি।

সঙ প্রসঙ্গে রামরাজা বারোয়ারির কর্তৃপক্ষের কয়েক জনের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বললেন, প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে নিরঞ্জনের দিনে কয়েকটি সমাজচেতনামূলক সঙ বের হত। সেইসঙ্গে রচিত হত ছড়া ও গান।

ওই বছর মিছিলে ঠেলাগাড়ির ওপর সাজানো হয়েছিল নানারকম বসা-সঙ। বাঁশ ও কাগজ দিয়ে তৈরি মাহুত-সহ বিরাট হাতি। তা ছাড়া ছিল রাক্ষসী এবং হনুমান-মূর্তি।

সবশেষে দেখা গেল রামরাজার গাড়ি। গাড়ির ওপর বিরাট মূর্তি। চারিদিকে বহু দেবতা নিয়ে রামরাজা চলেছেন। শুনলাম, প্রায় দু'শো বছর পূর্বে স্থানীয় অধিবাসী অযোধ্যারাম চৌধুরী এই পূজার প্রবর্তন করেন। সেই থেকে রামরাজার পূজা অদ্যাবধি চলে আসছে।

প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর দিন বারোয়ারির ছেলেরা মহাউৎসাহের

সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাগান থেকে বাঁশ কেটে আনা হয় মনসাতলায় এবং সেইদিনই সেখান থেকে মিছিল করে বাঁশগুলি আনা হয় রামরাজার বারোয়ারিতলায়। তারপর থেকে শুরু হয় মূর্তি গড়ার কাজ। রামচন্দ্রের পূজা আরম্ভ হয় চৈত্র মাসের রামনবমীর দিন থেকে এবং তা চলতে থাকে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত। যদি কোন বছর শ্রাবণ মাস মলমাস হয় (এই মাসে হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ) তাহলে আশ্বিন মাসে বিসর্জনের ব্যবস্থা হয়। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও হনুমান প্রভৃতির সমন্বয়ে অতিবৃহৎ রামরাজার মূর্তি এই মিছিলের প্রধানতম আকর্ষণ। এত বড় প্রতিমা সচরাচর দেখা যায় না। রামরাজাতলার মেলায় প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে। তবে দশহরা, অম্বুবাচী, স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীর ভিড় কিছু বেশি হয়।

রামরাজাতলার আর-একটি বড় আকর্ষণ হল যাত্রা। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস অবধি প্রায় প্রতি শনিবার এখানে যাত্রা হয়। বাংলাদেশে যত নাম-করা দল আছে প্রায় সব দলই এখানে যাত্রা করে গেছেন। এমন কি সেকালের স্বদেশী যুগের মুকুন্দ দাসের যাত্রাও এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া মাঝে-মাঝে ধর্মসভা, কীর্তন, পাঁচালী গানের আসর বসে।

রামরাজাতলা স্টেশনের কাছে 'শঙ্কর মঠ' একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। এই মঠের নাট-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে বিষ্ণুর দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে। মঠের জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের মূর্তিও দর্শকসাধারণকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপূজার বিসর্জনের মিছিল

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপূজার জাঁকজমক ও বিশিষ্টতা আজ বহুজনবিদিত। ১৯৬২ সালে চন্দননগর এবং ভদ্রেশ্বরে ছাব্বিশটি পল্লীতে সর্বজনীন জগদ্ধাত্রীপূজা হয়েছিল। প্রত্যেক পূজামণ্ডপে বিচিত্র সাজসজ্জা ও আলোকমালার ব্যবস্থা আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল সমগ্র পরিবেশকে। বিসর্জনের দিন সর্বত্র শোভা-যাত্রার ধুমধামও মনে রাখার মতো।

পূর্বে বিসর্জনের দিন বহুরকম সঙ ও বসা-সঙের আয়োজন করা হত এবং ১৯৬২ সালে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় আমরা কয়েকটি সঙ ও বসা-সঙ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। খলসানীর প্রতিমার গাড়ির সামনেও একটি বিরাট আকারের বসা-সঙ লক্ষ্য করেছি।

তিন দিন ধরে বেশ আড়ম্বর ও জাঁকজমকের মধ্যে জগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠানের পর প্রতিমা বিসর্জনের দিন চন্দননগরের বহু দূর-দূরান্ত থেকে আবালবৃদ্ধবনিতার সমাগম হয়। গঙ্গার ধারে প্রায় আধ-মাইল ব্যাপী বাঁধানো স্ট্র্যাণ্ডে বিসর্জনের মিছিল দেখতে লক্ষাধিক নর-নারীর ভিড় প্রতিবছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাস্তার দুইদিকে নানাবিধ সামগ্রীর দোকানের সংখ্যাও কম নয়। কোন-কোন পল্লীতে নানারকম বসা-সঙ সাজিয়ে শহরের উৎসবের পরিবেশকে আরও নয়নাভিরাম করা হয়।

পনেরো থেকে বিশ ফুট উচ্চ চন্দননগরের বিরাট প্রতিমা সিংহের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সিংহের তলায় প্রকাণ্ড একটা হাতি। প্রতিমার অধিকাংশ কাজই সোলার। বিরাট চালচিত্র-সহ কয়েকটি প্রতিমা উচ্চতায় প্রায় চল্লিশ ফুটেরও বেশি। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার বৈশিষ্ট্য দর্শকদের সহজেই মুগ্ধ করে, একথা বলাই বাহুল্য।

অন্যান্য অঞ্চলের সঙের কথা

সেকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাম নিত্যউৎসবমুখর ছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষ সুখ-দুঃখের মধ্যেও বারো মাসে তেরো পার্বণের অনুষ্ঠান করতেন। কথকতা, যাত্রাগান ও কীর্তনের নিয়মিত আসর তো ছিলই, তা ছাড়া সঙের মাধ্যমে পরিবেশন করা হত সমাজচেতনামূলক ছড়া ও গান। শুধু তাই নয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটাক্ষ ও বক্রোক্তি করে সমাজের নানা দোষ-ত্রুটি নিয়ে গান ও ছড়া লেখা হত। সেকালের একটি সাময়িকপত্রে[৫০] চুঁচুড়ার সঙের এইরূপ উল্লেখ আছে: "পূর্বে চুঁচুড়ার সঙ হইত। এক্ষণে যে তাহা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে এমত নহে।"

৫০ সাধারণী, ২২ চৈত্র ১২৮১, পৃষ্ঠা ২৭০

হুগলীর সঙ সম্পর্কে তৎকালীন একটি পত্রিকায়[৫১] নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল :

"গাজনে সঙ বন্ধ

লাইসেন্স না লইবার অজুহাত

হুগলী, ২২শে এপ্রিল—বৎসরের প্রথম রবিবার এখানে গাজন হয়। এবারেও হইয়াছিল, কিন্তু সঙ বাহির হইলে পুলিশের হুকুমে তাহা বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়, কারণ তজ্জন্য পূর্বে কোন লাইসেন্স লওয়া হয় নাই। —ফ্রী প্রেস।"

ওই পত্রিকায়[৫২] হুগলীর সঙ সম্পর্কে আরও একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল :

"গাজন মেলা উপলক্ষে শোভাযাত্রা

পুলিশের লাইসেন্স না পাওয়ায় বন্ধের হুকুম

হুগলী, ২৩শে এপ্রিল—গত রবিবার গাজন মেলা সম্পর্কে শিবতলাতে একটি সঙের শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। প্রকাশ যে, ঐ শোভাযাত্রাকে প্রথমে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরে হুগলী স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘের নায়ক শ্রীযুক্ত শিবকালী সরকার 'লাইসেন্স' আনিলে পর আবার মিছিল যাইতে দেওয়া হয়। —ফ্রী প্রেস।"

একদা মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের পৌষ-সংক্রান্তির মেলা বিখ্যাত ছিল। জিয়াগঞ্জের এই মেলা উপলক্ষে নানারকম সঙ বের হত।

শোনা যায়, বর্ধমানে সদরঘাটের মেলাও এককালে বেশ ঘটা করে বসত। নদীর ধারে মেলার দিন অনেকে ঘুড়ি উড়িয়ে দিন কাটাত। নানারকমের সঙ বের হত। সঙ ছড়া কাটত, গান গাইত। মেলায় বেশ জন-সমাগম হত। অনেকে বলত, 'সদরঘাটের জাত'। মেলায় নানারকম দোকান বসত।

এককালে খানাকুল কৃষ্ণনগরের ঘণ্টেশ্বর শিবঠাকুরের চড়কের মেলা বিখ্যাত ছিল। শোনা যায়, চড়কের মেলা উপলক্ষে নানারকম সঙ বের হত।

হুগলীর হরিপাল থানার অন্তর্গত তালদহ গ্রামের সঙও একসময়ে বিখ্যাত ছিল। দ্বারহাট্টা, চণ্ডীগড়, রাধানগর, কুমারবাজার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দলে-দলে গ্রামবাসীরা তালদহে সঙ দেখতে যেতেন।

৫১ বাঙ্গালার কথা, ১০ বৈশাখ ১৩৩৬, ২৩ এপ্রিল ১৯২৯, পৃষ্ঠা ৬

৫২ বাঙ্গালার কথা, ১১ বৈশাখ ১৩৩৬, ২৪ এপ্রিল ১৯২৯, পৃষ্ঠা ১

প্রায় একশো বছর আগে ত্রিবেণীর নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে প্রতি বছর বিভিন্ন পূজা-পার্বণে সঙ বের হত।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সঙের ছড়া ও গান

দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময়ে দেশপ্রেমিকরা সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে একতা ও সম্প্রীতির কথা বার-বার প্রচার করেছিলেন। কিন্তু কোন-কোন সাম্প্রদায়িক দল ও নেতাদের প্রকাশ্য বিদ্বেষমূলক প্রচারকার্যের ফলে বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সেদিন এক বিরাট সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। এমন কি বিভিন্ন সময়ে বিষময় ও বিভীষিকাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বহু নিরীহ নর-নারী ও শিশু প্রাণ হারিয়েছে।

বাংলাদেশের সঙের দল শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও রঙ্গ-রস পরিবেশন করেই কর্তব্য শেষ করেনি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের মধ্যে প্রীতি ও সংহতির জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। সঙ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে প্রচার ও সক্রিয় আন্দোলন থেকে পিছিয়ে থাকেনি। দেশের ক্ষতিকারক দল ও নেতাদের সম্পর্কে এবং তাঁদের ঘৃণ্য ও নোংরা কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও মানুষকে সচেতন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। অনেক জায়গায় সংঘবদ্ধ পল্লীবাসীরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে সঙের মাধ্যমে গান গেয়ে প্রচার চালিয়েছিলেন। এইসব গান শোনার জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ভিড় হত। সঙের মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ফেরিওয়ালা, দোকানদার এবং ক্রেতা নির্দ্বিধায় যোগদান করতেন।

সেকালে কলকাতা শহরের ঘোড়ার গাড়ির অধিকাংশ চালক ও কোচোয়ান ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। সঙের মিছিলে এঁদেরও দেখা যেত। মিছিল ও মেলাকে কেন্দ্র করে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সহজ মেলামেশার একটা সুযোগ হত, কিন্তু কোন-কোন সাম্প্রদায়িক নেতা একে সুনজরে দেখেননি, ফলে কলকাতার জেলেপাড়ার সঙের মিছিল বের করা নিয়ে কয়েক বছর বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল।

কোন-কোন অঞ্চলে সঙের মিছিলে মুসলমান গায়ক ও বাদকরা যোগদান করতেন। সঙ বের করার উদ্যোগ-আয়োজনে এই সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকাও

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেকালে কলকাতার হ্যারিসন রোডে বহু পেশাদার ব্যাণ্ডপার্টি ছিল এবং এইসব দলের অধিকাংশ বাদক ও কর্মীরা ছিলেন মুসলমান। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে সঙের মিছিলে বাজনা বাজাবার জন্য এঁদের ডাক পড়ত। শোনা যায়, খিদিরপুর মনসাতলার সঙের মিছিলে কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করতেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচেষ্টা যে কত আন্তরিক ছিল খিদিরপুর মনসাতলার নিম্নোদ্ধৃত দুটি বিখ্যাত ছড়া থেকে তা জানা যায়—

(১)

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার যত বিদেশী তস্কর,
সজাগ হয়েছে দেশবাসী, মজুর-চাষী লস্কর।
আমরা হয়েছি এক, কেরাণী, উকিল, মাষ্টার,
আমরা তোমাদের লুটতে দেব না আর।
হিন্দু-মুসলমান গায় স্বরাজের গান,
আমরা সবাই হয়েছি একপ্রাণ।

(২)

বছরের শেষে গাও ভাই হেসে হেসে,
স্বরাজের গান, হয়ে একপ্রাণ,
গোলামী আর সহে না।
শত বিরোধের বাণী, নিয়ে যারা করে কানাকানি,
তাদের চোখে যেন পড়ে শুধু ছানি,
একতা ছাড়া স্বরাজ হবে না।
হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান,
সবার এই দেশ, সবার এই স্থান,
সবার তরে মোরা স্বরাজ চাই।
কোরো না আর অভিমান,
হয়ে মোরা একপ্রাণ,
স্বরাজের গান গাই।

ভূকৈলাসের (খিদিরপুর) সঙের নিম্নলিখিত গানটি থেকেও তখনকার দিনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়—

ও ভাই হিন্দু, ও ভাই মুসলমান,
বিদেশীকে দূর করে আগে বাঁচা প্রাণ।
স্বরাজ কেউ পাঠিয়ে দেবে নাকো জাহাজে ভরে,
আনতে হবে হেঁচকা টানে সবার হাত ধরে।
সবারে ডাকো—ভাই বলো, সবাই মোদের দেশবাসী,
স্বরাজ এলে দুঃখ যাবে, ফুটবে মুখের হাসি।

খিদিরপুর পদ্মপুকুরের সঙের মুখ থেকেও শোনা গেছে—

এবার হাত পড়েছে পকেটে।
ও ভাই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সিঁধেল বোম্বেটে॥
বিদেশী মাল হলো পয়মাল, বিকায় না প্রায় আর হাটে।
বিদেশী নুন, চিনি, বসন, দূর কর ঝাঁটার চোটে॥
গোরার পায়ে তেল না দিয়ে, আপন বশে খাও খেটে।
হিঁদু-মুসলমান, সব মিলে কোমরটা ভাই বাঁধ এঁটে॥
দেশের মাতৃসেবক যারা, মোদের জন্যে জেল খাটে।
এবার মরণ কামড় দিয়ে সবাই চেপে ধর বয়কটে॥

খুরুটের (হাওড়া) সঙ গান বেঁধেছিল—

বিভেদজ্ঞান ভুলে রে ভাই, আয় না সবাই সে গান গাই।
যে গানে প্রাণ মাতোয়ারা, বসুন্ধরা কাঁপে ভাই॥
এক মায়ের সন্তান মোরা, পর তো কভু নই রে ভাই।
ভালবাসা দূরে ফেলে দলাদলি কেন ভাই॥

ঢাকার ইসলামপুরের মিছিলের একটি গানের মাধ্যমে বলা হয়েছিল—

হিন্দু-মুসলমান জাগ রে সমান, প্রাণে প্রাণে বেঁধে রাখ কষিয়া,
ঘুম ভাঙ্গ দেশবাসী মিলিয়া,
দেখ দেশের ধন কাহারা যাইতেছে লুটিয়া।

কলকাতা এবং অন্যান্য অঞ্চলে যাঁরা দল বের করতেন অথবা সঙ সাজতেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না, বরং বলা যেতে পারে সামান্য লেখা-পড়া-জানা মানুষ। তবু তাঁরা তাঁদের সাধ্যমতো দৃঢ়তার সঙ্গে সঙের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। এইসব

ছড়া ও গান তারই নজির। হয়তো এগুলির কাব্যিক মূল্য বেশি নেই, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এইভাবে রাস্তায় নেমে যে প্রশংসনীয় কাজ করেছিলেন তারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে আজও।

সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ মুখে রং-কালি মেখে সঙ সেজে হাসি-ঠাট্টার ভেতর দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার অবসানের জন্য সেদিন যে সুমহান্ আদর্শের বাণী-প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, কোন-কোন স্বার্থান্ধ নেতার চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধির জন্য তা দীর্ঘস্থায়ী ও বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারেনি—এটাই সব চেয়ে পরিতাপের বিষয়।

৪ ॥ সঙের গানে নানান ভাষা

সাদামাটা ব্যঙ্গের ভাষা সাধারণের কাছে সহজবোধ্য হলেও তাকে আরও আকর্ষণীয় ও সার্থক করার জন্য রঙ্গ-রসের সংমিশ্রণের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু ও কটাক্ষকে সুতীব্র করার জন্য বাংলার সঙ্গে বিদেশী ভাষাও ব্যবহার করা হত। একদা বাংলা ও ইংরেজী শব্দ মিশিয়ে গান রচনা করার প্রবণতা রূপচাঁদ পক্ষীর মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। প্রায় শতবর্ষ পূর্বেকার একটি গান উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

লেট মি গো ওরে দ্বারী, আই ভিজিট টু বংশীধারী।
এসেছি ব্রজ হতে, আমি ব্রজের ব্রজনারী ॥
বেগ্, ইউ ডোর কিপর, লেট মি গেট,
 আই ওয়াণ্ট দি ব্লক হেড,
ফর্ হুম আউয়ার রাধে ডেড,
 আমি তারে সার্চ্চ করি।
শ্রীমতী রাধার কেনা সারভেন্ট,
 এই দেখ আছে দাসখত এগ্রিমেন্ট,
এখন করিব প্রেজেন্ট, ব্রজপুরে লব ধরি।
(দাসখত দেখে ঘুচবে জারী।)
মর‍্যাল ক্যারেক্টার শুন ওর,
 বটর-থিব, ননী-চোর,
ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওর, চোর মথুরার দণ্ডধারী।
 (রাখাল ভূপাল কপাল ভারী।)
কহে আর, সি, ডি, বার্ড কিং,
 বেলাক নান্‌সেন্স ভেরি কণিং,
ফ্লুটেতে ক'রে সিং, মজায়েছে রাই 'কিশোরী।
 কুলনাশা বাঁশী করে করি' ॥

বাংলা ও ইংরেজীর মতো বাংলা ও হিন্দী শব্দ মিশিয়েও যাত্রার গান রচিত হত। আগেই উল্লেখ করেছি, সঙের গানেও ওর প্রভাব পড়েছিল। সেকালে এইসব গানের আদর যথেষ্ট ছিল। ব্যোমকেশ মুস্তফী[১] যাত্রা-প্রসঙ্গে আলোচনা কালে সঙের কথাও লিখেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল: "ক্রমশঃ ইহা এতটা প্রলোভনজনক হইয়াছিল যে, কোন অভিনেতা হুবহু কোন নকল করিতে পারিলে, লোকে সন্তুষ্ট হইয়া বলিত—'অমুক দলের অমুক, কোটালের সঙ্ দেয় ভাল—অমুক ভোজপুরী দরওয়ানের সঙ্ দিয়েছিল চমৎকার!'—ইত্যাদি। ভাষারও বিশুদ্ধতা ছিল না। যে অভিনেতা তাহা রাখিতে পারিত, সে-ই বিশেষ প্রশংসা পাইত—অর্থাৎ দ্বারবান্ সাজিয়া ঠেট হিন্দী কথা—বা প্রাদেশিক হিন্দী শুদ্ধভাবে কহিতে পারা, কোটাল সাজিয়া ভাল উর্দ্দু কহিতে পারা, একটা চমৎকারিত্বের কথা ছিল। দেবল ব্রাহ্মণ সাজিয়া বঙ্গদেশীয় উচ্চারণ অনুকরণ, কিংবা ভিক্ষুক সাজিয়া মেদিনীপুর বা কাটোয়ার কথা নকল করিতে পারিলে, বিশেষ বাহবা পাইত। এই সময়ে ইহার নাম হয়—সঙ। এই সকল চরিত্র ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিলে, লোকে প্রশংসা করিয়া বলিত—লোকটা সঙ্ দিচ্ছে ভাল; —সঙ্ সেজেছে ভাল—কেহ বলিত না"।

বাংলা ও হিন্দী শব্দ মিশিযে যে-সব গান রচিত হয়েছিল ও সঙের মিছিলে যা গাওয়া হত তার একটি বিশিষ্ট নমুনা—'কাদের মল'।

কাদের মল, তাদের লালা একদম মাটিমেঁ মিল জানাজী।
তুম্ বি জাগা, হাম বি জাগা, জাগা মল মল থাসা,
রামনগর কি বস্তি জাগা, জঙ্গল হোগা বাসা॥
হরিনাম বুলি, শিক্ষাঝুলি, গোঁড়া হিন্দুয়ানি,
গঙ্গাস্নান মেঁ জেনানা দেখ্‌কে আড়ে আড়ে নজর হানি।
ম্যারেজ কি বাজার, হুয়া বহুত ভিয়ার, রুপিয়া লেকে জুলুম,
লিষ্ট দেখ্‌কে লেড়কিওয়ালার হোতা আক্কেলগুড়ুম॥

ঢাকার মিছিলের একটি গান এখানে উদ্ধৃত করছি:

নাচাও ভাইয়া জানী
নাচাও ভাইয়া জানী

১ ব্যোমকেশ মুস্তফী, যাত্রার আবৃত্তি, জাহ্নবী (গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত মাসিক

গাঁজা-সরাব পিও
পিছু খাইও খয়নি,
কমর হিলাকে নাচো,
মুঁহসে কহো বাণী,
মুঁহসে কহো বাণী।

বাংলা ও হিন্দী শব্দ মিশ্রিত নিম্নলিখিত গানটি একদা কলকাতা শহরের বিভিন্ন স্বদেশী মেলায় এবং খিদিরপুরের সঙের মিছিলেও গাওয়া হত :

দেশী কাপ্‌ড়া বাবু সব—দেশী কাপ্‌ড়া,
দেশী মিলমেঁ বনা হুয়া—হ্যায় পরদেশীসে আচ্ছা,
পাট মিশালা নাই কুচ্‌ ইসমেঁ, দেশী ধুতি সাচ্চা ;
দেশী কাপ্‌ডা বাবু সব—দেশী কাপ্‌ড়া।
উম্‌দা জমীন, মিহিন সুতি, রং বেরংকা শাড়ি ধুতি,
উম্‌দা উম্‌দা পাড় বনায়া, দামভি নেহি চড়া।
দেশী কাপ্‌ড়া বাবু সব—দেশী কাপ্‌ড়া ॥
ইস্‌ মুলুককা ঢাকা মস্‌লিন্‌, এ দুনিয়ামে হুয়া সবচিন্‌,
ইস্‌কা আদ্‌মি লেতা পর চিজ্‌, আপনা ঘর চিজ ছোড়া!
দেশী কাপ্‌ড়া বাবু সব—দেশী কাপ্‌ড়া।
ঘরকা রুটি, পর্‌কো দেতা, আপনা মায়ী ভো'কে রোতা,
এলেম্‌ লেকে উল্লু হোতা, নাহি কৈ ইস্‌ জোড়া।
দেশী কাপড়া বাবু সব—দেশী কাপ্‌ড়া ॥

নানা ভাষার ব্যবহারে বা সংমিশ্রণে সর্বদা সংগতি বা বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যে সম্ভব হত না মালদহের বহুপ্রচলিত গম্ভীরা গানের নিম্নোদ্ধৃত কিছু অংশ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে :

১। ভোলা কাইসে ভজনা করি হো
মাইতো অবলা নারী॥

২। না জানি ভজনা, না জানি পূজনা
সুজনা সঙ্গ না করি হো,
বাতাও ভোলা, কাইসা কো ভালা,
হামারি চোলা তরি হো॥

৩। অন্তরা থানা সদা চঞ্চলা
থিরা নাহি পালা ঘড়ি হো
সদা কুমতি কুপথে গতি
কাইসা কো ভোলা নিবারি
পশুপতি ভাবনা ভাবি হো ॥

বাংলা ও হিন্দী শব্দ মিশ্রিত গান ও কথাবার্তা প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[২] লিখেছেন :

"A simplified Eastern Standard of Hindustani in fact may be said to be in existence. In it, grammatical gender is ignored; and the passive and neuter constructions of the transitive verb in the past tense, which is so characteristic of Western Hindi, have been done away with. There are other simplifications also. Although it would be heresy against High Hindi and Urdu to countenance in writing such a form of the language, it is nevertheless used in daily life by even educated classes in Eastern U.P. and in Bihar. This Eastern Standard of Hindustani has a vigour and charm of its own, and the absence of the complications of Western Hindi grammar brings about a simplicity which adds not a little to its vigour and its beauty. As yet, no serious literature has been attempted in it, although here and there conversations and fragments of verse and stories in it have been written down. Dialectal differences have always been keenly felt in India, and have been made use of in the Indian drama ever since the beginning of the theatre in the country. At the present day, it is common to find Bengali dramas in which in addition to the Standard Colloquial of Calcutta, the Rāḍha or West Bengali dialect, the East Bengali dialect (there has also grown up what may be called the Calcutta Stage East Bengali, which is an attempt to imitate the speech of Dacca), Oriya and Hindustani feature; and a quaint mixture of

২ Suniti Kumar Chatterji, Calcutta Hindustani. A Study of a Jargon Dialect, (*Indian Linguistics, Bulletin of the Linguistic Society of India*, vol. 1, parts II-IV, 1931), pages 16 18

Bengali and Hindustani, a sort of stage 'little language' with many affectedly 'innocent' touches, is commonly used in the drama as the speech of aboriginal jungle tribes, to emphasise upon their character as a simple and unsophisticated folk, living an idyllic life, and in their innocence speaking a childish mixture of Hindi and Bengali the mixture of Bihari, Hindi, and Bengali, used by the sweepers and labourers of aboriginal affinities from Chota Nagpur, is the basis of this stage speech. The Hindustani used is the *Bazar* form of it, the Bengali writer usually not being conscious of the existence of a purer type of the language. In some popular Bengali farces and comedies, songs and sometimes whole scenes are in this dialect, or in an artificial blend of Bengali and Hindustani. Such scenes are common enough in the writings of authors like Girish Chandra Ghosh and Amritalal Bose, the two most famous names in the history of the Bengali stage and drama.

"Scenes and passages from the printed works of these writers will furnish good specimens of this dialect. This practice the modern Bengali drama took over from the popular yatra plays : these usually had comic preludes and close-ups, called **Saṃ** (pron. **Shŏng**) in Bengali (=**Swāng** of Hindustani), as well as comic scenes, in which some of the characters might use Hindustani. Thus a common scene, as a **prastāvanā** to a **yātrā** play of the old type, on a theme from the Rāmāyaṇa or the Mahābhārata or the Purāṇas, would introduce the King's sweepers (**methar** or **Jhāṛudār**) named **Kāḷuā** and **Bhuluā**, who would exchange repartees with the King's officials : there would be dancing and singing, and the conversation would be in Hindustani as well as Bengali.

"In the city of Calcutta formerly there used to be an annual carnival, called also **Saṃ** (=**Swāng**) organised by the caste-guild of the Bengali *Kansaris* or brass and bell-metal workers who are an old and important community in the city. This institution was discontinued for some decades,

but about 12 years ago it was revived by another caste-guild, that of the Fishermen and Fishmongers (*Jaliyas*). The carnival takes place on the last day of the Bengali year, and consists of a huge procession in which members of the Bengali *Jaliya* caste dressed up in costume and character move along, either singly on foot, or in groups on decorated buffalo carts or lorries representing a scene or a dramatic situation. They sing and act and repeat verses satirising the events of the year as well as the various aspects of social life in Calcutta through its types and its professions. *Bazar* Hindustani is freely used, for instance where the up-country cobbler (**mocī**) or the Marwari trader, the Kabuli money-lender or the up-country washerman (**dhobī**) speaks. Booklets giving the songs and the scenes are published in the Bengali character, and these Hindustani songs form typical specimens of this dialect. Rarely, commercial leaflets, advertisements and catalogues in the Devanagari character written in this *Bazar* Hindustani are found."

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[৩] উক্ত প্রবন্ধে আরও বলেছেন :

"From the collection of verses etc. in Bengali and *Bazar* Hindustani sung or acted by members of the Fishermen's Guild of Calcutta at their annual carnival (*Jāliyāpāṛā Swāng* —published in the Bengali character as "Jelepāṛār Saṃ" for Bengali Year 1322 = 1916, edited by Jyotish Chandra Biswas).

These are not given in exact transliteration, but in a slightly modified romanisation.

(*a*) The Kabuli Moneylender loquitur

merī nām Gāphur Miyān: ham jab muluk-se āyā, sāthe lāya theṛā-se hing |
Baṛe-bājār-kā saṛik men baiṭh ke, din-bhar ohi cīj bec-ke, nafā-se pāc paisa le ke, gujrāte (=guzarte) ham din ǁ 1 ǁ
jo roj ek ṭho rupiyā hūā, ohi roj ham kasam khāyā, "ohī rupeyā toṛāe to ham harām-khor" |

৩ পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৪৮ ৫০

ek ādmi nām Rāmū Kahār, rupiya-ṭho us-ko diyā udhār, roj du paisā sūd diyā ū ba's-bhor (=baras-bhar) ॥ 2 ॥
sūd-men sab milā jetnā, udhār ham diyā utnā, sūd liyā rupiyā-men cār ānā |
abhī ham mahājan hūā, mahīnā-men sūd miltā tin sao rupeyā ;
jis-ko detā, letā us-ko gorū, jorū, dhotī aur uṛanā ॥ 3 ॥
se sālā badmāś rupiyā liyā nao mās, sūd diyā thoṛā bahut dū sao rupeyā—
aur nehi sūd detā—ohi-wāste sālā-ko gāli detā, aur ḍanḍā-se ṭhanḍā karne ehi dost-log-ko lāya : leāo sālā rupiyā ॥ 4 ॥

My name is Ghafur Miyan : when I came from my country, I brought with me some asafoetida.

Squatting on the street in Burra Bazar, selling that stuff the whole day, I would take only five pice from my profit and live on that for a day ॥ 1 ॥

The day that I made a rupee, that same day I took an oath, "I shall be an eater of forbidden food (*i.e.* no Mussulman), if I turn it into small coin." |

(There was) a man, by name Ramu Kahar : I gave him the rupee on loan ; he gave me interest on it for a whole year, two pice every day. ॥ 2 ॥

All that I received in interest I lent out, and I took interest at the rate of four annas for the rupee.

Now I have become a banker, every month I receive three hundred rupees in interest ; I take away from the man whom I lend his cattle, his wife, even his *dhoti* and his covering sheet (*oṛhni*). ॥ 3 ॥

This fellow is a bad one, he took money from me nine months ago, and interest he paid some two hundred rupees :

No more interest he pays now : that is why I abuse the fellow ; and I have brought these my friends to quiet him with the big stick : come, fellow, pay down my money. ॥ 4 ॥

৫ ॥ বহুরূপী

এককালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে 'বহুরূপী' দেখা যেত। বহুরূপী অর্থাৎ বহুরূপধারী মানুষ। এদের পেশা হল নানারকম রূপ ধারণ করে অর্থোপার্জন করা। কখনও ভয়, কখনও আতঙ্ক, কখনও কৌতুক, কখনও বিস্ময় উদ্রেককারী বিবিধ সাজে সজ্জিত হয়ে মানুষকে বিচিত্র রসের আস্বাদ দিয়ে শ্রমের বিনিময়ে এরা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করত। নানারকম রূপ ধারণ করে কিছুদিন এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে মাসের শেষে বহুরূপী প্রতি গৃহস্থের বাড়ি থেকে সিধা বাবদ চাল, ডাল, কাঁচা আনাজ-তরকারি ইত্যাদি সংগ্রহ করত। অনেকে সন্তুষ্ট হয়ে কিছু পয়সা, দু-একটা পুরাতন কাপড় জামা দিয়েও বহুরূপীকে সাহায্য করতেন। তা ছাড়া মাসের শেষে কিংবা পূজা-পার্বণে, অথবা কোন বাড়িতে অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্মের অনুষ্ঠান হলে গ্রামের বহুরূপীদের সেইসব বাড়ি থেকে পার্বণী বা পারিতোষিক হিসাবে কিছু দেবার ব্যবস্থা ছিল।

নানাবিধ সাজ-পোশাকের জন্য কত বিচিত্র রকমের জিনিস যে বহুরূপীদের সংগ্রহ করতে হত তার ইয়ত্তা নেই; যেমন—বাঘ-ভাল্লুকের চামড়া, মুখোশ, নকল চুল-দাড়ি-গোঁফ, রং ইত্যাদি। অনেক সময় সঙের মতো ছড়া কেটে কিংবা নেচে গান গেয়ে বহুরূপীরা শ্রোতাদের মুগ্ধ করত।

ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন যে, উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে এদের 'বহুরূপিয়া' বলে। ডক্টর সাহা ঝাঁসীতেও এদের দেখেছেন। এখনও বহু স্থানে এরা লোকের চিত্তবিনোদন করে জীবিকা অর্জন করে থাকে। কিছুকাল পূর্বেও অনেক দেশীয়-রাজাদের দরবারে এদের খাতির ছিল। বহুরূপীর পেশা এখনো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। অনেকে বলেন, পূর্বে জম্মু-কাশ্মীরেও বহুরূপী দেখা যেত।

বহুরূপীর কথা উঠলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থে বারাসতের ছিনাথের কথা—"আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী।" এককালে পূর্ববঙ্গের কোন-কোন শহরে এবং কিছু গ্রামাঞ্চলে 'কালীনাচ'-এর উৎসব অনুষ্ঠিত হত এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটত

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন। শিব-শক্তি কাহিনী অবলম্বনে নানারকম গান ও শিবের বন্দনা গাইত পূর্ববঙ্গের বহুরূপীরা। মুখোশ পরে কালী সাজত। অনেকে মহাদেব সেজে নৃত্যগীতাদি করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক শ্রীপরিমল গোস্বামীর শৈশবের একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ এখানে অবান্তর হবে না। পরিমলবাবুর বয়স তখন অল্প। একদিন তিনি গ্রামের পথ ধরে ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে দেখলেন, অনতিদূরে বেশ ভিড় জমেছে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তিনিও এগিয়ে দেখতে গেলেন। ভিড়ের কাছে গিয়ে দেখেন বীভৎস কাণ্ড।

রাস্তার ধারে সবুজ ঘাস আর আগাছায় ভরা মাঠ। সেখানে কয়েকটি কলাপাতার ওপর যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল একটি মানুষের কাটা মুণ্ড। মুণ্ডের চারিদিকে ঘাস, আগাছা ও কলাপাতার ওপর চাপ-চাপ জমাট-বাঁধা রক্ত ছড়িয়ে আছে। প্রতিটি দর্শকের চোখে বিস্ময়! ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে সকলে এই বীভৎস দৃশ্য তাকিয়ে দেখছিল। পরে জানা গেল, এটা খুন-করা-মানুষের মাথা নয়। এ হল একটি বহুরূপীর কারসাজী। মাঠে গর্ত করে, পুরো দেহটা সেই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রেখে চারিদিকে কলার পাতা চাপা দিয়ে শুধু মুণ্ডটা বের করে রেখেছিল। এইসব কলার পাতার ওপর প্রচুর লাল রং ছড়িয়ে বহুরূপী বেশ একটি রোমহর্ষক দৃশ্যের অবতারণা করেছিল।

শ্রীগোস্বামী মহাশয় আরও একটি বহুরূপীর কথা বলেছিলেন: সাহেব পা ঝুলিয়ে একটি আসনে বসে আছে, আসনটি কাপড় দিয়ে ঘেরা। সেই আসনের নিচে রয়েছে একটি মানুষ—যে সাহেব-সমেত আসনটি মাথায় করে নিয়ে হেঁটে চলেছিল। সাহেব তাকে চিৎকার করে বলছে, 'জোরে চলো'। আসলে কিন্তু নিচে কোন পৃথক মানুষ ছিল না। সাহেব সেজে যে-লোকটি হেঁটে যাচ্ছিল তার পায়ের স্বাভাবিক রং কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু খড়ের তৈরি নকল পায়ে প্যান্ট ও জুতো পরিয়ে আসনের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা ছিল যে, মনে হচ্ছিল ওই দুটোই সাহেবের পা।

জেলেপাড়ার সঙের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা লোকান্তরিত জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের নিকটে শুনেছি যে, প্রায় ষাট-বাষট্টি বছর পূর্বে কলকাতার রমানাথ কবিরাজ লেনে এক প্রসিদ্ধ বহুরূপী বাস করতেন। বিশ্বাস মহাশয় সেই বহুরূপীর বিখ্যাত একটি গানের যে কয়েকটি লাইন আমাদের শুনিয়েছিলেন তা এখানে লিপিবদ্ধ করা হল:

ভাং ধুতুরা খায় ভোলা জঙ্গল যে,
আতর দি, গোলাপ দি,
তা' তো বাবা মাখে না,
হাতি দি, ঘোড়া দি,
তা' তো বাবা চড়ে না,
চড়ে কেবল এঁড়ে গরু……

বিশ্বাস মহাশয় আরও বলেছিলেন যে, সেই বহুরূপী কড়ি দিয়ে দাঁত তৈরি করে রাক্ষস সাজতেন। বাঘ-ছাল পরে বাঘের গর্জন করে গৃহস্থের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ভয় দেখাতেন। ছোট-ছোট শিশুরা এই বহুরূপীকে দেখলেই পালিয়ে যেত। উক্ত বহুরূপী আরও একটি বেশ মজার রূপ ধারণ করতেন। দৃশ্যটি এই-রকম: বাবু চলেছেন চেয়ারে বসে, গায়ে কালো আলপাকার গলা-বন্ধ কোট। তার উপর কাঁধে সাদা পাট-করা চাদর। পরনে ধুতি, পায়ে মোজা এবং ফিতে-বাঁধা জুতো। বাবুর হাতে ছাতা এবং একতাড়া কাগজ থাকত। কাঁধের সঙ্গে ঝোলানো থাকত একটা হাল্কা চেয়ার। চেয়ারের সামনে নকল পা দুটিতে মোজা ও জুতো পরানো। আসলে কিন্তু লোকটি নগ্ন পায়েই হেঁটে চলেছে। দেখলে মনে হত চেয়ারে-বসা বাবু।

বিশ্বাস মহাশয় প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে গোরখপুরে একজন বহুরূপীকে পর-পর কয়েকদিন নানারকম সাজে সেজে আসতে দেখেছিলেন। এই বহুরূপী পুলিশ, গোয়ালিনী, মহাদেব ইত্যাদি সেজে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দেখা দিয়ে যেতেন। স্থানীয় লোকেরা ওইভাবে রূপ ধারণকে বলত 'দর্শন'।

শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়[১] রংদার এক তিব্বতীয় বহুরূপী প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ক্রমে লাল সিং পাতিয়ালের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, রংদার এক তিব্বতী বহুরূপী গান করিতে করিতে আনন্দে নাচিতেছে, আর সারি সারি লোক জড় হইয়া তাহা দেখিতেছে। গানের কি সুর, কি গিটকিরি, কিবা গমক, আমাদের কাছে সে-এক অপূর্ব বস্তু। তিব্বতের গান শোনাও ভাগ্যে ঘটিয়া গেল।"

ত্রিপুরা জেলার জিংলাতলী গ্রাম নিবাসী শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি ছেলেবেলায় তাঁদের গ্রামে এক

১ শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর, (প্রবাসী প্রেস পৃষ্ঠা ২১৬

বহুরূপীকে দেখেছিলেন। সেই বহুরূপী ছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত চাষী-পরিবারের লোক। কখনও শিব, কখনও কালী, কখনও ভূত-প্রেত রূপে তাঁকে গ্রামে-গ্রামে ঘুরতে দেখা যেত। পেশা হিসাবে প্রধানত কাঠের কাজ, যেমন—নৌকা, আলনা, তক্তাপোশ, ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকানির্বাহ করতেন; আর অবসর সময়ে রোজগারের একটা পন্থা হিসাবেই বহুরূপী সাজতেন।

শ্রী চক্রবর্তী আরো বলেছেন যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর ও ঢাকাতেও তিনি অনেক বহুরূপী দেখেছেন। কখনো কানা, কখনো সুদখোর মহাজন বেশে তাদের দেখা যেত। দুধের কলসী নিয়ে গয়লানী সেজে চাঁদপুরের এক বহুরূপী গান ধরত :

সোয়ামী বেটা ফতুর,
মরেও গেছে মেরেও গেছে—
তাই জাত-ব্যবসা না করলেও চলে না।
এক সের দুধে পাঁচ সের পানি,
জ্বাল দিলে সর পড়ে না,
খেতেও স্বাদ লাগে না,
তবুও আমার খাঁটি দুধ না খেলে
হয় না বাবুয়ানি।

স্বর্গত সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বহুরূপী বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের কাছে যা বলেছিলেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য : বহু রূপে, বহু ভাবে, বহু ছদ্মবেশে যে আপনাকে প্রকাশ করে তাকেই বলা হয় বহুরূপধারী বহুরূপী। এর ইতিহাস অতি প্রাচীন। যুগে-যুগে রাষ্ট্রচেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে, অথবা বহু রাজশক্তির উত্থান-পতনে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে আমরা বহুরূপীর নানা পরিচয় পাই। এমন কি মুসলমানদের শাসনকালেও বহুরূপীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেরও নাম করা যেতে পারে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, শহরে ও পল্লীতে, একশ্রেণীর লোক সাধারণভাবে বহুরূপী নামে পরিচিত ছিল। পূর্ববঙ্গে, উত্তরবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে, এমন কি সুদূর পল্লীতে পর্যন্ত পূজা-পার্বণে বহুরূপীরা নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করত এবং কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে আবালবৃদ্ধবনিতাকে আনন্দ দিত। তাদের বিশেষত্ব এই ছিল যে, অর্থের জন্য তারা কাউকে উৎপীড়ন করত না। গ্রামের এইসব বহুরূপী

উচ্চশিক্ষিত না হলেও নিজেদের পেশা ও ব্যবসায়ে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। রঙ্গমঞ্চের কুশীলবদের মতো মূল্যবান সাজসজ্জায় ভূষিত না হয়েও তারা এমনভাবে রূপসজ্জা করত যে অতি পরিচিত ব্যক্তিও সহজে তাদের চিনতে পারত না।

স্বর্গত গুপ্ত এই প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন যে,—এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি বিশদভাবে বোঝানো যাবে: আমাদের নিবাস ছিল ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ থানার অন্তর্গত মূলচর গ্রামে। পদ্মার উত্তর পারে অবস্থিত এই গ্রামের পাশ দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি শাখা প্রবাহিত ছিল। সে-সময় ওই গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং বিভিন্ন বর্ণের বসতি ছিল। দুর্গাপূজা বা কালীপূজার সময় তখন নিয়মিতভাবেই বহু বহুরূপীর আবির্ভাব হত। একবার অষ্টমী-পূজার দিন ব্যারিস্টার হরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর বাড়িতে বসে বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, সেই সময় তাঁর ভৃত্য এসে সংবাদ দিল যে, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। ব্যারিস্টার সেন ভৃত্যকে বললেন, 'ভদ্রলোককে ভিতরে নিয়ে এসো।' দু-এক মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক ভিতরে এলেন। সেকালের জমিদারের মতো পরিপাটি তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ। ভদ্রলোককে দেখে ব্যারিস্টার সেন অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে বসতে বললেন এবং তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। ভদ্রলোক কাগজপত্রের একটা বাণ্ডিল বের করে দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন, আমি একটা ফৌজদারী কেসে পড়েছি। এই কাগজপত্র দেখে বলুন তো আমি জিতবো না হারবো? আর এজন্য আপনার ফী হিসাবে কত টাকা দিতে হবে?'

ব্যারিস্টার সেন বাণ্ডিলটা খুলে কাগজপত্র উল্টোতে থাকেন। দেখলেন তার ভেতর সবই বাজে কাগজ। তিনি বিস্মিত হলেন। এদিকে গ্রামের বহুলোক তখন গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলেন। এমন সময় সেন মহাশয়ের জনৈক বন্ধু গ্রামের এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে তাঁকে বললেন, 'মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত আছ বুঝি?' আর লোকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কি রে ন'কড়ি, ব্যারিস্টার-সাহেবকে কি মামলা বোঝাচ্ছিস্?'

ব্যারিস্টার সেন বললেন, 'কাগজপত্র দেখে কিছু বোঝা গেল না।'

তখন ভদ্রলোক বললেন, 'আরে এ যে আমাদের ন'কড়ি শীল!' হাসির রোল পড়ে গেল সেখানে। ভদ্রলোক আরও বললেন, 'আমাদের ন'কড়ি পুজোর সময় বহুরূপী সেজে বেরিয়ে পড়ে। আমরা বলেছিলাম, যদি সেন-সাহেবকে

ঠকিয়ে অপ্রস্তুত করতে পারো তাহলে পাঁচ টাকা মিষ্টি খেতে দেব। তাই, সেন-সাহেব, তুমি যখন ঠকে গিয়েছ তখন ওকে পাঁচ টাকা বকশিশ দিয়ে দাও।'

ব্যারিস্টার সেন হেসে ন'কড়িকে বললেন, 'খুব বাহাদুর বটে। এই নাও, আমি তোমাকে পাঁচ টাকা বকশিশ দিলাম।' খুশি হয়ে ন'কড়ি উপস্থিত সকলকে বলল, 'আপনারাই বা বাদ যান কেন?' তখন সকলে তাকে কিছু-কিছু দিলেন। ন'কড়ি হাসিমুখে চলে গেল।…এমনিভাবে সেকালে অনেক বহুরূপীকে দেখেছি যারা মগ সাজত, কুকী সাজত, ডাকাত সাজত, খুনী সাজত এবং বাইজী, খেমটাওয়ালী সেজে নৃত্যগীত পরিবেশন করে আসর মাৎ করত।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে কলকাতায় কয়েকজন পেশাদার কৌতুক-অভিনেতা ছিলেন। তাঁরা নানারকম রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আনন্দ-উৎসবের আসরে অংশ-গ্রহণ করতেন। এই প্রসঙ্গে এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন—সতীশ মুখোপাধ্যায় বা ফানিম্যান, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী এবং তারকনাথ বাগচী। তারকনাথ বাগচী[২] মহাশয়ের নিজস্ব ব্যবসায়ের একটি বিজ্ঞাপন তাঁর লেখা বইতে ছাপা হয়েছিল এবং এই বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরকম :

"সম্পূর্ণ নূতন, সম্পূর্ণ নূতন

"বঙ্গের ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন অদ্বিতীয় কৌতুক অভিনেতা নৃত্যকলা-বিশারদ এবং হাস্যপূর্ণ নানা মূর্তি ধারণে অসাধারণ কৃতবিদ্য—'চিত্রে ভাব-বৈচিত্র্য', 'বর-কনে' প্রণেতা প্রফেসর শ্রীতারক-নাথ বাগচী।

"মফঃস্বল ও শহরের যে কোন স্থানে গার্ডেনপার্টি, অ্যাট হোম, ফেয়ারওয়েল পার্টি, বিবাহ-মজলিশ, একজিবিসন, বেনিফিট নাইট, বারোয়ারি, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি যে কোন আনন্দ উৎসবে নৃত্য কৌতুকাভিনয়ে অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার এনগেজমেণ্ট লইবার জন্য প্রস্তুত আছেন। বহু রাজা, মহারাজা, জমিদার ও উচ্চপদস্থ ইংরাজের সম্মুখে কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রভূত যশ, মেডেল ও প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। যাহা এই ভারতে কেহ দেখেন নাই তাহাই দেখিতে পাইবেন এবং যিনি একবার এই চমৎকার ব্যাপার দেখিবেন তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। পারিশ্রমিক সম্ভব মত।"

২ তারকনাথ বাগচী, তারকের চাবুক

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বহুরূপীদের রূপপরিবর্তনের কলাকৌশলের প্রভাব শহরের দক্ষ অভিনেতাদের মধ্যেও পড়েছিল এবং সর্বস্তরের মানুষ রূপ-পরিবর্তন দেখে যথেষ্ট আনন্দ পেতেন।

রূপপরিবর্তন প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ[৩] মহাশয় একটি গ্রন্থের ভূমিকায় যা লিখেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

"দুনিয়ার নাট্যশালায় সকল সময় অভিনয় চলিতেছে। কেহ অভিনয় করিতেছে, কেহ তাহা দেখিতেছে। দেখিয়া উপভোগ করিয়া কেহ বা তাহার অনুকৃতি করিতেছে। সেই অনুকৃতিতে কলাকুশলী রূপ ও রসের অভিব্যক্তি করিয়া আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে।......"

বিদ্যাভূষণ মহাশয় উপরোক্ত ভূমিকায় আরও উল্লেখ করেছিলেন :

"পূর্বে আমাদের দেশে এই রস-সাধনার জন্ম চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই চৌষট্টি কলার মধ্যে একটি বিদ্যা আছে যাহার সাধনায় কলাবিদ্ বেশভূষা, ভাবভঙ্গীর সাহায্যে আপনাতে নানা রূপ প্রদর্শন করাইতে পারে। এই কলা অতিসূক্ষ্ম বিদ্যা। কুচুমার নামে এক ব্যক্তি এই বিদ্যার উদ্ভাবন করেন। তাই ইহার নাম হইয়াছে—'কৌচুমারযোগ'।"

৩ অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, তারকনাথ বাগচী প্রণীত 'চিত্রে ভাব-বৈচিত্র্য' গ্রন্থের ভূমিকা

৬ ॥ বসা-সঙ ও পুতুল

বাংলাদেশে লোক-সংস্কৃতির অনেক জিনিসই ক্রমে-ক্রমে লুপ্ত হতে চলেছে। এককালে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কাঁসি ও ঢাক বাজিয়ে কবির লড়াই হত। মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আকর্ষণীয় করা হত মঙ্গলগীতি। তুলসীর চারা সামনে রেখে কথকঠাকুর সুর করে আসর জমাতেন কথকতার। নীল আকাশের নিচে উন্মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হত যাত্রা-গান। শোভাযাত্রা-সহকারে সঙ বেরুত। পূজা-পার্বণে সাজানো হত পুতুল, কোথাও হত পুতুল-নাচ। এই-সব ক্রমেই লুপ্ত হতে চলেছে।

সেকালে বিভিন্ন পূজা-পার্বণে নানারকম মাটির পুতুল সাজানো হত। তাকে বলা হত 'বসা-সঙ', অর্থাৎ যে-সঙ নিশ্চল, নিস্তব্ধ বসে থাকে। এক-কালে চুঁচুড়া বসা-সঙের জন্য বিখ্যাত ছিল। রূপচাঁদ পক্ষীর একটি গানে চুঁচুড়ার সঙের কথার উল্লেখ আছে :

গুলি হাড়কালি, মা কালীর মত রং।
টান্‌লে ছিটে, বেচায় ভিটে,
বানায় যেন চুঁচড়োর সং ॥

শুধু চুঁচুড়া কেন, বসা-সঙের জন্য কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধিও কম ছিল না। বহু দূর থেকে দলে-দলে নর-নারী বসা-সঙ দেখতে কৃষ্ণনগরে যেতেন। বসা-সঙ বা পুতুল নিখুঁতভাবে তৈরি করতেন কৃষ্ণনগরের সুখ্যাত শিল্পীরা। আবহমান কাল ধরে নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যে তাঁরা যে-খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেই সুনাম ও মৃৎশিল্পের উৎকর্ষ আজও অম্লান রয়েছে কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের মধ্যে।

একদা কলকাতায় জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা ও চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনেক জায়গায় বসা-সঙ বা পুতুল সাজানোর ধুম পড়ে যেত। মফস্বলের কোন-কোন অঞ্চলে, বিশেষ করে জমিদার-বাড়িতে রাসযাত্রা ও বিভিন্ন পুজোয় সংলগ্ন মণ্ডপ সুদৃশ্য পুতুল দিয়ে সাজানো হত। কলকাতার ভিহি ইণ্টালী রোডের দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের বাড়িতে রাস ও দুর্গাপূজার সময় পুতুল সাজানোর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত ভবনে

রাসের সময় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুতুল ও দুর্গাপূজার সময় চণ্ডীমাহাত্ম্য অবলম্বনে দেবীর অসুর বধের বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করে সুন্দরভাবে সাজানো হত। তা ছাড়া উক্ত পথের ওপর শিবমন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হত পুতুল-নাচ। দর্শকের ভিড় হত যথেষ্ট। ইন্টালী, বেনেপুকুর, বেলেঘাটা, তালতলা প্রভৃতি কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে-দলে নর-নারী দেবনারায়ণবাবুর বাড়ি পুতুল সাজানো দেখতে যেতেন। ডিহি ইন্টালী রোডে এবং কাছে-পিঠের রাস্তার দু-দিকে নানারকম জিনিস নিয়ে ফেরিওয়ালার দল বিক্রি করতে বসত। পাঁপর-ভাজা, ঝালমুড়ি, শরবত, মিঠেপান, ছোটদের খেলনা, টুকিটাকি আরও কত কি জিনিস বিক্রি হত। রাস্তায় মেলা বসত, প্রায় বিশ-পঁচিশ দিন যাবত। এই লোভনীয় ও দর্শনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ইন্টালী অঞ্চলের ওই বাড়ি থেকে গত ১৯৪৩ সালের পর থেকে বন্ধ হয়েছে, কারণ সেই সময় সারা বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

প্রায় বিশ বছর পূর্বে ইন্টালী পানবাগান লেনের সরু গলির মধ্যেও পুতুল সাজানো হত। ১৯৬১ সালে ইন্টালী পদ্মপুকুরে (যদিও বর্তমানে পদ্মপুকুরের পুকুর নেই) পুকুর ভরাট করে পার্ক হয়েছে। উক্ত পার্কে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষেও পুতুল সাজানো হয়েছিল। ওই বছর বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল ঢুলি ও কাঁসি বাদক পুতুল দুটি। দূর থেকে এগুলি দেখে অনেকেরই জীবন্ত মানুষ বলে ভ্রম হয়েছিল। তা ছাড়া উক্ত পার্কে বাংলার ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে হাত-পা নাড়ানো পুতুল-নাচের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক কাহিনী অভিনীত হয়েছিল।

প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বে শ্যামাপূজার সময় কলকাতার তালতলা অঞ্চলের ডাক্তার লেন এবং কাছাকাছির অলি-গলি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত বসা-সঙ বা পুতুল দিয়ে সাজান হত।

সেকালের উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়ার দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে রাস উপলক্ষে পুতুল সাজানোর কথা অনেক বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়। টালিগঞ্জের প্রসিদ্ধ রাসযাত্রা দেখতে নানা জায়গা থেকে সহস্র-সহস্র নর-নারীর সমাগম হত। এখানে বসা-সঙ এবং হাত-পা নাড়ানো পুতুল-নাচের ব্যবস্থা থাকত। এককালে কলকাতার জেলেপাড়া থেকে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সঙের সঙ্গে গোরুর গাড়ি ও ঠেলা গাড়ি করে বসা-সঙও বের হত। জেলেপাড়া-অঞ্চলের কয়েকটি ঠাকুরবাড়িতে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে এখনও ছোট-ছোট পুতুল সাজানো হয়।

শোনা যায়, সেকালে কলকাতার নানা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময়ে রামলীলার মিছিল বের হত। সেইসব মিছিলের সঙ্গে থাকত রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি নানারকম পুতুল। প্রায় ৬০।৭০ বছর পূর্বে উত্তর কলকাতার সাতপুকুর থেকে বের হত রামলীলার মিছিল। রামলীলা অভিনয়ের শেষ-দিন এই মিছিল বের হত। বাদকের দল নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বিভিন্ন পথে ঘুরত। এক অনাবিল আনন্দের বন্যা বয়ে যেত পাতিপুকুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা বাংলাদেশে সমারোহের সঙ্গে রামলীলা অভিনয়ের সূচনা করেছিল। অভিনয়ের ব্যয় ও আনুষঙ্গিক খরচা সিপাহীদের নিজেদের আদায়ী চাঁদা থেকেই সংকুলান হত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে রাজা বৈদ্যনাথের বাগানেও প্রতি বছর রামলীলা অভিনীত হত। বাগানের চারিদিকে মেলা বসত। একাদিক্রমে বারো বছর রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে রামলীলার মেলা বসেছিল এবং এই রামলীলার অভিনয় ও মেলা দেখার জন্য বহু লোকের ভিড় হত।

সেকালের একটি পত্রিকায়[১] কলকাতার রাসের আমোদ-আহ্লাদের উল্লেখ দেখতে পাই: "রাসের আমোদও এখানে খুব হইত। শিয়ালদহের পূর্ব্বে যে সার পল্লী নামক অতি প্রাচীন গ্রামের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহাই এখন শুঁড়ো বলিয়া পরিচিত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র সর্ব্বপ্রথম দিল্লীর সম্রাটের নিকট চাকুরী সূত্রে রাজাবাহাদুর উপাধি সহ জায়গীর ও দশহাজার অশ্বারোহীর মুনসেব হইয়াছিলেন। তিনি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরী ছাড়িয়া ভবানীচরণ দত্ত মহাশয়ের পরামর্শে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং মেছুয়াবাজারের বাটী পরিত্যাগ করিয়া শুঁড়ায় যে উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সপরিবারে তথায় গিয়া বাস করিলেন। সেখানে মহা-ধুমধামে রাসোৎসব করিতেন, তদবধি আজি পর্য্যন্ত শুঁড়ার রাস অত্যন্ত বিখ্যাত।"

উপরোক্ত পত্রিকা[২] থেকে আরও যে-সব প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায় তার সারাংশ এইরূপ: তৎকালীন কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের গোকুলচন্দ্র মিত্র—যিনি বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহের কাছ থেকে মদনমোহন বিগ্রহ

১ নব্যভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ সাল, পৃষ্ঠা ৪১৩

২ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৪১৪

এক লক্ষ টাকায় বন্ধক রেখেছিলেন—রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করে বহু অর্থব্যয় করেছিলেন এবং সমস্ত পাল-পার্বণে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতেন। এর মধ্যে রাসযাত্রার উৎসবই প্রধান। রাসযাত্রা উপলক্ষে আমোদ-তামাশার ত্রুটি হত না।…বাগবাজারের ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণে ছিল একটি বড দীঘি। সেই দীঘিতে চারখানি নৌকা ভাসিয়ে মহিলাদের কবি গান হত। সেই সঙ্গে থাকত নানা-রকম সং। তা ছাড়া কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ছবিও টাঙানো হত। সুবৃহৎ রাসমঞ্চের সামনে সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে অবিশ্রান্ত ভাবে নৃত্য-গীত হত। দর্শকের ভিড়ে সামনের চিৎপুর রোড দিয়ে যাতায়াত করা সহজ ছিল না।……আহিরীটোলার নিমুগোঁসাই লেনের নিমাইচরণ গোস্বামীর বলরাম বিগ্রহের রাসের উৎসব হত চৈত্র মাসে। তা ছাড়া সিমুলিয়ার অনাথনাথ দেবের বাজারের দক্ষিণে বংশীধর মিত্রের বাড়িতে রাস উপলক্ষে বৃহদাকার ছবি ও পুতুল সাজানো হত।

সেকালে চুঁচুড়ার বসা-সঙের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। চুঁচুড়ার সঙ প্রসঙ্গে কিছু-কিছু বিবরণ তখনকার একটি পত্রিকায়[৩] ছাপা হয়েছিল: "আজ ঠিক পঞ্চাশ বৎসর হইল চুঁচুড়ার সঙ উঠিয়া গিয়াছিল। এবার বহু কষ্টে সেই সঙ পুনরারম্ভ করা হইয়াছে, তেমন হয় নাই। কিন্তু নিতান্ত মন্দও নহে।"

উক্ত পত্রিকা[৪] চুঁচুড়ার বসা-সঙের এইরূপ বিবরণ দিয়েছিলেন: "প্রথম সঙ—এজলাশ। তিন দিকে তিন চক্‌, দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী; অন্যদিকে বৃহৎ বটবৃক্ষ, মধ্যম রাশি কয়েকটা বকুলবৃক্ষ ও এক সারি ছোট ছোট বিলাতী ঝাউয়ের গাছ। দেওয়ানী কালেক্টরী একতলা; ফৌজদারী দোতলা। জজ সাহেবের এজলাশ; বোধ হয় দাওরা হইতেছে। একদিকে সাতজন জুরী বসিয়া আছেন, মধ্য জুরী স্থূলোদর, মাথায় হাতে-বাঁধা পাগড়ি। তিনজন জুরী যেন হঠাৎ ঘুমের চটকা ভাঙ্গিয়াছে এরূপ ভাবে চাহিয়া দেখিতেছেন; আর একজন বোধ হয় আফিঙ্গের ঘোর নেশায় মাথা নেটাইয়া পড়িতেছে; সঙ্গের বেহারার একদিকে দুইজন অপর দিকে দুইজন অপেক্ষা লম্বা হইলে সঙ যেরূপ কাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ বক্রিম ভাবে উপবিষ্ট হইয়া আছেন।"

নদীয়া জেলার শান্তিপুরে রাসের উৎসব বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। এখানকার ভাঙা রাসের শোভাযাত্রা দেখবার জন্য দেশের নানা স্থান থেকে বহু

৩ সাধারণী, ৩১ চৈত্র, ১২৮০ সাল, পৃষ্ঠা ২৯৭

৪ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ২৯৭

ফ্যানী পার্ক্‌স্‌ অঙ্কিত চড়ক-দণ্ডে দড়ি-বাঁধা সন্ন্যাসী
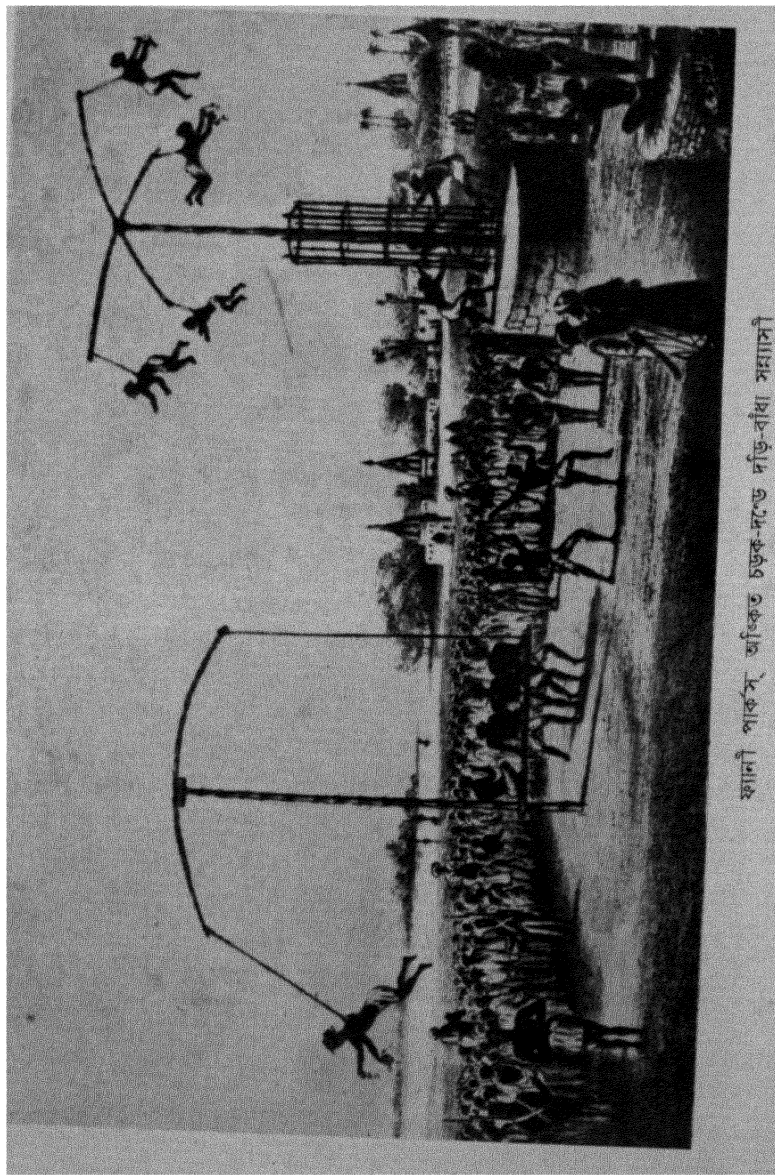
মিসেস বেলনস্‌ অঙ্কিত চড়ক-উৎসবের ছবি
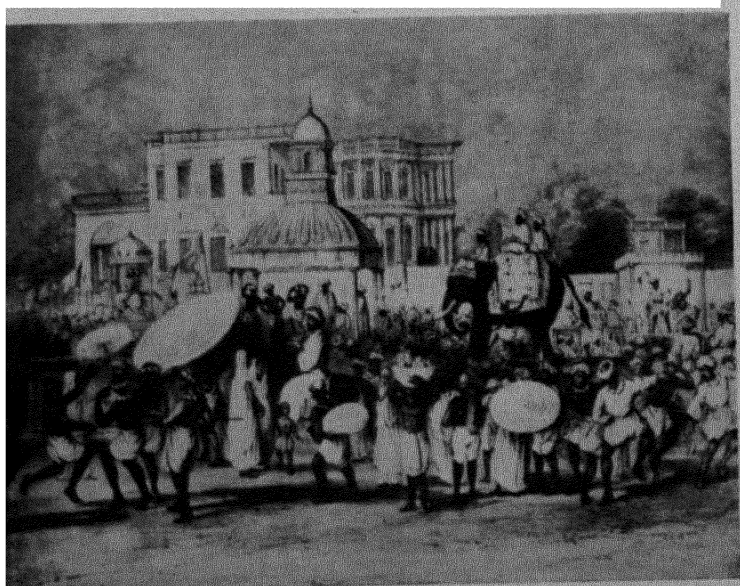
সেকালের চড়ক—স্যার চার্লস্‌ ডয়লী অঙ্কিত ছবির একাংশ
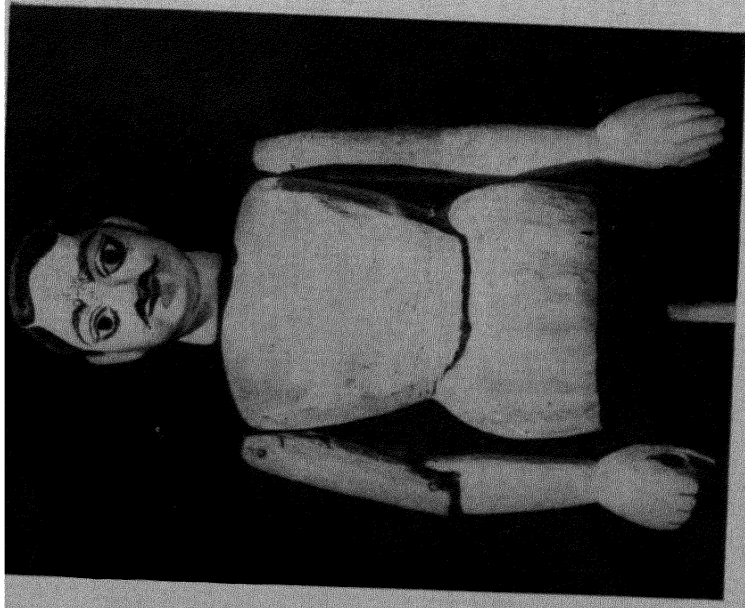
নাচপুতুলের কাঠামো (চব্বিশ পরগনা)

সজ্জিত নাচপুতুল (চব্বিশ পরগনা)

বাজারবেড়িয়ার পুতুলশিল্পী শ্রী কিশোরী কর্মকার

রাবণের মূর্তি (খড়্গপুর)

আমেরিকার পুতুল-নাচ
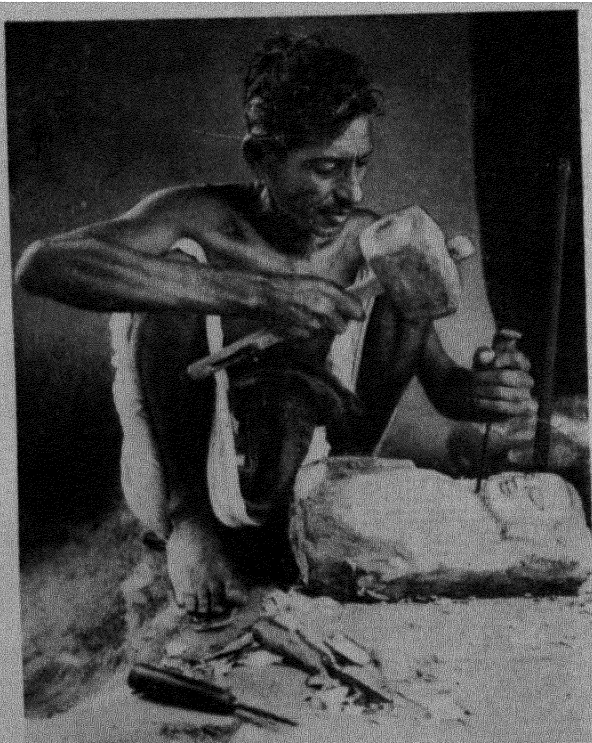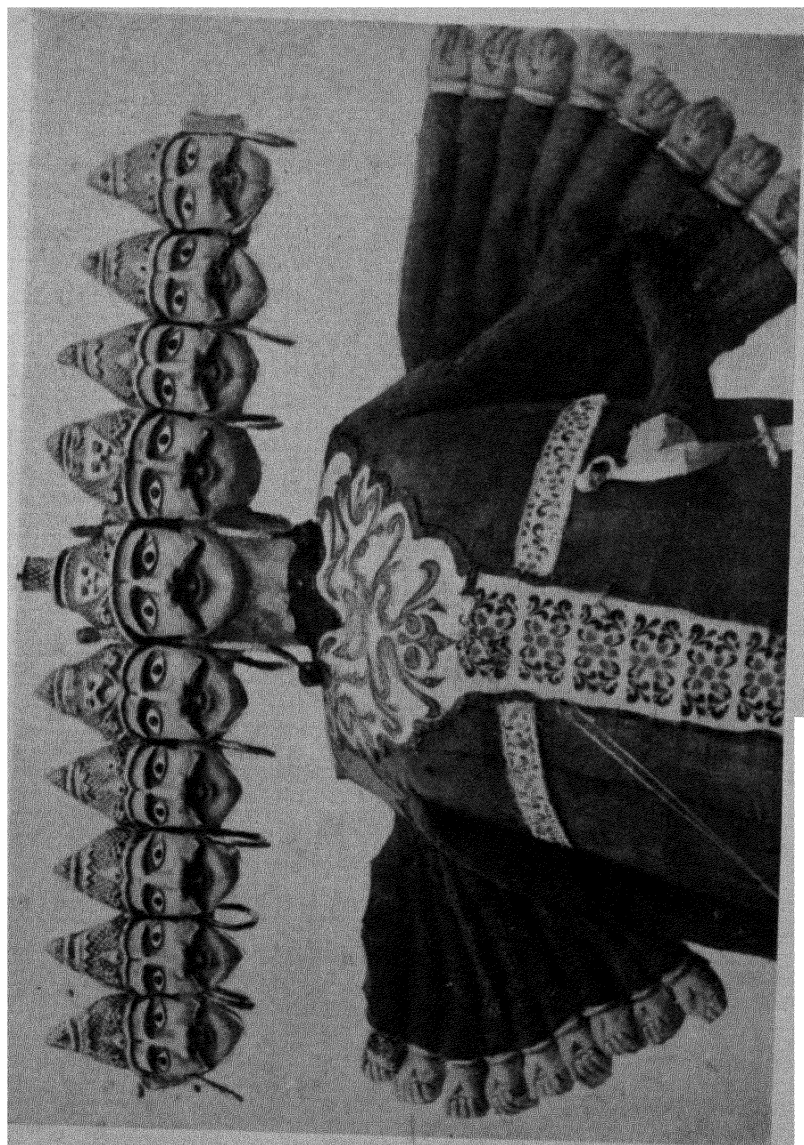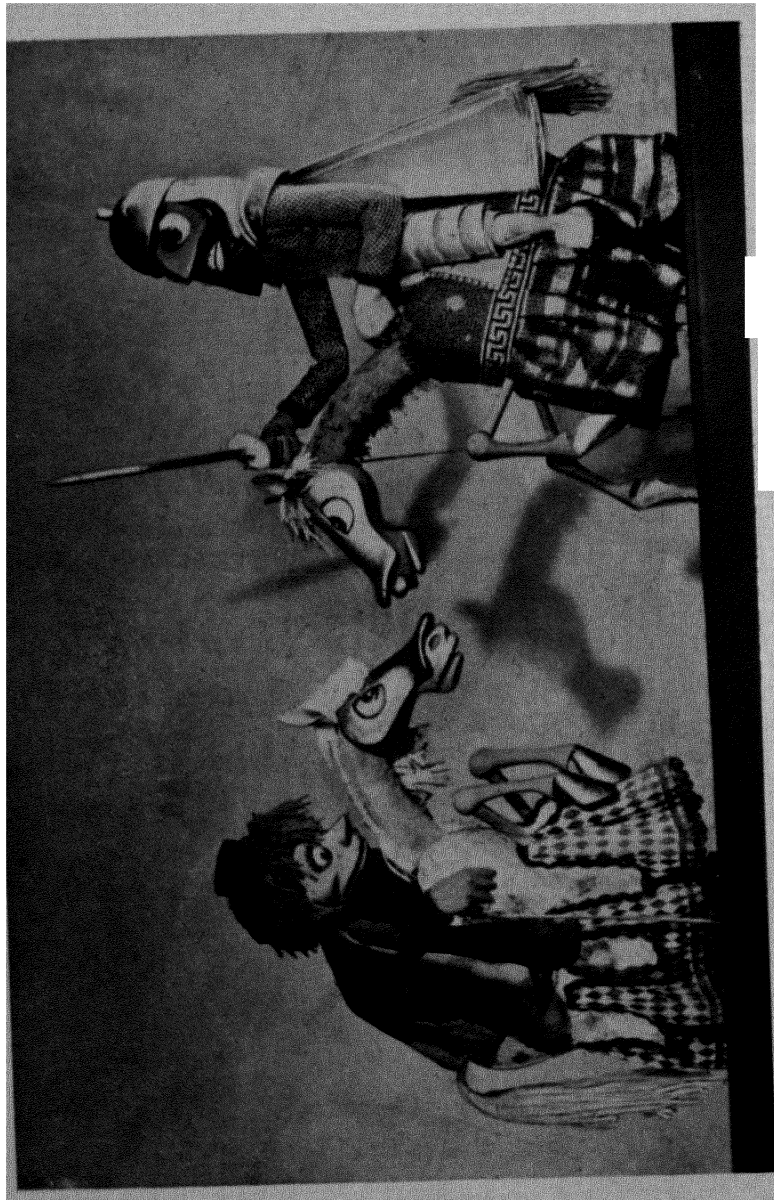
জার্মানীর একটি বিশিষ্ট পুতুল-নাচ
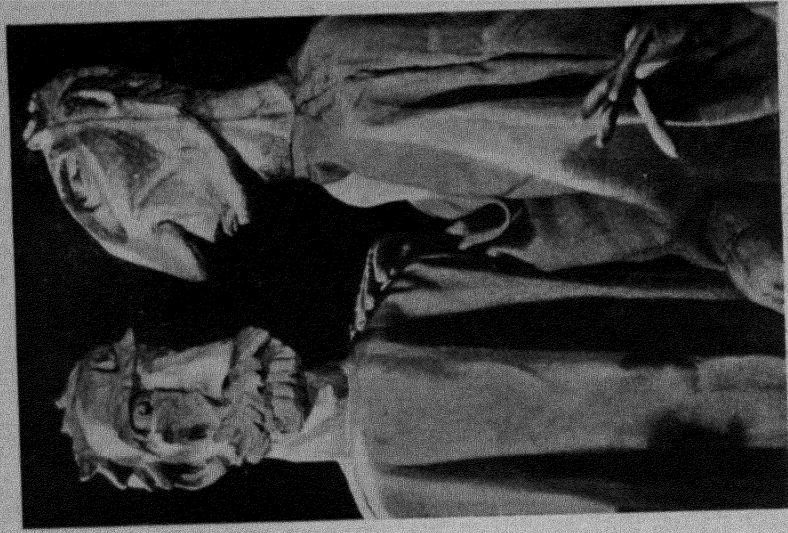
নেদারল্যাণ্ডের দুইটি বিশিষ্ট পুতুল-নাচ

নর-নারী শান্তিপুরে যেতেন। এমন কি সুদূর ত্রিপুরা ও মণিপুর থেকেও বহু যাত্রীর সমাগম হত। রাস-উৎসবের শেষ দিন গোস্বামীদের গৃহস্থিত বিগ্রহ চতুর্দোলার ওপর স্থাপন করে একসঙ্গে শোভাযাত্রা সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করানো হত—এরই নাম 'ভাঙা রাস'। এই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ এবং বসা-সঙ অর্থাৎ পুতুলও থাকত।

শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, চব্বিশ পরগনার টাকি শহরেও বিখ্যাত মুন্‌শীবাবুদের রাস-উৎসব উপলক্ষে মেলা বসত ও পুতুল সাজানো হত। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা প্রমাণ মাপের এইসব নয়নলোভন পুতুল তৈরি করেছিলেন। নিখুঁত শিল্পকর্ম হিসেবে এগুলি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। সমগ্র রাসলীলাও এইভাবে সুসজ্জিত পুতুলের মাধ্যমে প্রদর্শিত হত।

চব্বিশ পরগনার নৈহাটি কাঁঠালপাড়া-নিবাসী পণ্ডিত রামনরেন্দ্র জ্যোতিষ-শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনেছিলাম, নৈহাটি ও কাকিনাড়ার মাঝামাঝি এক মাঠে অর্থাৎ মুক্তপুর খাল ধারে প্রতি বছর রাসযাত্রার সময় নানারকম মাটির পুতুল সাজানো হয়ে থাকে। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে এইসব পুতুল তৈরি করা হয়। এই উপলক্ষে মেলা বসে ও স্থায়ী হয় প্রায় এক মাস।

পণ্ডিত মহাশয় এ-কথাও বলেছিলেন, প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে নৈহাটি থেকে সঙ বের হত এবং বেশ বড় মেলা বসত। সেই মেলায় 'গোলক ধাঁ-ধাঁ' নামক একটি দর্শনীয় জিনিস তৈরি করা হত। উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি মহাকালী মূর্তির সেবায়েত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বাদশ গোপালের এক গোপালের বিগ্রহ-মূর্তি (বিরহী গ্রামের) এক সপ্তাহের জন্য রাসের সময় নৈহাটিতে গঙ্গার ধারে আনা হত। যেখানে বিগ্রহের পূজা হত, সেই স্থানটি ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পত্তি। নদীয়ার রাজবাড়ির তত্ত্বাবধানে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা হত। পরে ওই জায়গায় চটকল স্থাপিত হয়। এর পর এই রাসের মেলা বন্ধ হয়ে যায় এবং মুক্তপুর খালধারে নতুন করে রাসের মেলা বসে।

প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে নৈহাটিতে যে সঙ ও বসা-সঙের মেলা বসত তার নির্দিষ্ট সময় ছিল মাঘ মাসে। মহাকালীপূজা উপলক্ষেও সঙ সাজানো হত।

ইতিপূর্বে ঢাকার মিছিল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এই মিছিলের অন্যতম আকর্ষণ ছিল উঁচু চৌকি। বাঁশ, কাগজ ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে তিন-

তলা বাড়ির মতো উঁচু চৌকি তৈরি হত। আর সেইসব চৌকি সাজানো হত নানারকম পুতুল দিয়ে। চৌকিগুলি থেকে নানা কৌশলে পৌরাণিক, সামাজিক ও সাময়িক ঘটনাবলীর অভিনয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে নানারকম দৃশ্য-পরিবর্তন দেখানো হত। জন্মাষ্টমীর চৌকি প্রসঙ্গে শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়[৫] মহাশয়ের গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে : "ইহার বিভিন্ন অংশগুলি খণ্ডিতাকারে সহরের নানা স্থানে বিভিন্ন কারিকরগণ দ্বারা নির্মিত হইলেও মিসিলের প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে একত্র করা হয় ; এবং সংযোজিত করা হইলে, উহা যে পৃথক পৃথক ব্যক্তিগণ দ্বারা নির্মিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না।"

শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়[৬] আরও উল্লেখ করেছেন : "ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী আনন্দ হরিকেই ইহার প্রকৃত প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর চৌকীগুলির মধ্যে 'বেলুন', 'ভগবানের বিশ্বরূপ প্রদর্শন', 'উর্বশীর শাপ বিমোচন' প্রভৃতি চৌকী শিল্পচাতুর্য্যে শীর্ষস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।"

এককালে ঢাকা শহরে ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, ইত্যাদি পূজা-পার্বণে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল বসা-সঙ বা পুতুল দিয়ে সাজানো হত।

ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা মহাশয়ের কাছে শুনেছি, বেনারস, এলাহাবাদ, মির্জাপুর, লখনউ প্রভৃতি শহরে দুর্গাপূজার সময় রামলীলার চৌকি বসে। সেই-সব চৌকিতে নানারকম পুতুল সাজানো হয়। কোন-কোন স্থানে গোরুর গাড়ি অথবা লোকের মাথার উপর পুতুল বসিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় বাদ্যযন্ত্র সহ শোভাযাত্রা বের করা হয়।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের[৭] গ্রন্থ থেকে জাপানের শিশুদের পুতুল-উৎসবের কথাও আমরা জানতে পারি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন : "তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিন, বা ৩রা মার্চ্চ 'ওহিনামাৎসুরি' নামক ছোট ছোট মেয়েদের পার্ব্বণ। এদিন ছোট মেয়েরাই 'কর্ত্রী' ; তারা তাদের ছোট ছোট বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে ও স্বহস্তে ছোট ছোট বাটি, থালী প্রভৃতিতে খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত করে নিমন্ত্রিতকে খাওয়ায়। 'ষিরোসাকে', একপ্রকার শ্বেত মিষ্টি মদ সকলকে দেওয়া হয়। একটি ঘরে উৎসবের দেবতা 'ওহিনাসান' ও তাঁর চতুর্দ্দিকে পুতুল সজ্জিত করে রাখা হয়।"

৫ শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২২৫

৬ পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২২৫

৭ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জাপান, (১৩১৭), পৃষ্ঠা ১২৮

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[৮] লিখেছেন, "যবদ্বীপের সংস্কৃতির উদ্যানে একটি সুন্দর পুষ্প হ'চ্ছে Wajang Keolit 'ওআইয়াঙ্ কুলিৎ' বা পুতুলের ছায়া-নাটক। সংক্ষেপে জিনিসটী এই: নাটকের পাত্র-পাত্রীদের চামড়ায়-কাটা মূর্তি বা ছবি নিয়ে প্রদর্শক একটি সাদা পরদার সাম্‌নে বসেন; প্রদর্শকের সাম্‌নে, মাথার উপরে, একটা আলো থাকে, এই আলোর রশ্মি পরদার সাম্‌নে ধরা পুতুলের উপরে প'ড়ে সাদা পরদার উপরে কালো ছায়ার সৃষ্টি করে, পরদার ও-ধারেও এই ছায়া দেখা যায়। পুতুলগুলির হাত নাড়াতে পারা যায়। আর প্রদর্শক মুখে-মুখে ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠ করেন, বা পাত্র-পাত্রীদের কথা অভিনয়ের ধরনে নিজেই ব'লে যান।"

আচার্য সুনীতিকুমার[৯] আরও বলেছেন, "এ জিনিস ভারত থেকেই যবদ্বীপে গিয়েছিল ব'লে অনুমান হয়। সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে, ভারতের আদি নাটক হ'ত পুতুল-নাচ আর ছায়া-নাট্যকে অবলম্বন ক'রে। পুতুল-নাচের সঙ্গে মানুষের দ্বারা অভিনীত নাটকের একটা যোগ যে ছিল, তা সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধার' শব্দই যেন ইঙ্গিত ক'র্‌ছে—'সূত্রধার' অর্থে, যে পুতুল নাচাবার সুতো বা দড়ি ধরে থাকে, তার পরে অর্থ দাঁড়াল'—যে নিজেই অভিনয় করে।"

সূত্রধার প্রসঙ্গে ডক্টর মনোমোহন ঘোষ[১০] মহাশয় লিখেছেন, "নাট্যগৃহের পরেই আলোচ্য সূত্রধার ও তাঁহার সহকর্মী নটনটীগণ। এঁদের মধ্যে পদ-মর্যাদার ও যোগ্যতার দিক দিয়ে সূত্রধারের স্থান ছিল সবার চেয়ে উঁচুতে। আধুনিক কালে Stage-Manager বা 'মঞ্চাধ্যক্ষ' বলতে যাঁকে বোঝায় এঁর গুরুত্ব ছিল তার চেয়ে বেশি। নৃত্য, গীত ও অভিনয়কলার একত্র সন্নিবেশের হেতু ভারতীয় নাট্যচর্চার মধ্যে যে জটিলতা ছিল তাকে সামলাবার মতো অসাধারণ গুণগ্রাম থাকার দরকার ছিল সূত্রধারের।"

পুতুল-নাচ প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমাদের বাংলাদেশের চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও মালদহ জেলায় এবং রাজস্থানের উদয়পুর, জয়পুর প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে পুতুল-নাচের প্রচলন সবচেয়ে বেশি।

৮ শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্বীপময় ভারত, (১৩৪৭), পৃষ্ঠা ৩৩১

৯ পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৩২

১০ শ্রী মনোমোহন ঘোষ, প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা, (১৩৫২), পৃষ্ঠা ২৮

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আধুনিক থিয়েটারের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকেও পুতুল-নাচের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। যেমন—আধুনিক আলোক-ব্যবস্থা, মাইক লাউডস্পীকার, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির সূক্ষ্ম কলা-কৌশল পুতুল-নাচের ক্ষেত্রেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

পুতুল-নাচ বর্তমানে ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানী, বৃটেন, নেদারল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাভা, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষের জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। এককালে মিশরে কাঠ ও পোড়ামাটির পুতুল তৈরি হত। রোমানদের কালে কাঠ ও মোম পুতুল তৈরির উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং অনেকের ধারণা রোমান 'পুপা' শব্দ থেকে 'পাপেট' শব্দের উৎপত্তি।

পুতুল-নাচ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[১১] মহাশয় আরও বলেছেন, "আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতে নাটকের উদ্ভব পুতুল-নাচের সঙ্গে কিছু পরিমাণে জড়িত থাকা সম্ভব, কিন্তু যবদ্বীপীয় ওআইয়াঙ-এর মত পুতুলের ছায়া দ্বারা অভিনয়—প্রাচীন ব্যাপার নয়, অর্বাচীন যুগেরই ব্যাপার; খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এর উদ্ভব হয়, তারপর ভারত থেকে ইন্দোচীনে (শ্যামে আর কম্বোজে) যায়, যবদ্বীপে যায়, ওদিকে আরবদের দেশ ইরাক আর মিসরেও যায়, আর তুর্কীরাও এই জিনিস পরে নেয়; যবদ্বীপীযদের ওআইয়াঙ্-এর মত শ্যামদেশেও ছায়াভিনয়ের জন্য চামড়ায়-কাটা ছবি ব্যবহারের রেওয়াজ আছে; আর ইরাক মিসর আর তুর্ক-দেশেও খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতকের চামড়ায়-কাটা মূর্তি আর অন্য চিত্র পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষে বোধ হয় এ জিনিসটী ততটা লোকপ্রিয় হ'তে পারে নি।"

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[১২] বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা-কালে পুতুলের কথায় লিখেছেন, "বাঙ্গালা দেশে যে সংস্কৃতি গত এক হাজার বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, যে যে বস্তু বা অনুষ্ঠান বা মনোভাব অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নীচে তাহার একটা দিগ্‌দর্শন বা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতেছে।—" অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন,

১১ শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্বীপময় ভারত (১৩৫৭), পৃষ্ঠা ৩৩২

১২ শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ১৩৫৫ সাল, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০

"চিত্রবিদ্যা—পুঁথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় লুপ্ত), এবং অন্য প্রকারের খাঁটি বাঙ্গালী চিত্রপদ্ধতি, যথা—পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, পূর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, শরার ছবি আঁকা—ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্ত ; মাটির ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চাল-চিত্র আঁকা, মাটির সঙের পুতুলে পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র—ইহাই আমাদের বার্ষিক পূজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে , রঙ্গীন মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল—গ্রাম-শিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প—জাপানী সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আজ প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।"

শ্রী অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১৩] মহাশয় চব্বিশ পরগনার বাজারবেড়িয়ার নাচপুতুলের কথাপ্রসঙ্গে ওখানকার এক পুতুল-শিল্পী কিশোরী কর্মকার সম্পর্কে বলেছেন : "কিশোরীর আদি পুরুষেরা ঠিক কি ধরণের কাজ করতেন সেকথা আজ আর কেউ সঠিক বলতে পারে না। তবে গত দু'তিন পুরুষ ধরে এ পরিবার প্রধানত কাঠ-খোদাই শিল্পী। রথের কাঠামো ও বিবিধ মূর্তি, দেব-দেবীর কাঠের বিগ্রহ, বৃষকাষ্ঠ ও পুতুলনাচের কাঠের পুতুল বানানোই তাদের পৈতৃক পেশা।"

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়[১৪] মহাশয় আরও বলেছেন : "……এই এলাকার কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামে যে নানারকম কুটিরশিল্পীর বসবাস দেখা যায় সে এক আশ্চর্য ঘটনা। চৈতন্যপুরে কয়েক ঘর মৃৎশিল্পীও আছেন, তাঁরা মাটির খেলনা-পুতুল ও প্রতিমা নির্মাণ করেন। পটের কাজেও তাঁদের দক্ষতা আছে শুনেছি। বাজারবেড়িয়ার এক মাইল দক্ষিণে, মহেশপুরে, শোলা-শিল্পী পরিবারের সংখ্যা চল্লিশের কম নয়। দেড় মাইল উত্তরের সরদনায় তের-চৌদ্দ ঘর মুসলমান পটুয়ার বাস। আর দু'মাইল দক্ষিণ-পুবে গোপালনগর তো কুম্ভকার ও মৃৎশিল্পীদের জন্য বিখ্যাত।"

নাচপুতুল প্রসঙ্গে শ্রী অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১৫] মহাশয় উল্লেখ করেছেন : "২৪ পরগনার এ অঞ্চলে দক্ষ পুতুল নাচিয়ে হিসেবে বেশ খ্যাতি আছে কিশোরীর। কোন কোন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা প্রতি বছরই তার দলকে ডাকেন। জয়নগর মজিলপুরের কার্তিক মাসের রাসমেলা, সেখান থেকে

১৩ শ্রী অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখা হয় নাই (২৬), দেশ, ৯ পৌষ ১৩৭৮, পৃষ্ঠা ৭৭৯

১৪ পূর্বে উল্লিখিত রচনা, দেশ, ৯ পৌষ ১৩৭৮, পৃষ্ঠা ৭৭৯

১৫ পূর্বে উল্লিখিত রচনা, দেশ, ৯ পৌষ ১৩৭৮, পৃষ্ঠা ৭৮০

দু'মাইল পুবে তুলসীঘাটার মণ্ডলদের বৈশাখ মাসের গোষ্ঠমেলা, দেড় মাইল উত্তরের বহড়ুর বসুদের রাসমেলা, বজবজের ঘোষ-পরিবারের দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে কিশোরীর উপস্থিতি নিয়মিত। কলকাতায় অনুষ্ঠিত গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্মেলন থেকেও সে মাঝে মধ্যে আমন্ত্রিত হয়েছে। এ ছাড়া বায়না পেলে অন্যত্রও যায়।

"তার এত সমাদর কিন্তু প্রধানত প্রাচীন পন্থীদের কাছে, যাঁরা গ্রাম-বাংলার এই শিল্পনাট্যটিকে সনাতন রূপেই দেখতে চান। আধুনিক 'পাপেট্-শো'-র সঙ্গে তার তুলনা করতে যাওয়াটাই ভুল। প্রথমত, দু'ফুট-আড়াই-ফুট উচ্চতার কাঠের পুতুলগুলির কোমরের নীচের অংশ খোদাই করা হয় না বলে তাদের পা থাকে না; পা ফেলে হেঁটে চলে বেড়ানও তাদের দিয়ে দেখানো যায় না। কেবলমাত্র গলা, কোমর, কাঁধ ও কনুইএর কাছে জোড় থাকে বলে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনই শুধু দেখানো যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁ হাতের কনুই-এ কব্জা লাগানো হয় না; সেজন্য ডান হাতটি শুধু ঘোরাফেরা করতে পারে। 'পাপেট্-শো'-র পুতুলের মতো চোখের পাতা ফেলতে পারে না, মুখ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে না, সাজপোশাকও অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই আধুনিক প্রতিযোগীর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কিশোরীর শিল্পসৃষ্টির চটক কম, বাহার অল্প। তবু পল্লীগ্রামের দর্শকদের কছে তা মনোহারী এজন্য যে নাচের পালাগুলি কালজয়ী রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে আহৃত। গ্রামীণ জনতার কাছে এসব কাহিনীর আকর্ষণ এখনও যে কত গভীর তা শহুরে ফুলবাবু ছাড়া আর সকলেই জানেন। পুতুলগুলির অঙ্গভঙ্গি অপেক্ষাকৃত সীমিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে পালাগান চলতে থাকে বলে দর্শকদের রসগ্রহণে বিশেষ বাধা হয় না।"

সেকালে বহু ধনী পুতুলের বিয়েতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন বলে গল্প শোনা যায়। শুধু শিশুরাই যে পুতুল ভালোবাসে তা নয়, প্রাপ্তবয়স্করাও পুতুল ভালোবাসেন এবং এমন অনেকে আছেন যাঁরা দেশ-বিদেশের রকমারি পুতুল সংগ্রহ করে যত্নের সঙ্গে বাড়ির আলমারিতে সাজিয়ে রাখেন।

পুতুল শিশুদের কান্না থামায়, অপর পক্ষে রাজনৈতিক নেতাদের কাঁদিয়ে ছাড়ে। যখন কোন রাজনৈতিক নেতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিতে দেখেন যে তাঁর বিরোধী দল বা মতবাদের লোকেরা তাঁরই কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে, সেই সময় উক্ত চিত্রটি নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আনন্দদায়ক হয় না। কুশপুত্তলিকা দাহ করা শুধু আমাদের দেশেই যে হয় এমন নয়, সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা

দেখতে পাই যে পৃথিবীর বহু বড়-বড় শহরেও কুশপুত্তলিকা দাহ করার রেওয়াজ আছে।

খড়্গপুরে বিজয়াদশমীর দিনে বাঁশ, খড় ও কাগজ দিয়ে রাবণের বিপুলায়তন মূর্তি তৈরি করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দাহ করা হয়। রাবণের মূর্তি তৈরি করে দাহ করার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়।

ফ্যানি পার্কস (Fanny Parkes) নাম্নী জনৈক ইংরেজ মহিলা ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি কানপুরের 'রামলীলা' অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"We drove to the Parade-ground, to view the celebration of the Ram Leela festival Ram, the warrior God, is particularly revered by the sipahīs An annual tamāshā is held in his honour, and that of Seeta, his consort. A figure of Ravan the giant, as large as a windmill, was erected on the Parade-ground : the interior of the mouster was filled with fire-works, this giant was destroyed by Ram. All sorts of games are played by the sipahīs, on the Parade"

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কলকাতার লর্ড বিশপ রেজিনাল্ড হেবার[১৭] 'মাণ্ডিসরাই' নামক স্থানে রামলীলার অভিনয় দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"We rode on in silence about seven miles, when, in passing a village, we were roused by the lights, tinsel, flowers, mummery, horns, gongs, and shouts of Seeta, Ram, Luchmun, and their followers, in the concluding feast after the destruction of the paper-giant Ravana"

পুতুল নিয়ে বাংলা ভাষায় বহু গানও রচিত হয়েছে। অনেক সাধকের গানের মর্মকথা হল : মানুষ এক অজানা শক্তির পুতুল মাত্র। অসংখ্য

১৬ Fanny Parkes, *Wanderings of a Pilgrim, in search of the Picturesque, during four-and-twenty years in the East ; with Revelations of Life in the Zenāna*, vol. I, (1850), page 108.

১৭ Right Rev. Reginald Heber, *Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India*, second edition, vol. II, page 23.

শ্যামা-সংগীতেও পুতুলের সঙ্গে মানুষের তুলনা করা হয়েছে: যেমন—'শ্যামা মায়ের পুতুল মোরা, মা যেমনি নাচায় তেমনি নাচি।' কিংবা 'কোথায় বসে কে টানছে দড়ি, মোরা শুধু নেচে মরি।'

অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বাংলা ভাষায়, অসার বা অস্থায়ী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পুতুলের তুলনা দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন—'ও হলো মোমের পুতুল', 'নুনের পুতুল' অর্থাৎ গলে যাবে; 'ননীর পুতুল', 'স্নেহের পুত্তলি' অর্থাৎ আদরের বাছা, আদরের ডাক; 'পুতুল খেলা' অর্থাৎ প্রাণ-সম্পর্কশূন্য অলীক খেলা।

৭ ॥ মুখোশ

প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের লোক-সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হল মেলা, আর ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে মেলার সব চেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস হল অদ্ভুত আকৃতির মুখোশ। মেলা থেকে নাক-উঁচু রাক্ষস-রাক্ষসীর মুখোশ কিনে ছোটরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাড়ি ফিরছে—এ তো আমরা হামেশাই দেখে থাকি। আজও কলকাতা ও অন্যত্র বিভিন্ন পূজা-পার্বণে যে-সব মেলা বসে তাতে নানারকমের কারুকার্যময় মুখোশের আমদানি হয় এবং তার চাহিদা এতটুকুও হ্রাস পায়নি।

কখনও আনন্দ, কোথাও বিস্ময়, কখনও বা আবার বিভীষিকা ও আতঙ্ক—এইসব রস ফুটিয়ে তোলাই মুখোশ ধারণের উদ্দেশ্য। মুখোশ মূলতঃ মুখের আচ্ছাদন এবং এর উদ্দেশ্য হল ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মপরিচয় গোপন করা। নাট্যমঞ্চের অভিনেতারা যেমন অভিনয়কালে মুখে নানা রং ইত্যাদি ব্যবহার করে অভিনীত চরিত্রের মুখাকৃতির সাদৃশ্য ও ব্যঞ্জনা প্রকট করেন, মুখোশ ব্যবহারেও অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধিত হয়; এবং প্রধানত এই অর্থেই মুখোশ ছদ্মবেশ। স্বাভাবিক মুখাকৃতি দেখে দর্শকের মনে যখন ত্রাসের সঞ্চার হয় না, তখন বিকৃত ও বীভৎস আকৃতির আবরণ মুখের উপর এঁটে ভীতি-সঞ্চারের প্রয়াস অভীষ্ট-সাধনে বিশেষ কার্যকর হয়। বস্তুতঃ মুখোশের প্রধান উদ্দেশ্য হল দর্শকের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চারে এক অদ্ভুত মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা।

প্রাচীন কালে গ্রীস ও রোমে অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করতেন। সেইসব মুখোশের মুখাংশ ধাতুময় থাকায় কণ্ঠস্বর-নিক্ষেপ দূরবিস্তৃতি লাভ করত। এককালে মুখের আকৃতিতে অস্বাভাবিকতা এনে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অন্যতম কৌশল বলে পরিগণিত হত। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ধর্ম ও লোককাহিনীপ্রধান নাটকগুলিতে দাড়ি-গোঁফ-বিশিষ্ট অদ্ভুত ধরনের মুখোশ পরে অভিনেতারা অভিনয় করতেন এবং এই অভিনয় দেখবার জন্য বহু লোকের সমাবেশ ঘটতো।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মুখোশ-নৃত্য একসময় যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। সিংভূমের মুখোশ-নৃত্য প্রসঙ্গে আলোচনায় হরেন ঘোষ[১] মহাশয় লিখেছেন :

"The dancers always cover their faces with masks beautifully made and in strict accordance with their character portrayals This is also a significant difference between the Kathakali of South India and the Chau (Masked) Dances of Seraikella as they are popularly called. Masks are used there to conceal the identity of the performers—a characteristic device to prevent deterioration of the dance-art under foreign influence."

বাংলাদেশের বহুরূপীরা নানারকম সাজের জন্য মুখোশ ব্যবহার করতেন। তা ছাড়া মালদহ জেলায় গম্ভীরা-উৎসবেও নানারকম মুখোশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডক্টর ভেরিয়ার এলুইন[২] লিখিত একটি গ্রন্থ থেকে আদিবাসীদের মুখোশ ব্যবহার সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। তিনি লিখেছেন :

"It is not easy to discover masks in tribal India, for they are normally only brought out on ceremonial occasions and for some reason the aboriginals are rather shy about them and not very willing to show them to the inquirer. But I think it is safe to say that they can be found among the Gonds, Pardhans and Baigas of the central Provinces, that they are decidedly rare in orissa except among the Konds and Bhuiyas and that they are fairly common among the Murias—the constant excitements of dormitory life stimulating the young men to decorate themselves whenever possible. All the masks I have found are of wood or made from gourds ; they quickly deteriorate—which adds to their scarcity ; the wood is attacked by white ants, the colours fade, the hair and teeth fall out.

Most, perhaps all, of the Muria masks are made for ceremonial dancing expeditions when the youths of a village visit their neighbours."

১ Haren Ghosh, The 'Chau' (Masked) Dancers of Seraikella, *The Four Arts Annual*, 1936-37 (Calcutta), page 51

২ Verrier Elwin, *The Tribal Art of Middle India*, (1951), page 188

পাঞ্জাবের কুলু উপত্যকার অধিবাসীরা দশেরা উৎসবে কারুকার্যময় নানারকম মুখোশ ব্যবহার করেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'কথাকলি' নৃত্যে শকুনি, রাবণ প্রভৃতি রূপসজ্জার জন্য বিভিন্ন ধরনের মুখোশ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় অভিনেতাদের মুখ রাঙানো হয় খনিজ রং দিয়ে এবং তাদের মুখের ডোল চাউলের গুঁড়া ও নানারকম রং মোটা করে লাগিয়ে তা থেকে ছাঁচ তুলে নিয়ে মুখোশে পরিণত করা হয়।

শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য[৩] মহাশয় তাঁর একটি গ্রন্থে পণ্ডিচেরীর মুখোশ-নৃত্যের উল্লেখ করে বলেছেন যে, "একটি কিশোর ও একটি কিশোরী মুখোশ লাগাইয়া নৃত্য করিতেছিল—মনে হইল সন্নিহিত গ্রামে কোন পূজাপার্বণের উৎসবের ব্যাপার।"

বাংলাদেশে কোন-কোন অঞ্চলে এখনও মুখোশ-নৃত্যের প্রচলন আছে। মালদহের 'গম্ভীরা' উৎসবে মুখোশ-নৃত্য উৎসবের প্রধান অঙ্গ-বিশেষ। পুরুলিয়ার 'ছৌ' নাচেও অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করেন।

'ছৌ' শব্দটিকে ডক্টর সুধীর করণ[৪] বলেছেন 'ছো'। ডক্টর করণের রচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল: "ময়ূরভঞ্জে প্রচলিত ওড়িয়া ভাষায় এবং পশ্চিম সীমান্ত বাংলার গোপীবল্লভপুর এবং সিংভূমের ধলভূম অঞ্চলের কোন কোন অংশে 'ছো' শব্দটির মৌলিক অর্থ—সঙ। গাজনের সঙ।

"ছো শব্দটি ওড়িয়া 'ছু-অ' (ছলনা) শব্দেরই সংকুচিত রূপ। 'ছু-অ' শব্দটির ময়ূরভঞ্জী উচ্চারণ কিন্তু ছো বা ছও, সীমান্ত বাংলার কোন কোন অঞ্চলেও তাই। সঙ সাজা, ঢং দেখানো প্রভৃতিও এই শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। গাজনের সঙ কিংবা সঙ-নাচ বললে যা বোঝায়, ছো-নাচ বললেও তাই বোঝায়। মূলত এই নাচ ছিল হর-পার্বতীর বিবাহ উৎসবকে অনুকরণ করে, মহাদেব-পার্বতী-ভূত-প্রেত নন্দী-ভৃঙ্গী বেশধারীদের সঙ-এর নাচ। মড়ার মাথার খুলি, ভাগাড় থেকে তুলে আনা গোমুণ্ড প্রভৃতি নিয়ে বিলোচনের বিবাহ-উৎসবের এই ছো-নাচ, শৈশবে আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি।

"গাজনের এই 'ছো' বা সঙ-ই আসলে ছো-নাচের ভিত্তিভূমি। এই নাচকে গাজনের অনিবার্য উৎসবাঙ্গ রূপে গণ্য করা হত। সঙ সাজার জন্য মুখোশেরও

৩ চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, দক্ষিণ ভারতে, (১৩৬০), পৃষ্ঠা ১০

৪ সুধীর করণ, 'ছো' একটি গ্রামীণ নৃত্যকলা, দেশ, ১৩ কার্তিক ১৩৭৮, পৃষ্ঠা ১২৪৬

প্রয়োজন হত। ছো-নাচ কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিছক সঙ-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।"

'ছৌ' প্রসঙ্গে শ্রী অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৫] মহাশয় লিখেছেন: "পুরুলিয়া জেলায় ছো নাচের প্রচলন খুবই ব্যাপক। অনেকের ধারণা, সেখানে কম পক্ষে আড়াই শ' ছো নাচের দল আছে। এ খবর সত্য হ'লে, গড়ে তিন-চারটি গ্রাম পিছু এক-একটি দল থাকবার কথা। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন আদমশুমার না হয়ে থাকলেও ছো নাচের জনপ্রিয়তার কাছাকাছি আসতে পারে এমন কোন নাচ যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র নেই সেকথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। পত্র-পত্রিকায় এ নাচ সম্বন্ধে নিতান্ত কম লেখা হয়নি। সঙ্গীত নাটক একাডেমীর আমন্ত্রণে দিল্লীতে ও কলকাতার কোন কোন প্রেক্ষাগৃহে এ নাচ একাধিকবার দেখানো হয়েছে বলে পুরুলিয়া জেলার বাইরেও অনেকে এ নাচের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু যে অপরূপ মুখোশগুলি এ নাচের প্রাণ, তাদের সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। পুরুলিয়ার মাত্র দুটি গ্রামের কারিগরেরা এই সুকুমার শিল্পটির চর্চা করেন বলে তার অভিনবত্ব আরও বেশী। বাঘমুণ্ডি থানার চড়িদা ও জয়পুর থানায় ডুমুরডিহি গ্রাম দু'টির মধ্যে প্রথমটির গুরুত্বই সমধিক, কেন না সেখানে শিল্পীর সংখ্যা তিরিশ-চল্লিশ ঘর, আর ডুমুরডিহিতে মাত্র চার-পাঁচ ঘর। তা ছাড়া ডুমুরডিহির প্রধান কারিগর, মধু রায়, গোকুল রায় প্রভৃতিদেরও পৈতৃক নিবাস চড়িদায়, বর্তমান পুরুষেই তাঁরা উঠে এসে ডুমুরডিহিতে বসতি করেছেন। পেশা ও জ্ঞাতিগত এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য এ দুই কেন্দ্রের শিল্পীদের মধ্যে কারিগরি-পদ্ধতিতে কোনই পার্থক্য নেই।"

পূর্ববঙ্গের ঢাকা এবং ময়মনসিংহের বহু জায়গায় কালী-মুখোশ পরে নাচ-গান করার রেওয়াজ ছিল। উত্তর বাংলায় অনেক শহরে এবং গ্রামে এখনও কালী-নাচের প্রচলন আছে। এই নাচের সঙ্গে ঢাক ও কাঁসি বাজানো হয়।

সিংহলের মুখোশ-নৃত্য সর্বজনবিদিত এবং এর মধ্যে শয়তান-নৃত্যের (ডেভিল ডান্স) যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। সিংহলের লোকনৃত্যে অভিনেতারা শয়তান, রাক্ষস, জন্তু জানোয়ারের মুখোশ ব্যবহার করেন।

৫ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখা হয় নাই (২৭), চড়িদা, দেশ, ১৩ পৌষ ১৩৭৮, পৃষ্ঠা ৮৮৪

ব্রহ্মদেশেও মুখোশ-নৃত্যের প্রচলন আছে। জাপানের লোক-সংস্কৃতিতে মুখোশ-নৃত্য যে একটি অপরিহার্য অঙ্গ তার উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। আফ্রিকাতেও মুখোশ ব্যবহারের প্রচলন আছে। এক সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব-আফ্রিকার টাঙ্গানাইকার আদিম জাতির কাঠের তৈরি যুদ্ধের মুখোশ দার-এস-সালাম শহরে 'কিং জর্জ দি ফিফ্‌থ মেমোরিয়াল মিউজিয়াম'এ রক্ষিত আছে।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বড়দিনে Santa claus (যে কল্পিত ব্যক্তি রাত্রিকালে এসে মোজার ভিতর খেলনা, পুতুল প্রভৃতি শিশুদের জন্য বড়দিনের উপহার রেখে যান সাজবার প্রচলন আছে, তাতেও বৃদ্ধের তুষার-ধবল চুল-দাড়ি ও গোঁফ সহ মুখোশের ব্যবহার দেখা যায়।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[৬] তাঁর একটি ভ্রমণকাহিনীতে বলিদ্বীপে মুখোশ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন: "মুখস প'রে এই নাটকের অভিনয় হয়, এই মুখস-পরা অভিনয়ের নাম Topeng 'তোপেঙ'।"

মুখোশ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[৭] আরও বলেছেন, "এখনও পশ্চিমের রামলীলায় রাক্ষস আর বানরদের মুখে এই রকম মুখস পরবার, আর রাম সীতা লক্ষণের মুখে বর্ণচূর্ণ মাখিয়ে' সাজিয়ে' দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। আসাম-অঞ্চলে মুখস প'রে অভিনয় এখনও হ'য়ে থাকে,—ধর্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবে, বৈষ্ণব সত্রগুলিতে। আসামী ভাষায় মুখসকে 'ছোঁ', আর মুখস প'রে নাট্যাভিনয়কে 'ভাওনা' বলে, বাঁশের চাঁচাড়ীর কাঠামের উপর এই-সব মুখস চিত্রিত হয়। আবার ওদিকে ছোটো-নাগপুরে সেরাইকেলা রাজ্যেও মুখস-পরা নাচের রেওয়াজ আছে, তাকে 'ছৌ' নাচ বলে। তারপর, সুদূর কেরল-দেশে মালাবারেও মুখস প'রে বা মুখের উপর-ই রঙ্‌-চঙ লাগিয়ে' মুখস এঁকে, 'কথা-কলি' ব'লে এক রকম নাটকের অভিনয় প্রচলিত আছে; মুখস প'রে বা মুখসের পরিবর্তে মুখে রঙ মেখে নাচও কেরলের সংস্কৃতির একটী বিশিষ্ট বস্তু। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের মুখসগুলি কাঠের তৈরী হয়; হালকা শক্ত, কাঠে কুঁদে তৈরী, তাতে নানান্ রকম রঙ্‌-চঙ করা থাকে, চোখ দুটোতে ছেঁদা থাকে তাই দিয়ে অভিনেতা দেখতে পায়, আর মুখসের ভিতর দিকে একটা ক'রে চামড়ার জীভ-মতন থাকে, অভিনেতা সেটা নিজের মুখের ভিতর পুরে মুখসটী ঠিক ক'রে আটকে' রাখে। যবদ্বীপ বলিদ্বীপের এই-সব

৬ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্বীপময় ভারত, (১৩৩৭), পৃষ্ঠা ২৫২

৭ পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৫২

কাঠের মুখস এদের শিল্পের একটা চমৎকার নিদর্শন-বস্তু হ'য়ে আছে। মুখস প'রে অভিনয় জাপানের প্রাচীন 'নো' নাটকেরও একটি অতি বিশিষ্ট ব্যাপার; জিনিসটি চীনে-ও আছে, আর চীনের নাটকে মুখে নানান্ রঙ মেখেও মুখসের কাজ চালায়। এ ছাড়া কম্বোজ আর শ্যাম-দেশেও আছে।"

স্বামী সদানন্দের[৮] একটি গ্রন্থে যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের মুখোশ-নৃত্যের উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, "দেব-দেবী, স্ত্রী ও পুরুষ রাজা ও রাণী, রাক্ষস ও নট-নটীগণের মুখোস এমন হাস্যরসের অবতারণা করে যাহা যথার্থই উপভোগ্য।"

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার[৯] লিখেছেন, "চৈত্র বৈশাখ মাসে বাঙালী গাজন-গম্ভীরার ঢাকে ঘা মারিতে অভ্যস্ত। আর সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় রকমারি মুখোস নাচ। সেই মোখার ধুমই দেখিতেছি হ্বেনিসে। কি পাদোহ্বা, কি জেনোহ্বা, কি নাপোলি,—ইতালির সর্ব্বত্রই হাটে বাজারে পিয়াৎসায় মোখা-পরা নরনারীর রং তামাসা চলিতেছে। কেবল ইতালিতেই কেন? ফ্রান্সে, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে, জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রিয়ায়,—ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ মোখা নাচের তিথি। নানা নামে এই উৎসবকে পশ্চিমীরা বলে 'কার্ণিহ্বাল'।

"হাল্লা, ছুটাছুটি, মিছিল, 'নগর-কীর্ত্তন',—এই সবই কার্ণিহ্বালের অঙ্গ। মুখোস আর ছদ্মবেশ এই উৎসবের প্রধানতম দ্রষ্টব্য বস্তু।"

মুখোশ সম্পর্কিত কিছু বাংলা প্রবাদেরও প্রচলন আছে; যেমন—দুঃখের মুখোশ পরা সংসারের সুখ, মুখোশ পরা ভদ্রলোক, মুখোশ পরা ভদ্র ছদ্মবেশী তস্কর, ভণ্ডের মুখোশ, হোঁদল কুৎকুতের মুখোশ, ইত্যাদি।

টিটাগড়ে দক্ষিণ ভারতীয়দের উৎসব

কলকাতা থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে টিটাগড়। পাট ও কাগজের কলের জন্য এই শিল্পাঞ্চলটি বিখ্যাত।

গত ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের এক রবিবারে টিটাগড়ে 'মাতাম্মীর

৮ স্বামী সদানন্দ, বৃহত্তর ভারতের পূজাপার্বণ, (১৩৪৪), পৃষ্ঠা ২২

৯ বিনয়কুমার সরকার, ইতালিতে বারকয়েক, (১৯৩২), পৃষ্ঠা ৭২

পূজা' উপলক্ষে এক বিরাট উৎসব হয়েছিল। 'মাতাময়ী'—নামান্তরে দক্ষিণ-ভারতীয়দের কাছে কালী ও শীতলা দেবী। এই দিন হাজার-হাজার চট-কল ও কাগজ-কলের শ্রমিক (বেশির ভাগ তেলেগুভাষী) উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন ; সারাদিন পূজা-পাঠ, গান-বাজনা এবং আনন্দের মধ্যে কাটিয়েছিলেন তাঁরা। এক ব্যক্তি কালীর মুখোশ পরে 'মাতাময়ী' সেজেছিলেন এবং মাতাময়ীকে নিয়ে বহুলোক মিছিল করে শ্রমিক-বস্তির সর্বত্র ঘুরেছিলেন। উক্ত মিছিলে বহু নারীকে মাথায় জলপূর্ণ কলসী নিয়ে মুখোশ পরা 'মাতাময়ী'কে অনুসরণ করতে দেখা গিয়েছিল। এই উৎসবে বহু দক্ষিণ ভারতীয়কে নানারকম মুখোস পরে ও সঙ সেজে আনন্দ করতে দেখা গিয়েছিল।

পুরুলিয়া জেলার 'ছৌ' নাচ

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পুরুলিয়া জেলার গ্রামে-গ্রামে শিবপূজার ধুম পড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে চলতে থাকে 'ছৌ' নাচ আর 'ঝুমুর' গান। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী সংবলিত 'ছৌ' নাচের এক-একটি পালা অভিনেতারা অপূর্ব সুন্দর মুখোশ পরে অভিনয় করেন, আর সেই নাচ দেখে অসংখ্য দর্শক বিমোহিত হন।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য[১০] মহাশয় পুরুলিয়া জেলার 'ছৌ' নাচ সম্পর্কে বলেছেন: "ময়ূরভঞ্জ ও সরাইকেলার 'ছৌ' নাচের সঙ্গে পুরুলিয়ার 'ছৌ' নাচের পার্থক্য আছে। ময়ূরভঞ্জের নাচে মুখোশ নেই ; সরাইকেলার নাচে মুখোশ ব্যবহৃত হলেও, তাতে চোখ ও নাকের জায়গাটা খোলা। সরাইকেলার রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এখানকার 'ছৌ' নাচ রাজ-পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ; তাতে রাজসভার আভিজাত্য যুক্ত হয়েছে। পুরুলিয়ার মুখোশ পরা 'ছৌ' নাচ নিতান্তই জনসভার বস্তু। এই মুখোশের মুখশ্রী অতি সুন্দর, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের মাধুর্য তাতে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। সরাইকেলার 'ছৌ' নাচ দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসে দেখান হয়, দেশ-বিদেশে বিখ্যাত। পুরুলিয়ার 'ছৌ' নাচের খবর অনেকেরই অজানা।"

১০ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ আষাঢ় ১৩৭৫

পুরুলিয়ার 'ছৌ'-নৃত্যশিল্পীরা নাচের সময় হিন্দু দেব-দেবী ও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলেন।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মালদহ জেলার গম্ভীরা নাচে ব্যবহৃত কালীর মুখোশ এবং দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি অঞ্চলে নাচের সময় ব্যবহৃত রাবণের মুখোশ তুলে ধরে পুরুলিয়ার 'ছৌ' নাচের মুখোশের পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্বোক্ত দুটি মুখোশ কাঠের ও ভারী; কিন্তু পুরুলিয়ার ব্যবহৃত মুখোশ মাটির ও হালকা। ডক্টর ভট্টাচার্য বলেছেন, "মুখোশ নাচ বাংলা সংস্কৃতিরই একটি মূল্যবান অংশ—একটি জীবন্ত লোক-নৃত্য।"

পুরুলিয়ায় অতি জনপ্রিয় এই 'ছৌ' নাচ। এই নাচ যে শুধু পুরুলিয়াতেই হয় তা নয়, পুরুলিয়ার সংলগ্ন বিহারের কোন-কোন অঞ্চলেও এর প্রচলন দেখা যায়। 'ছৌ' নাচের সঙ্গে নানারকম বাজনা বাজে, যেমন—ঢাক, ঢোল, ধামসা, নাকাড়া, ইত্যাদি। পুরুলিয়ার বহু গ্রামের শিল্পীরা পুরুষানুক্রমে 'ছৌ' নাচের মুখোশ আর পোশাক তৈরি করে জীবিকা অর্জন করে আসছেন। বেশ কয়েকটি গ্রামের শিল্পী-পরিবার এই পেশায় নিযুক্ত আছেন।

'ছৌ' নাচে মেয়েরা অংশ গ্রহণ করেন না। নারী চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করেন। অনেকে অনুমান করেন, এই নাচ মূলত যুদ্ধ-নৃত্য। 'ছৌ' শব্দ ছাউনী শব্দ থেকে এসেছে। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই নাচ চলে আসছে। শোনা যায় যে, এক সময়ে কালাপাহাড় এবং বর্গী হানাদারদের প্রতিরোধ করবার জন্যেই নাকি এই অঞ্চলে 'ছৌ' দলগুলি গড়ে উঠেছিল।

মালদহ জেলার গম্ভীরা উৎসব

মালদহ জেলার বিখ্যাত লোক-উৎসবের নাম 'গম্ভীরা'। গম্ভীরা শৈব উৎসব। মালদহের গম্ভীরা উৎসবে নৃত্য-গীত এবং ছড়া কাটানো হয়। প্রতি বছর গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষে নতুন গান ও ছড়া রচিত হয়। বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে পল্লী-কবিরা গান ও ছড়া রচনা করেন। দেব-দেবীর বন্দনা-

পুরুলিয়ার ছৌ নাচের কয়েকটি মুখোশ
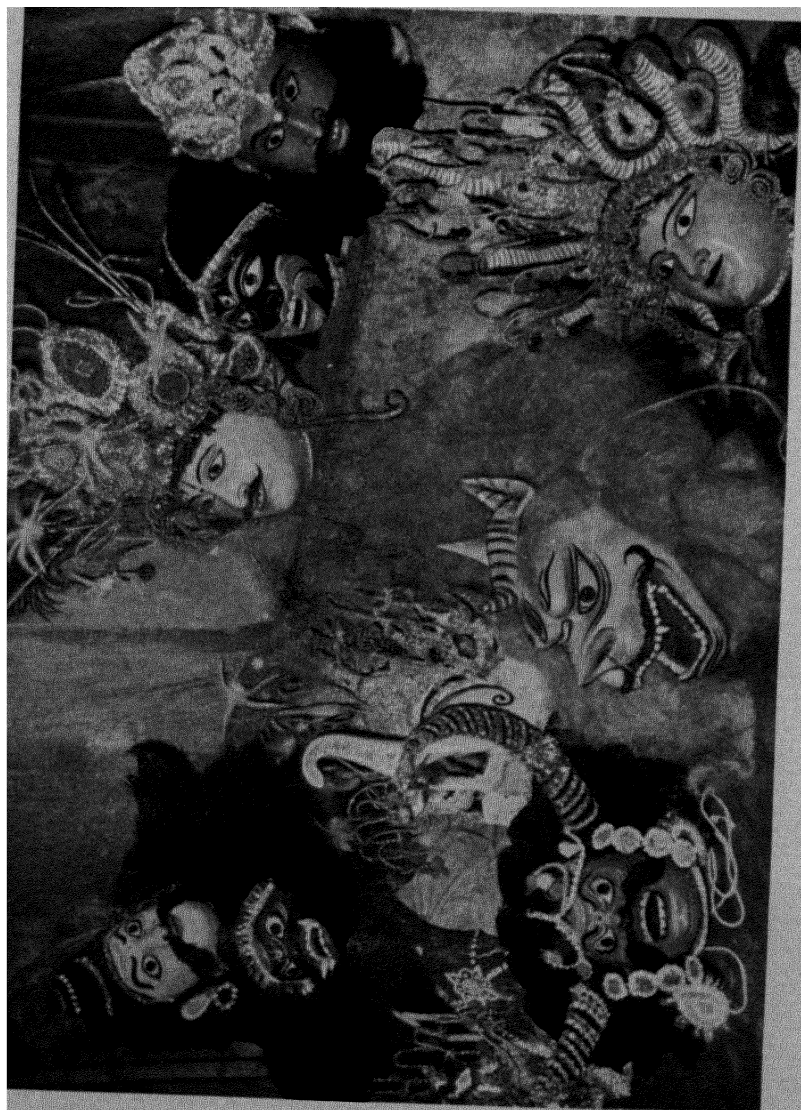
ছৌ নাচের মুখোশ নির্মাণ (পুরুলিয়া)
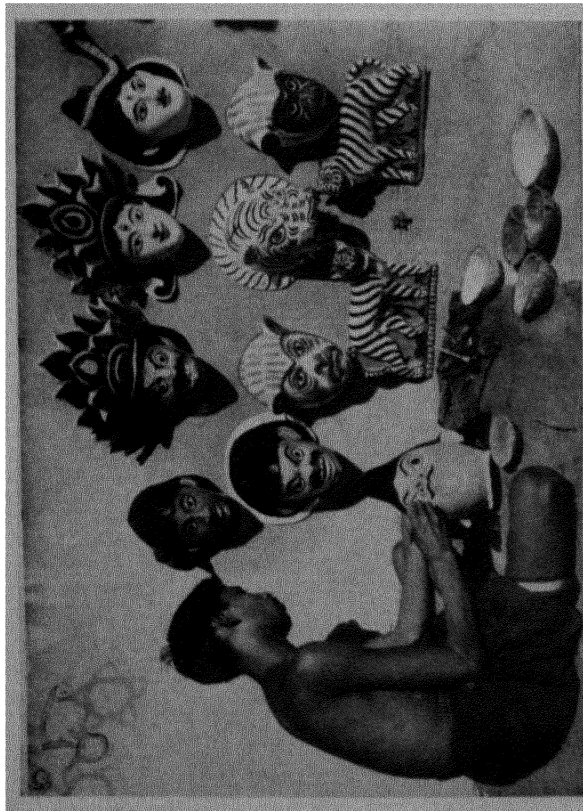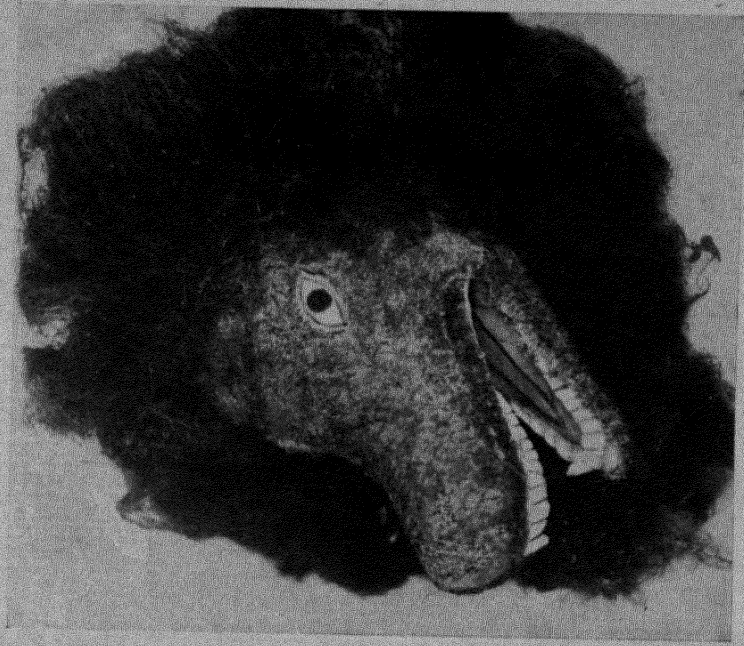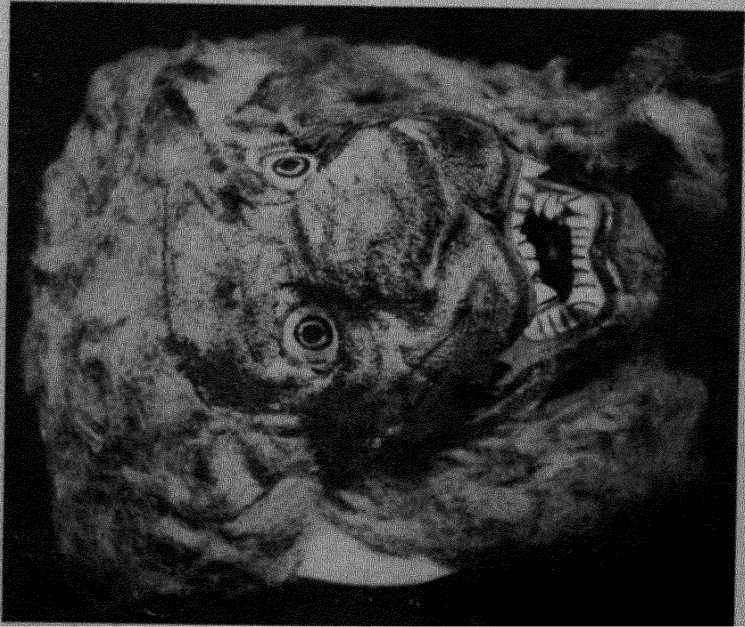
ছৌ নাচের মুখোশঃ সিংহ (পুরুলিয়া)

ছৌ নাচের মুখোশঃ শুয়োর (পুরুলিয়া)
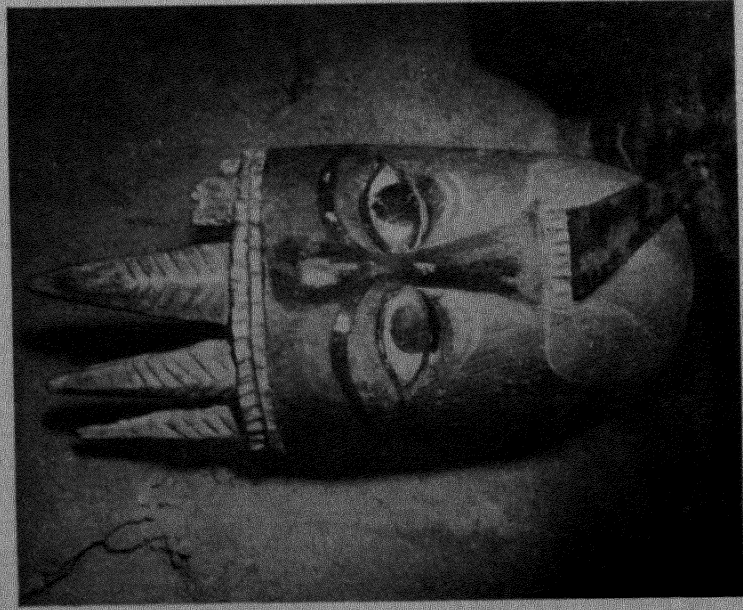
পশ্চিম দিনাজপুরের বংশীহারী গ্রামের একটি মুখোশ

ছো নাচের মুখোশ (পুরুলিয়া)

গান থেকে শুরু করে দেশের ও সমাজের সমসাময়িক ঘটনা নিয়েও ব্যঙ্গাত্মক গান ও ছড়া রচিত হয়। মালদহ জেলার এই লোক-উৎসবে, বিশেষ করে নাচ-গানের আসরে, স্থানীয় বিভিন্ন ধর্মের ও বর্ণের সাধারণ মানুষ যোগদান করেন ; সকলে সমবেত হয়ে গম্ভীরা-উৎসবের আসর মাতিয়ে তোলেন। বহু গম্ভীরার গান মুসলমান পল্লী-কবির দ্বারা রচিত হয়েছিল। 'টাকা ও বিদ্যার বিবাদ' গানের রচয়িতা হিসাবে এই প্রসঙ্গে পল্লী কবি সুফী রহমানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গানের একটি অংশ হল :

"টাকার উক্তি :

ধন্য বিদ্যা তুই ভাই বড়,
জ্ঞান দিয়ে জগৎ তার,
বিচারে পরাস্ত আমি হই জড়সড় (তোর কাছে)
বলে 'সুফী রহমান' বিদ্যার সর্বত্র মান,
লয়ে শরণ বিদ্যার চরণ সকলে বন্দো।"*

গম্ভীরা-উৎসব প্রসঙ্গে হরিদাস পালিত[11] মহাশয় লিখেছেন, "শিবের গাজন বা চড়ক অথবা চৈত্রমাসিক শিবোৎসব এবং এই ধর্মের গাজনও তদ্রূপ ধর্মোৎসব। মালদহের গম্ভীরা উৎসব যাহা তাহাই শিবোৎসব, কিন্তু ধর্মোৎসবের সহিত একই মৌলিকতা রক্ষা করিতেছে।"

এই প্রসঙ্গে এখানে আর-একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বীরভূমের সঙ প্রসঙ্গে আলোচনায় 'ধুলোট'-এর কথা বলা হয়েছে। গম্ভীরা উৎসবে ধুলোট প্রসঙ্গে হরিদাস পালিত[12] মহাশয় উল্লেখ করেছেন, "গাজন ও গম্ভীরা শেষে ভক্তগণ অদ্যাপি 'ধূলাখেলা' করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ধর্ম্মপূজায় এই ধূলোট দেখি যথা—

"সম্প্রতি সম্পূর্ণ পূজা চাঁপায়ের ঘাটে।
পণ্ডিত গোঁসাই দিল বিসর্জন ঘটে॥
হরিহর দিল আসি আভের ধূমূল।
গাজনে সন্ন্যাসী সব উড়াইল ধূল॥

* মহম্মদ সুফী রহমান, গম্ভীরা সঙ্গীত, মালদা, (১৯২৩), পৃষ্ঠা ৬

১১ হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, সন ১৩১০, পৃষ্ঠা ২৩

১২ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৩০

পণ্ডিত সবার ভালে দিল যজ্ঞ ফোটা।
দক্ষিণান্ত করি রাণী খোলে যোগপাটা ॥"

হরিদাস পালিত[১৩] মহাশয় 'গম্ভীরা' প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করেছেন, "সম্ভবতঃ সেই শিবধর্মপ্রচারক্ষেত্র হইতেই গৌড়নগরে শিবমঠনির্ম্মাণের সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। যদিও বহুপূর্ব্ব হইতে শিবমন্দির নির্ম্মিত হইত, কিন্তু তাহা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল। এই বৌদ্ধপ্রথামত শিবমন্দির-নির্ম্মাণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন-মানসে উৎকল দেশস্থ শিবমন্দিরের প্রথা মত এতদ্দেশে শিবমন্দির-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া থাকিবে। উৎকলে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিতরগৃহের নাম 'গম্ভীরি' এবং শিবমন্দির মধ্যস্থ দেহারা অর্থাৎ ভিতর গৃহে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে শিবলিঙ্গ অবস্থান করেন বলিয়া শিবালয়ের নাম 'গম্ভীরা'। এদেশেও গম্ভীরা গৃহ ঐ প্রকারের দুইটী গৃহবিশিষ্ট এবং ভিতরগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। উৎকল ভাষায় পূজাপদ্ধতি পুস্তকে শিবের বন্দনায় গম্ভীরা অর্থে শিবালয় দৃষ্ট হয়।"

হরিদাস পালিত[১৪] মহাশয় শৈব উৎসব প্রসঙ্গে একথাও বলেছেন, "লক্ষ্মণসেনের সময় যেমন শৈবধর্ম্ম গৌড়দেশে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সঙ্গে গম্ভীর শিবপূজা গম্ভীর মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া বৌদ্ধভাববর্জ্জিত গম্ভীরা-মণ্ডপ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। শিবপূজাদিতে পদ্মপুষ্প বিশেষ প্রকারে ব্যবহৃত হইত, পদ্মমালা বিভূষিত শিব, পঙ্কজ শোভিত শিবালয়ে শোভিত হইতেন বলিয়া, পঙ্কজম্ অর্থাৎ গম্ভীরম্ একার্থবোধক দৃষ্টে 'গম্ভীর' নাম প্রাপ্তির অন্যতম হেতু।"

মালদহের গম্ভীরা উৎসবে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নৃত্য-গীতাদি অনুষ্ঠিত হয়। অভিনয়কালে অভিনেতারা নানারকম মুখোশ পরে গৌরী, কালী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, বাশুলী, শিব প্রভৃতি রূপ ধারণ করে নৃত্য করেন।

হরিদাস পালিত[১৫] মহাশয় আরও লিখেছেন, "কাশীখণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যে নারী বা নর চৈত্র মাসের শুক্লতৃতীয়ায় উপবাসী থাকিয়া নিশীথকালে বস্ত্রালঙ্কারাদি বিবিধ উপচার দ্বারা মঙ্গলাগৌরীর পূজা করে, পরে ঐ রাত্রি গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জাগরিত থাকে, তাহারা আশাতীত সুখলাভ লাভ করিবে। আরও লিখিত আছে যে, কাশীস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই

১৩ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৩৯
১৪ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৩৯
১৫ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৪৬

চৈত্র মাসের শুক্লতৃতীয়ায় শিবের বার্ষিকী যাত্রা করা উচিত। চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব করিবে। একদা চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে কৃত্তিবাসোৎসব হইতেছিল, ঐ উৎসবে দেবগণ নানাবিধ উপচারের সহিত রাশীকৃত অন্নপ্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষদেবের বিরাট অন্নদানোৎসব এবং দ্বিতীয় শিলাদিত্যের বুদ্ধোৎসব এই চৈত্রোৎসবের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আধুনিক মালদহের গম্ভীরাও সেই চৈত্রোৎসবের ক্ষীণস্মৃতি প্রকাশ করিতেছে।"

গম্ভীরা উৎসব প্রসঙ্গে হরিদাস পালিত[১৬] মহাশয় আরও লিখেছেন, "চৈত্রমাসের শেষে যে শিবোৎসব ও চড়ক পূজা হইয়া থাকে, তাহার চলিত নাম 'শিবের গাজন'। ···এই শিবের গাজনই নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া মালদহে গম্ভীরা নামে খ্যাত হইয়াছে।"

গম্ভীরা উৎসবে অনেকে হর-গৌরীর মূর্তি তৈরি করে পূজা করেন। যেখানে শিবঠাকুরের মন্দির আছে সেখানেও নিয়মিত পূজার সঙ্গে ওই সময় শিবঠাকুরের বেশ ঘটা করে পুজো হয়ে থাকে।

মালদহে মুখোশ 'মুখা' নামে পরিচিত। মালদহের মুখোশ সাধারণত কাঠ কিংবা মাটি দিয়ে তৈরি হয়। পূর্বে বেশির ভাগ মুখোশ তৈরি হত নিমকাঠ দিয়ে। উৎসবের জন্যও নানারকম মুখোশ তৈরি হত, যেমন—কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাশুলী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়, বুড়ি, শিব, ভূত, প্রেত, কার্তিক, ইত্যাদি। বিশেষভাবে চালী-নাচ ও যুদ্ধের নাচ দর্শকদের মুগ্ধ করে।

মুখোশ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পালিত মহাশয়[১৭] লিখেছেন, "মুখার ঊর্দ্ধদিকে ও পশ্চাদংশে একটী এবং দুই কর্ণের পশ্চাতে দুইটী ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে রজ্জু সংবদ্ধ থাকে, সেই রজ্জু দ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্য চাদর বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া কর্ণবেষ্টন করিয়া পাগড়ী বাঁধা হয়।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিব্বতেও মুখোশ-নাচ হয়। তিব্বতের মুখোশ-নাচ প্রসঙ্গে এক বিদেশী লেখকের[১৮] গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

১৬ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৫০

১৭ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৫৯

১৮ Giuseppe Tucci, *Tibet . Land of Snows*. translated by J. E. Stapleton Driver, page 148

"The dance is not a diversion but a long-established rite in Tibet ; it also plays a large part in the Bonpo ceremonies. The dance is generally regarded as a means by which new supernatural forces can come down to the world of men. An example of this is the lha-chham, which take place especially but not exclusively in the monasteries at the end of the year, which monks as the performers.

"These sacred dances always recall great events of the past, and in Tibetan Buddhism in particular. The struggle between religion and evil powers is a customary theme, for example in the story of the persecution of Buddhism by king Langdarma and his assassination by Pelgyi-dorje.

"The performers were huge, monstrous masks, which do not just exaggerate the basic features of the human face, in order to portray wickedness ; they are more the arbitrary product of an inflamed imagination, so that the face loses its normal proportions."

মালদহের গম্ভীরা উৎসবে ঘোড়া-নাচের জন্য ঘোড়াও তৈরি করা হয়। শুধু ঘোড়া কেন, বাঁশ, কাগজ, কাপড়, ইত্যাদি নানা জিনিস দিয়ে ভাল্লুক, ময়ূর, তৈরি করে অভিনেতারা নানারকম নৃত্য করেন। কার্ত্তিকের মুখোশ পরে পিঠে ময়ূরের পুচ্ছ বেঁধে ময়ূর নৃত্য দেখান হয়। অনেকে হনুমানের মুখোশ পরে 'লঙ্কাদগ্ধ' পালা অভিনয় করেন।

গম্ভীরা উৎসবে নানারকম বিষয়বস্তু নিয়ে গান রচিত হয়। যেমন, দেব-দেবীর বন্দনা-গান, ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য মিউনিসিপ্যাল ইলেক্সন, ইত্যাদি বিষয় নিয়েও গান রচনা করার প্রচলন আছে।

এই প্রসঙ্গে যাত্রাগানের আসরে সঙের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেবলীলাত্মক কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা, রামযাত্রা, প্রভৃতি পালা যাত্রাগানের আসর মাতিয়ে রেখেছিল। তারপর দেখা দেয় বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি পালা। দেখা দেয় কালুয়া-ভুলুয়া, ঝিঙি, ইত্যাদি সঙ।

ডক্টর সুকুমার সেন[১৯] মহাশয় নাটক প্রসঙ্গে আলোচনা কালে বলেছেন, "ইংরেজী-শিক্ষার প্রথম সক্রিয় ফল সমাজ-সংস্কারে দেখা দিয়াছিল। পূর্ব হইতেই

১৯ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৭০, পৃষ্ঠা ৫২

যাত্রাশালায় কবিতায়ও নকশায় সমাজ অথবা শ্রেণী বিশেষের ব্যঙ্গচিত্র জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের একটি প্রধান উপকরণ যোগাইয়া আসিয়াছিল। সাধুবেশী পাষণ্ডের ভণ্ডামি, মূর্খের ধনগর্ব ও কুলাভিমান, পণ্ডিতের বিদ্যামদ, মাতালের লাঞ্ছনা, ধনীর লাম্পট্য, কুট্টনীর ছলনা, অসতীর বিড়ম্বনা এবং সতীর দুর্দশা—ইহাই ছিল সাধারণত যাত্রার সঙের এবং নকশা-চিত্রের প্রধান বিষয়।"

বিপিনবিহারী গুপ্ত[20] মহাশয় যাত্রা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "তখন কলিকাতায় যাত্রাগানের খুব ধুম। সর্বত্রই যাত্রার আদর ছিল।" বিপিনবিহারী গুপ্ত[21] মহাশয় সঙ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "গোবিন্দ অধিকারী রাত্রি শেষে আসরে নামিতেন, তখন যাত্রা শুনিবার জন্য কর্তারা আসিয়া বসিতেন। তৎপূর্বে রাত্রি নয়টা হইতে তিনটা পর্যন্ত ছেলে ভুলাইবার জন্য অনেক রকম সঙের ব্যবস্থা ছিল।"

মালদহের গম্ভীরা উৎসবে শিবঠাকুরের ভক্তরা শিবের বন্দনা যেমন গাইতেন, আবার সমাজের নানা বিষয়বস্তু নিয়ে গান রচনা করে শ্রোতাদের তৃপ্তিবর্ধন করতেন। এই প্রসঙ্গে হরিদাস পালিত[22] মহাশয় লিখেছেন, "সারা বৎসর মধ্যে দেশে বা গ্রামে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ন্যায়বিগর্হিত হইলে তাহার গীত রচিত ও গীত হয়। একাধিক গায়কগণ একত্র, পৃথক পৃথক, স্ত্রী পুরুষে সজ্জিত হইয়া গীত গাইয়া থাকে। শিবের বন্দনা, ঠুংরি, চারাড়ি, ইত্যাদি গান হইয়া থাকে।"

মালদহ গম্ভীরা সমিতির প্রতিযোগিতা পরীক্ষার পারিতোষিক বিতরণ সভায় গম্ভীরা প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ পাঠ করা হয়েছিল। উক্ত নিবন্ধে[23] বলা হয়েছিল: "পূর্ব্বে দেখিয়াছি, গম্ভীরায় কেবল কুরুচির প্রশ্রয় ছিল, সামাজিক কুৎসার উৎস ছিল, বীভৎস ভাবভঙ্গীর বিলাসক্ষেত্র ছিল। এখন তৎস্থানে দেখিতেছি, ধর্ম্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং জাতীয় শিক্ষার জন্য প্রয়াস ও আলোচনা। এই জাতীয় শিক্ষা-সম্মিলন দেশের পক্ষে বড়ই হিতকর, বড়ই আনন্দজনক, অজ্ঞ-সমাজের শিক্ষা প্রস্রবণ এবং গানে ও প্রাণে সম্মিলন।"

২০ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, ১৩৭৩, পৃষ্ঠা ২৫৪

২১ পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৫৪

২২ হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১৬, পৃষ্ঠা ৭৩

২৩ গৃহস্থ (মাসিক পত্র), পৌষ ১৩২০, পৃষ্ঠা ১৩৪

উক্ত নিবন্ধে[২৪] আরও বলা হয়েছিল, "মালদহের নিজস্ব গম্ভীরার মধ্য হইতেও মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের কলেবর পুষ্টির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অতএব, পূর্ব্বে সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে শব্দ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। পরে, ভাবের পরিপুষ্টি সাধিত হইলেই ভাষার উন্নতি হইবে।"

গম্ভীরা উৎসব প্রসঙ্গে একটি পত্রিকা[২৫] মন্তব্য করেছিলেন, "আমাদের গম্ভীরা মালদহবাসী হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় সম্পদ্। হরিদাসবাবুর ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবী মাত্রেই জানিয়াছেন—গম্ভীরা একটি শৈব উৎসব। মুখ্যতঃ হিন্দু-ধর্ম্মের একটা অনুষ্ঠান হইলেও গম্ভীরার সাহায্যে এ জেলার শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, লোকমত, শিক্ষাপ্রণালী সকলই যুগে যুগে গঠিত হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, সম্প্রদায়ভেদ চিন্তা করাই যাইতে পারে না। এই কারণে আধুনিক কালেও জনসাধারণের উপর গম্ভীরা-উৎসবের প্রভাব অতিশয় গভীর ও ব্যাপক।"

মানুষকে নিছক আনন্দ দেবার জন্যই বাংলাদেশের মানুষ মুখোশ পরে নৃত্য করত। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে চৈত্র মাসেই সঙ সেজে আমোদ-প্রমোদ করত। সেকালের একটি মাসিক পত্রিকায়[২৬] 'চড়ক সংক্রান্তি' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল: "বেলা শেষ হইতে না হইতে নানা রকমের সঙ বাজারে আসিয়া জড় হয়। স্থূল রসিকতা দ্বারা সাধারণ দর্শকের হাস্যরসের উদ্রেক করাই তাহাদের অভিপ্রায়; তাহাদের এই অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে সকল সঙের মধ্যে হাস্যরস উদ্রেকের জন্য কোনই আয়োজন থাকে না, না থাকিলেও পল্লীগ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোকের আমোদের একটা আদর্শ লক্ষ্য করা অল্প আনন্দজনক নহে। অতএব এখানে সঙের দুই একটা নমুনা দেওয়া যাইতে পারে। কেহ একটা মুখস পরিয়া গায়ে খানিক চিটাগুড় ও কতকগুলা শিমুলের তুলায় কৃত্রিম লোম লাগাইয়া এবং চাদর পাকাইয়া তাহারই একটা লেজ বাঁধিয়া বাঘ সাজিয়া হাজির হয়, একজন লোক তাহার

২৪ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ২৩৫
২৫ গম্ভীরা (দ্বৈমাসিক পত্র), প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ১৩২১, পৃষ্ঠা ২
২৬ সাধনা (মাসিক পত্রিকা), চতুর্থ বর্ষ, প্রথম ভাগ, ১৩০১-১৩০২ সাল, পৃষ্ঠা ৫৩৬

কণ্ঠলগ্ন দড়িগাছটি ধরিয়া অগ্রসর হয়, তাহাদের চারিদিকে ছেলে ও বুড়োতে পঞ্চাশ জন, কোন সাহসী চাষার ছেলে রহস্যচ্ছলে সেই কৃত্রিম শার্দ্দূলের লেজে হাত দেয় আর ব্যাঘ্রপ্রবর 'ঘাঁক' করিয়া তাহার দিকে লম্ফ প্রদান করে দেখিয়া সকলে শশব্যস্তে ছুটিয়া পলায় এবং সকলের উদ্ঘাটিত মুখ বিবর হইতে হাসি উৎসারিত হইয়া পড়ে।

"অন্যত্র একজন বৈরাগী অন্য একজন বাবাজীর সেবাদাসীকে সঙ্গে লইয়া খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে এবং 'বেলা গেল, ও ললিতে কৃষ্ট এলো না' এই গান গাইয়া আমোদলোলুপ পল্লী-যুবকদের দেহ ও মন আকর্ষণ করিতেছে, পথিমধ্যে বৈষ্ণবীহারা বৈরাগী বৎসহারা ধেনুর ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবী চোর বাবাজীউকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার ঝুলি ধরিয়া টানিতে লাগিল, উভয় পক্ষে বিপরীত ঝগড়া—শেষে মারামারী, মারামারীর চোটে বাবাজীউদের টিকি কাঠের মালা ছিঁড়িয়া গেল, ঝোলার মধ্যে হইতে মদের বোতল, ছোলাভাজা প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে আর একজন লুব্ধ বৈরাগী আসিয়া বৈষ্ণবীকে লুফিয়া লইয়া গা ঢাকা দিল।"

একটি পত্রিকায়[২৭] গম্ভীরা উৎসব প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে : "শিক্ষা প্রচারক বিনয়কুমারের রচনা হইতেও এ সম্বন্ধে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—গম্ভীরায় যে কেবল এক এক পাড়ায় তিন দিন আমোদ-প্রমোদ হয় তা নয়, এখানে একটা বাঙ্গালী জাতির কাজ হয়। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি, বাঙ্গালার সভ্যতা, বাঙ্গালীর আদর্শ-গঠন করবার একটা প্রধান উপায় মালদহের গম্ভীরা।"

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি গম্ভীরা গান এখানে উদ্ধৃত হল :

[১][২৮]

১। দেশের দুর্দ্দশা সব ভুলে, পূজা চাচ্ছ ঢুলে ঢুলে, (হে)
একবার দেখ্‌লা না চোখ খুলে, লক্ষ্মী ছাড়িয়া ছলে বলে,
এখন আট সেরে কাঠ ক'রে মেরেছ।

২৭ গম্ভীরা, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ১৩২১, পৃষ্ঠা ৩

২৮ গম্ভীরা, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ১৩২১, পৃষ্ঠা ৫৫

২। আকাল ফেলে দেশের মাঝে, চালান দিছ ধান জাহাজে (হে)
লাগিয়া বিলাতী মদের কাজে, সে মদ বাংলাতে বিরাজে,
ব্রাণ্ডি খাওয়ায়ে দফা সেরেছে।

৩। তোমার জানি অস্ত্র আদি, জার্মান পালাও হয়ে হে অন্নে
বাদী (হে)
কাঁচ দিয়ে দেশের কাঞ্চনাদি ডিটিজের (Dietz) ঘরে
ভরেছ। (জার্মানে)

৪। ধন্বন্তরিক ফেলে ফাঁদে, হোমিওপ্যাথিক তুলেছ কাঁধে (হে)
পেটেণ্ট ঔষধে আকাশের চাঁদে ডি ওয়ালডিকে চরাছ ॥
(বিলাতের)

৫। বিদেশীদের অন্ন পড়িয়া, দিছ উচ্চপদে চড়িয়া, (হে)
দেশী উকিলগণকে ল'য়ের লেজ ধরিয়া কাছারীর মাঠে ঘুরাছ ॥
(তুমি)

[২][২৯]

(কৃষকদের অভাব এবং আক্ষেপোক্তি)

জমি ক্যামনে চষি আমরা, বিচার কর তোমরা—
গরু দামড়া হয়েছে টান—গেল রে চাষাদের জান।
ভাবিছে চাষী দিবানিশি—কিসে বাঁচিবে না হইলে ধান ॥

১। অসার হল শস্যক্ষেত্র সার বিনে—
গোময়ের সার পাই না আর কিনে, (ভাই রে)
শস্যাদি লোপ পায় দিনে দিনে,
কৃষির উন্নতি গরুই প্রধান। (দেখি)

২। দেশের যদি চাও সবে মঙ্গল,
তবে বজায় রাখ কৃষির গরু লাঙ্গল, (ভাই রে)
দূর হবে জঙ্গল, আর অমঙ্গল,
থাকবে লক্ষ্মী বাড়িবে মান। (দেশে)

২৯ গম্ভীরা, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ১৩২১, পৃষ্ঠা ৫৬

৩। সবলকায় গাই আর পাই লাঙ্গল যন্ত্র,
লক্ষ্মী আনতে পারি করে ষড়যন্ত্র (ভাই রে)
বঙ্গ থেকে লক্ষ্মী হবে না স্বতন্ত্র,
দেখিবে বিলাতবাসী, চীন, জাপান। (তখন)

[৩][৩০]

দেশের দৈন্য দশা (শিবের প্রতি)

ছাড় হে ভাংয়ের নেশা, চোখ মেল্যা দেখ দশা।
কিবা দেখতে আয়াছ বুড়া, দেখ মাহাঙ্গার ঘুশা॥

১। বাজারে আগুন লাইগ্যা গেছে, টাকায় দশ সের ধান বিকাইছে,
দেইখ্যা অন্তর শুইখ্যা যাইছে ভাইব্যা হয়েছি বাদুড় চুষা॥

২। তরি তরকারী সব মাঙ্গা, মাছের ডোবা হয়েছে ডাঙ্গা,
পয়সায় দেড়টা কাঁচাকলা ভাঙ্গা, পাটের ডগা খেতে বড় খাসা॥

৩। শুনি বুড়া-বুড়ি বলে, নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে,
টাকায় আট মন চাউল বিকালে, সেদিন ছিল না কাঁদা হাসা॥

৪। আকাল হয়েছিল আশী সালে, দেখে টাকায় আট সের চাউলে,
হাহাকার করেছিল সকলে, এখন ছ'সের খেয়ে নাই গোসা॥

৫। লক্ষ্মী সরস্বতীর কোপানলে, দেশটা গেছে বুড়া জ্বলে,
তারা গিয়াছে বিলাত চলে, এখন করেছে সেথায় বাসা॥

৬। দেশের দুর্দ্দশা সব ভুল্যা, পূজা খাচ্ছ ঢুল্যা ঢুল্যা,
একবার দেখলা না চোখ খুল্যা, জি, সি, ভাবছে বসে তোর তামাসা॥

[৪][৩১]

বরপণ প্রথা

কন্যা। বাবা থাকুক আমার বিয়ে কাজ নাহি হয়ে।
চাইনে এম্, এ, বি, এ, টাকা দিয়ে,
কিনো না হাটে গেয়ে॥

৩০ গম্ভীরা, ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৩, পৃষ্ঠা ৫৫
৩১ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৫৫

পিতা। মা তোর বিহার লেগে পড়েছি দায়ে।
অমন শিক্ষাতে ধিক্, অন্ধ অধিক,
বেচে যেন শালিক টিয়ে ॥

কন্যা। সোনার চেন সোনার ঘড়ী, গর্ব্ব যাদের পরি,
অমন পশু কিনো না বাবা নিয়ে কানা কড়ি ;—
বিহা কি পদার্থ, অপদার্থ, বুঝে না ছেলে পেয়ে ॥

পিতা। ভণ্ড দেশের হিতৈষী, ওরাই রক্ত শোষে বেশী,
বি, এ, এম, এ, হলে ছেলে, অর্থপিয়াসী,
ধিক উচ্চ শিক্ষা, স্বদেশী দীক্ষা, প্রীতি কেবল টাকার মোহে ॥

কন্যা। বেচবে কেন ভিটেমাটি, বেচবে কেন ঘটিবাটি
মজবে কেন আমার তরে ভিটায় পুকুর কাটি ,—
ভাল কুলীন কুলী, কশাই গুলি, ফিরছে ছুরি শানাইয়ে ॥

পিতা। কোন জন্মে কল্লে কিবা পাপ, বাঙ্গালায় হতে হয় মেয়ের বাপ,
বুঝতে নারি ত্রিপুরারি এ কি মনস্তাপ ;—
যত ঘোষ আর বসু, ধরছে ইসু চাটুজ্যে, মুখুজ্যে পশুর হিয়ে ॥

কন্যা। কিসের ডিগ্রী কিসের পাশ, ঐটি হলো গলার ফাঁস,
কলেজ বসাইয়ে কল্লে কেবল, দেশের সর্ব্বনাশ,
যারে কায়দাতে পায়, মেয়েরি দায়ে,
কর্ম্ম সারে ধর্ম্ম খেয়ে ॥

পিতা। কি কুক্ষণে আদিশূর, আনলে দেশে এ অসুর,
বল্লালের চোখে নুন দিয়ে মারতে কেন কল্লে কসুর,
মেয়ের বাপ দুম্বা মেষ, পোড়া বাঙ্গালা দেশ,
নিত্যি খাচ্ছে মাংস কেটে নিয়ে ॥

কন্যা। বাবা স্নেহলতার মত, না হয় করব 'জহর ব্রত',
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিয়ে করব জীবন হত ;—
না হয় ভজব পশুপতি, ঘুচাব দুর্গতি,
পূজব উমার মত গিয়ে ॥

পিতা। কার বা গর্ভে কার ঔরসে সাত পুরুষের পুণ্যেরি বশে,
মানুষ জন্মায় কটা ছেলে উজলিয়ে বংশে,

যদি ইচ্ছা করে সবাই পারে, শান্তি দিতে
ভ্রান্তি বিনাশিয়ে ॥

[৫][৩২]

শিবের বন্দনা

তুমি এসেছ গম্ভীরায়, অনাদি হে বৃষভবাহন।
প্রণাম করি পশুপতি, বামে শোভে হৈমবতী,
ক্রোড়ে দেব বিঘ্ন-বিনাশন।

১। ভাং ধুতুরার নেশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়ন,
ধবল ধূর্জ্জটী অঙ্গে ভস্ম করেছ লেপন,
জটা পরে সুরধুনী, রেখেছ হে শূলপাণি,
গজ্জে ফণী হে ফণিভূষণ ॥

২। দুই কর্ণে দুই ধুস্তুর গলে দোলে হাড়মাল,
সিঙ্গাডম্বরু বাজাও ভাল পরণেতে ব্যাঘ্রছাল,
শ্মশান মশানে বেড়াও, কি বুঝিবে শ্রীগুরুচরণ ॥

[৬][৩৩]

কয়েদীদের গান

প্রথম কয়েদী— প্রথমে ছিলাম আমি কলিকাতা আলিপুরে,
দ্বিতীয় কয়েদী— ঢাকা, রাজসাহী, রংপুর এলাম ঘুরে,
তৃতীয় কয়েদী— জানি তিনটি সহর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, লাহোর,
চতুর্থ কয়েদী— আমি মালদা ভিন্ন অন্য জানি না জেলা,
চারিজন একত্রে— জেলের বিবরণ সবাই বলেক খুলা। (এখন)।

প্রথম কয়েদী সখের সাইকেল গাড়ী চুরিতে ধরা পড়ি,
দ্বিতীয় কয়েদী গনি মিঞার বাড়ী ঢাকাতে ডাকাতী করি,
তৃতীয় কয়েদী গিয়ে সাহেব হাত্তা, চুরি শিকারী কুত্তা, আর (মেমের)
বিলাতী জুতা,

৩২ পূর্বে উল্লিখিত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৫৬

৩৩ গৃহস্থ, আষাঢ় ১৩২০, পৃষ্ঠা ৬১৩

চতুর্থ কয়েদী— বাবুর হাতী চুরি, ধরা পড়ি গঙ্গার কূলে,
চারিজন একত্রে— জেলের বিবরণ সবাই বলেক খুল্যা (এখন)।

(জেলে কয়েদীরা কে কি পরিশ্রম করিয়াছে তাহার বিবৃতি)

প্রথম কয়েদী— ফুলকপি, গাজর, মূলা, জল যোগাতাম দু-বেলা,
দ্বিতীয় কয়েদী— পীড়তাম সরষার ঘানি ও বড় বিষম ঠেলা,
তৃতীয় কয়েদী— আমার কাজটি ফাঁকা, টানতাম জেল দারোগার পাখা,
চতুর্থ কয়েদী— আমি ছিলাম সর্দ্দার বি, সি, কয়েদীর দলে,
চারজন একত্রে— জেলের বিবরণ সবাই বলেক খুল্যা।

৮ ॥ বিদূষক, ভাঁড় ও আহ্লাদে

ভাঁড় শব্দের অর্থ পরিহাস-কুশল, পরিহাস-রসিক ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়-বিশেষ। বিশদভাবে বলতে গেলে ভাঁড় একশ্রেণীর লোক যারা সাধারণ মানুষকে খুব হাসাতে পারে। সেকালে রাজা, জমিদার বা সম্ভ্রান্ত লোকের সভায় এবং বৈঠকখানায় ভাঁড়ের স্থান ছিল। নানারকম অঙ্গভঙ্গির দ্বারা, সুললিত বাক্য-বিন্যাসে কিংবা কৌতুক কাহিনী শুনিয়ে, হাসির গান গেয়ে, অথবা ছড়া কেটে মনোরঞ্জন করাই ছিল ভাঁড়দের প্রধান কাজ। এদের পেশা যে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে তা নয়। কাশী, কানপুর, লখনউ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে এখনও বিবাহের উৎসবে এবং পূজা-পার্বণে সকলের মনোরঞ্জনের জন্য ভাঁড়দের ডাক পড়ে।

শ্রী গোপালচন্দ্র রায়[১] মহাশয় লিখেছেন, "রাণী রাসমণি প্রতি বছরই মহা-আড়ম্বরের সঙ্গে রথযাত্রা উৎসব করতেন। রথযাত্রার দিন রাণী ঢাক, ঢোল, সানাই, কাড়া, নাকাড়া, বাঁশী, জগঝম্প প্রভৃতি কত রকমেরই না বাজনা আনাতেন। শুধু কি তাই, কীর্তন, বাউল, ভাঁড়ের দল প্রভৃতিও আনাতেন।"

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অজস্র বিদূষক-চরিত্রের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত নাটকের কৌতুক অংশে বিদূষকের ভূমিকা ছিল একচেটিয়া। প্রতি নাটকেই একজন ভাঁড় থাকত, নামান্তরে যিনি বিদূষক। ভাস, কালিদাস এবং শূদ্রক প্রমুখ নাট্যকারগণ যদিচ বিদূষক-চরিত্র আপন-আপন প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে অঙ্কিত করেছেন, তবুও ঐতিহ্যের মূল নীতি সকল ক্ষেত্রে প্রায় একই রূপ ছিল। নাটকের নায়ক স্বভাবতই হতেন রাজা। বিদূষক ছিলেন রাজার পরম সুহৃদ এবং পরস্পর পরস্পরকে 'বয়স্য' বলে সম্বোধন করতেন। নিছক হাস্যরস সৃষ্টির জন্য আদিতে বিদূষক-চরিত্র সৃষ্ট হয়েছিল এবং পরে ধীরে-ধীরে নাটকের এই চরিত্র পূর্ণাঙ্গ নটের মর্যাদা লাভ করেছিল। নাট্য-চরিত্রের তালিকায় বিদূষক, নান্দী, সূত্রধার, ইত্যাদি থাকত। অবশ্য অভিনব ভারতী রচয়িতা অভিনব গুপ্ত এইমত প্রকাশ করেছিলেন যে, সূত্রধারের অপর

১ গোপালচন্দ্র রায়, রাণী রাসমণির জীবনী, পৃষ্ঠা ১৫

একটি সহকারী রূপেই বিদূষকের স্থান। বিদূষককে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বয়স্ক ব্যক্তিরূপে বা বৃদ্ধরূপে দাঁড় করানো হত।

বিদূষকের আবির্ভাবে বা তার নাম শুনলে দর্শকবৃন্দ কৌতুক অনুভব করতেন। তার আকৃতি, মুখভঙ্গি, চালচলন, সংলাপ, অঙ্গভঙ্গি এবং অদ্ভুত পরিচ্ছদ হাস্যরসের অবতারণা করত।

সাধারণভাবে বিচার করলে বিদূষক ও ভাড়ের মধ্যে তফাৎ খুবই সামান্য। অনেকের মতে, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রাজার অনুচর ও সুহৃদ বিদূষকের সঙ্গে বর্তমানের ভাঁড়ের পার্থক্য নেই। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের বিদূষকরা কালক্রমে 'ভাঁড' আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়ের একটি উল্লেখযোগ্য আসন ছিল এবং তিনি পরিহাস-পটুতায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। গোপাল ভাঁড়ের বহু হাসির গল্প আজও শহর ও গ্রামের মানুষের মুখে শোনা যায়।

ভাঁড় প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু[২] লিখেছেন: "মুসলমান রাজগণের সময়েও ভাঁড়ের আদর ছিল। এরূপ কথিত আছে যে, মোগলপতি তৈমুরলঙ্গ পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া দ্বাদশবর্ষকাল নিয়ত বিলাপ করিয়াছিলেন। সৈয়দ হোসেন নামক তাঁহার জনৈক পারিষদ আরবী ভাষায় একখানি সুললিত হাস্যোদ্দীপক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার শোকাপনোদন করেন; তজ্জন্য তিনি মোগলরাজ কর্তৃক 'ভাঁড়' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সৈয়দ হোসেনই ভাড় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ক্রমে এই ভাঁড়গণ স্বতন্ত্র ব্যবসা করায় শাখা-জাতিরূপে পরিগণিত হয়। হোসেন সৈয়দ বংশীয় হইলেও, বর্তমান মুসলমান ভাঁড়গণ সেখ বা মোগলবংশ সম্ভূত। শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় ভেদে ইহাদের বিবাহ দিয়া থাকে। আচার ও ব্যবহারে ইহারা প্রায়ই মুসলমানের ন্যায়, তবে ইহাদের মধ্যে হিন্দু-আচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাঁড় জাতি চেঁড় ও কাশ্মীরি এই দুই শাখায় বিভক্ত। অযোধ্যার নবাব নাসিরুদ্দিন কাশ্মীরি ভাঁড়দিগকে আনয়ন করেন।

"বর্তমান সময়ে হিন্দু ভাঁড়গণ কৈথেলা (কাপিষ্ঠলী), বাজনিয়া কামার, উজহার, বহেলা, গুজর, নোনিয়া, কড়া, পিতরহঙ্কর, বরহা, নথটিয়া ও শাহপুরী এবং মুসলমান ভাঁড়গণ বরবা, ভন্দেলা, বুড়দিয়া, দেশী, গাওবাসী,

২ নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, (১৩০৯), ত্রয়োদশ ভাগ, পৃষ্ঠা ৩০৮

হুমলপুরী, হর্থাজরেহা, জবোয়া, কৈথলা, কায়স্থ, কাশীবালা, কাশ্মীরি, কাঠিয়া, কতিলা, কব্বাল, খাথারিয়া, ক্ষত্রী, ক্ষেতি, মোথরা, মুসলমানি, নকল, নৌমস্যলিক, পাঠান, পাটুয়া, পুরবিয়া, রাবত, সাদিকি, সেখ, তারাকিয়া প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত।"

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩] মহাশয় আহমদাবাদের ভাঁড়ের যাত্রার প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমি যখন প্রথম আহমদাবাদে যাই তখন সেখানে একটা পার্টি দিয়াছিলাম—তাহাতে অনেক ইংরাজ ও দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। সেই পার্টিতে আমোদের যে সব সরঞ্জাম ছিল তার মধ্যে ভাবইয়া নামে ভাঁড়ের যাত্রার দল আনানো হইয়াছিল। ভাবইয়ারা উপস্থিত ঘটনা বর্ণনায় ও লোকজনের চরিত্র নকলে পরম পটু। তাহারা যে সময়কাব চিত্র প্রদর্শন করিতেছিল তখন বোম্বায়ে 'সেয়ার মেনিয়া' রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেয়ার কিনিবার জন্য পাগল। নিঃস্ব কাঙ্গাল—যাহার ঘরে অন্ন জোটে না সেও একরাত্রির মধ্যে সম্পদবান্ হইয়া উঠিবে—লোকের এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। ইংরাজ মারাঠী গুজরাটী এই সংক্রামক রোগ সকলকেই ধরিয়াছে। সেই ঝোঁকে ইংরাজ ও দেশীয়দের বিলক্ষণ মেলামেশা হইত।

"নেটিব তখন ইংরাজের অবজ্ঞার পাত্র ছিল না। তখন তাহাদের গলাগলি ভাব দেখে কে? সেয়ার বাজারের রাজা ছিলেন প্রেমচাঁদ রায়-চাঁদ, তাঁর তর্জনীর ইঙ্গিতে সেয়ার বাজারের উত্থান পতন হইত। ইংরাজেরা তখন তাঁহার দরবারে গিয়া খোসামোদ করিতে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতেন না। মেমসাহেব পর্য্যন্ত কখন কখন সেয়ার ভিক্ষা করিতে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইতেন। এই বিষয়টি সেই গুজরাটি ভাঁড়েরা সুন্দর নকল করিয়াছিল। সাহেব তাঁহার মেমকে লইয়া সেয়ার আবদারের জন্য বাহির হইয়াছেন দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে হাসির ফোয়ারা উঠিল। ইহার মধ্যে ওদিকে কি গোলযোগ উপস্থিত! চটাপট চপেটাঘাতের শব্দ! একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার স্বজাতির ওরূপ উপহাসজনক নকল সহিতে না পারিয়া বেচারা ভাঁড়দের উপর উত্তম মধ্যম প্রহার আরম্ভ করিলেন, সেই গোলমালে মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঁড়ের খেলা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইল। আমরা হাসি কি কাঁদি—কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।"

৩ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, (১৯১৫), পৃষ্ঠা ১৮৫

সেক্সপিয়ারের 'কিং লীয়ার' নাটকেও আমরা বিদূষকের সাক্ষাৎ পাই। ব্রিটেনের রাজা লীয়ার বহুদিন রাজত্ব করার পর বার্ধক্যে উপনীত হলেন এবং শাসনের দায়িত্ব থেকে অবসরগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর পুত্র ছিল না। রাজা লীয়ারের তিনটি কন্যা—গনেরিল, রেগান আর কর্ডেলিয়া। তিনি চেয়েছিলেন রাজত্ব তিন মেয়েকে ভাগ করে দিয়ে নিজে পালাক্রমে মেয়েদের বাড়ি গিয়ে শেষজীবন অতিবাহিত করবেন। কিন্তু তা হয়নি। রাজাকে তাঁর সর্বস্ব দান করে বনে যেতে হয়েছিল। সেই দুর্দিনে রাজার সঙ্গে ছিল বিদূষক। বিপদেও বিদূষক রাজাকে অনুসরণ করেছিল। সম্পদে, বিপদে, সকল সময়েই বিদূষক রাজার সহৃদয় বন্ধু।

বিদূষক বা ভাঁড়ের কাহিনী বিদেশী সাহিত্যেও কিছু অপ্রচুর নয়। যেমন, ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী (১৪৯১-১৫৪৭) বিদূষককে একই আহারের টেবিলে বসিয়ে আহার করতেন। তিনি মনে করতেন যে আহারের সময় হাস্য-পরিহাস খাদ্য পরিপাকের সহায়তা করে।

১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্জ্-এর বিদূষক (নাম Brusquet) অ্যালবার ডিউকের সঙ্গে যখন ভোজসভায় আহার করছিলেন, তখন উক্ত বিদূষক ভোজের টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে বসে এবং কাঁচ ও রূপার জিনিস-পত্র-সমেত মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। সেই দৃশ্যের অবতারণায় হাসির হুল্লোড় পড়ে গিয়েছিল। ডিউক বিদূষককে বলেছিলেন, 'যে-সব জিনিস নিয়ে গড়িয়ে পড়লে সেগুলি সব তুমি নিয়ে যাও।'

রাজা প্রথম জেম্স (১৫৬৬-১৬২৫) যখন সলস্‌বেরিতে আসেন তখন স্থানীয় এক ভাঁড় সলস্‌বেরির গির্জার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে। রাজাকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য সে সেই উচ্চ চূড়া থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে তিন বার ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে পড়েছিল। সে মনে করেছিল, রাজা অনেক অর্থ পুরস্কার দেবেন। কিন্তু বেচারার ভাগ্যে ওসব কিছুই জোটেনি। রাজা তাকে লিখিত এক ফরমান দিয়েছিলেন এবং তার পরিবারবর্গের লোকেরা ইংলণ্ডের গির্জার চূড়ায় উঠতে পারবে, এ কথাও রাজা ফরমানে লিখেছিলেন।

বাকিংহামের ডিউক রাজা প্রথম চার্লস-এর সময়কার এক খর্বাকার ভাঁড়ের কাহিনীও রীতিমতো হাস্যোদ্দীপক। জেফ্রী হাড্‌সন নামক একজন ভাঁড় একটা বিরাট টার্কি মোরগের সঙ্গে অসি নিয়ে যুদ্ধ করেছিল। ভাঁড় সম্পর্কে এইরূপ দেশী ও বিদেশী বহু কাহিনী শোনা যায়।

সেকালে কবির দলে দু-একজন 'আহ্লাদে' থাকত। শুধু কবির দলে কেন, বাইজিদের নাচ-গানের আসরেও আহ্লাদে রঙ্গ-রস পরিবেশন করত। আহ্লাদে হঠাৎ আসরে দাঁড়িয়ে কবি অথবা বাইজিব মুখের সামনে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে ভাঁড়ামো শুরু করত। বাইজিদের সঙ্গে যে-সব আহ্লাদে থাকত তাদের বলা হত 'ভেড়ুয়া'। এরা বাইজিদের অন্নে প্রতিপালিত হত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পারস্য ভাষাব বকাঅলি গ্রন্থের কথা। এই গ্রন্থ অবলম্বনে পয়ারাদি নানা ছন্দে একখানি বাংলা পুস্তক রচিত হয়েছিল। সেই পুস্তকে[৪] 'ভেড়ুয়া'দের সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ আছে :

কোথাও মৃদঙ্গ বাজে বীণা মনোহরা।
স্থানে ২ সপ্তস্বরে বাজে সপ্তস্বরা॥
কালোয়াত কাওয়াল কথাকটপ্পাবাজ।
তম্বুরা ধরিয়া সবে দিতেছে আওয়াজ॥
দিল্লীওয়ালি বাই কত নাচে স্থানে স্থান।
ভেড়োগণ সঙ্গে রঙ্গে মারিতেছে তান॥
নানা তালে নাচিতেছে যতেক সুন্দরী।
খেমটা ছেক্কা কার্বা পোস্তা কাওয়ালি ঠুম্‌রি॥
খেলাং ২ বাটী ২ তবলার চাটি।
কোটি ২ নটী নাচে পরিধান সাটী॥

৪ উমাচরণ মিত্র তথা প্রাণকৃষ্ণ মিত্র বিরচিত গোলেবকাঅলি, ইং ১৮৩৮ সাল, দ্বিতীয় বার ছাপা (শ্রীরামপুর), পৃষ্ঠা ২৯

সঙের ছড়া ও গান

বাগবাজার

১

গঙ্গাবন্দনা

কলুষ বিনাশিনী গঙ্গে, হের গো অপাঙ্গে মা।
বিষ্ণুপদে উদ্ভব, শিরে ধরেন সদাশিব,
ব্রহ্মা কমণ্ডলে তব আবির্ভাব রঙ্গে ॥
পাতালেতে ভোগবতী, মহীতলে ভাগীরথী,
গোলোকে বিরজা খ্যাতি অসীমা তব মহিমা তরল-তরঙ্গে ॥
সগর রাজার বংশ, ব্রহ্মশাপে হইল ধ্বংস,
আপনি হলেন অবতংস, পরশি বারি গেল তরি,
সবংশে পাপাঙ্গে।
শতেক যোজন থেকে, যদি গঙ্গা বলে ডাকে,
বৈসে গিয়ে ব্রহ্মলোকে, তব কৃপাতে বিহরে দেবগণ সঙ্গে।
শুনি গো বেদের উক্তি, দরশনে পরশনে মুক্তি,
গঙ্গৈব পরমং গতি, খগদীনের আসন্নে যেন ঢেউ লাগে অঙ্গে ॥

কাঁসারীপাড়া

২

শকুন্তলা নাটকাবলম্বনে লিখিত

দুষ্মন্তের প্রতি শার্ঙ্গরবের উক্তি।

জয় জয় মহারাজ দুষ্মন্ত ভূপতি!
যশঃকীর্ত্তি, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি, ধর্ম্মে থাক মতি।
ধর্ম্মারণ্য-বাসী, পুণ্যরাশি, তপোধন—
মহর্ষি কণ্বের শিষ্য, আমরা দুজন ॥

অবধান, মহারাজ ! তাঁহার আরতি—
শকুন্তলা কন্যা ধন্যা—রূপগুণবতী—
তাঁরে না জা'নায়ে তোমা ক'রেছে বরণ।
তথাপি হ'য়েছে তাঁর প্রীতির কারণ ॥
চন্দ্র বিনা কুমুদীর অন্য কেবা পতি ?
সিন্ধু ছেড়ে তটিনী কি করে অন্য গতি ?
রাজকুল-রবি তুমি, ধন্য ধরা মাঝে।
তোমা ভিন্ন পদ্মিনী নারী কি অন্যে সাজে ?
কিন্তু বিবাহিতা কন্যা—পিত্রালয়ে বাস—
সুশীলা হইলে তবু লোকে উপহাস !
এই হেতু রাজগৃহে, তাঁর অভিসার !
(সস্নেহে শকুন্তলার হস্ত ধরিয়া)
এই লহ, মহারাজ ! মহিষী তোমার।

দুষ্মন্তের উক্তি।

মহর্ষি কণ্বের পদে প্রণতি আমার।
কিন্তু হায়, এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার !
কনকবরণী এই রমণী রতন !
ইঁহাতে আমাতে কভু নাহি দরশন !
পরিণয় দূরে থা'ক, পরিচয় নাই—
স্মৃতি-পথে অন্বেষিয়া কিছুতে না পাই।

শার্ঙ্গরবের সকোপ উক্তি।

ধর্ম্মাধিকরণে তুমি ধর্ম্মরক্ষা হেতু—
অধর্ম্ম-প্রবাহ-মাঝে তুমি ধর্ম্ম-সেতু !
অন্যায় করিলে কেহ, তুমি দণ্ডকারী।
এমন অন্যায় কেন কহ দণ্ডধারি ?

গৌতমী শকুন্তলার প্রতি।

এস, বৎসে ! কুতুহলে, আবরণ মুক্ত হ'লে,
চিনিতে পারিবেন মহারাজ।

(অবগুণ্ঠন মোচন করিতে করিতে)

মুখ-চন্দ্র দীপ্তকর, বৃথা লজ্জা পরিহর,
উৎসবে বিপদে নারী করিবে না লাজ।

(রাজা শকুন্তলার মুখ দেখিয়া হেঁটমুণ্ড)

সকোপে শার্ঙ্গরবের উক্তি।

কেন কেন, মহারাজ। মৌন হ'য়ে রহিলে ?
বল না, ছলনা ছাড়ি, চিনিতে তো পারিলে ?

দুষ্মন্তের উক্তি।

ছলনায় কিবা ফল— কুরুবংশে নাহি ছল—
সত্য বলি ঋষির কুমার।
(যেন স্বগত) হায়, হায়, কি বালাই, দেখা নাই, শুনা নাই,
লোকে বলে মহিষী তোমার।

শকুন্তলার প্রতি শারদ্বতের সকোপ উক্তি।

শুন, বালে ! যেই কালে, ক'রেছিলে মাল্যদান
না জেনে চরিত্র, চিত্ত-নাম শুনেই হতজ্ঞান।
এখন ভুঞ্জহ, পুঞ্জ স্বরোপিত বিষফল !
যা বলিতে হয় বল—বিলম্বে কি আর ফল ?

শকুন্তলার মৃদু উক্তি।

হা বিধাতঃ ! এই ছিল ললাট-লিখন !
সরলা-সরল মন, ভাবিয়া সরল জন, সঁপিলাম প্রাণ মন,
কে জানে যে সুধার্ণবে বিষের সৃজন !
অরণ্যের পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ এত !
ভাঙ্গিল স্বপন-ভুর, সব আশা হ'লো দূর, আপন অদৃষ্ট ক্রুর,
সাধিয়া কাঁদিয়া হব মিছা মান হত।

রাজার সরোষ উক্তি।

বরষায় প্রবাহিনী, নিজে হ'য়ে কলঙ্কিনী,
তীর-স্থির তরুশ্রেণী, করয়ে পাতন !

সেইরূপ ভাব তব— নাশিয়া নিজ গৌরব,
আমাকেও পাপ-পঙ্কে করিবে ক্ষেপণ !

৩

কৃষ্ণ-কালী বিষয়ে ছড়া

শুনিয়ে মুরলি-ধ্বনি, গৃহে হ'য়ে উদাসিনী,
বনে এলেন কমলিনী রাই।
কুটিলে তো দেখ্‌তে পেয়ে, কুটিল ভাবে অগ্নি ধেয়ে,
জানায় গিয়ে আয়ান ঘোষের ঠাঁই ; --
"শুন বলি ওগো দাদা ! --তোমায় তো বানিয়েছে গাধা—
হারামজাদা বৌ এমন দেখিনে ,
তোমার মাথায় ঘোল ঢালি, বনে নিয়ে বনমালী,
রসের খেলা খেলছে যে নির্জ্জনে !"

আয়ান বলে --"শোন কুটিলে, জানি রে তুই খুব কুটিলে---
দিন্‌রা'ত্‌ সুধু কুটিল্ তত্ত্বে ফিরিস্,
কথায় কথায় ধ'রে ছুতো, খ্যাতা ক্যাঁতা হাঁড়ির মত,
উঠতে ব'সতে বৌকে মন্দ করিস্ !
চল্ দেখি তোর্ সঙ্গে যাই— কথাই সুধু ভুল্‌বো নাই—
স্বচক্ষে আ'জ দেখ্‌তে চাই—সত্যি হয়তো রাধার মাথা খাব !
(আর) যদি হয় এ কথা মিছে, (তবে) মজা দেখতে পাবি পিছে---
যমের বাড়ী এখনি পাঠাব !"

এই ব'লে আয়ান কুটিলাকে সঙ্গে নিয়ে রেগে বেগে চ'ল্লেন-- জটিলাও পশ্চাৎ ধর্‌লেন ! দূর হ'তে তা দেখতে পেয়ে—(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি)

চেয়ে দেখ, বনমালি, হ'লো বিষম দায় ;—
আয়ান ঘোষের হাতে আ'জ্‌ প্রাণটা বুঝি যায়—
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিবাদী ননদী মোর্ বাঘিনী ;
ভাইকে নিয়ে আসছে ধেয়ে, উপায় কি শ্যাম গুণমণি ?

(এই বলিয়া গান— রাগিণী মুলতানী —তাল ঢিমা তেতালা)

হরি ! কি হ'লো দায়,—বাঁচি আ'জ কেমনে ?
মরি—ভয়ে মরি ! ঐ আ'স্‌ছে আয়ান্ দেখ বংশীবয়ান্ !
সঙ্গে জটিলে কুটিলে অরুণ-নয়নে ! ১ ।
গয়্‌লার্ ঘরের কেলে হোঁৎকা, হাতে ল'য়ে কোঁৎকা,
যমদূতের মতন্ আস্‌ছে হায় ;
যদি দেখিতে পায়, তোমার কাছে আমায়,
এই কুঞ্জবনে ;
তবে ছা'ড়্‌বে না, ছা'ড়্‌বে না, রা'খ্‌বে না জীবনে ! ২ ।

(তদুত্তরে কৃষ্ণের উক্তি)

শুন রাধে বিনোদিনি, চিন্তা কেন কর ধনি !
উপায় করিব আমি, হ'য়ো না উতলা ।
ব্রজে তুমি রাই কিশোরী, ছলেতে আয়ানের্ নারী,
গোলোকে গোলোকেশ্বরী, আপনি কমলা ।
তুমি প্রিয়ে আদ্যাশক্তি, ভব-ভয়ে কর মুক্তি,
আয়ানের কি আছে শক্তি, তোমায় ভয় দেখাতে ?
ত্যেজে রূপ-বনমালী, আমি হই কৃষ্ণ-কালী,
তুমি দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি, বৈসহ পূজিতে !
চূড়া খুলে হই মুক্তকেশী, বাঁশীকে এই করি অসি,
বনমালা মুণ্ডমালা হবে !
রবে না আয়ানের ভয়, তোমার হবে জয় জয়,
কুটিলের সব বড়াই ভেঙ্গে মুখটী পুড়ে যাবে !

(এই বলিয়া গীত—রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা)

চিন্তা কি রাই প্রাণ প্রেয়সি ! মুক্তকেশী সাজি আমি !
জবাফুলে, বিল্বদলে, শক্তিপূজা কর তুমি !
তুমি রাধে আদ্যাশক্তি, তব গুণে হব শক্তি,
জন্মিবে আয়ানের্ ভক্তি, ধন্য হবে ব্রজভূমি । ১ ।

(কৃষ্ণ ঐরূপে কালী হ'লেন—রাধা ঐরূপে পূজা কর্চ্ছেন দেখে কুটিলার প্রতি আয়ানের উক্তি)

এ তো দেখ্‌ছি, রাধা আমার, কালীপূজা ক'র্চ্ছে—
দিগম্বরীর রাঙা পদে, রাঙা জবা দিচ্ছে!
জপের মালা হাতে ক'রে ইষ্টদেবী জ'প্‌ছে;
(ওর) জপের গুণে আপ্‌নি দেবী প্রতিমায় ঐ দুল্‌ছে!
ও লাফানি! ও ঢলানি! ও কুটিলে রাঁড়ি!
আমার মা'গের সঙ্গে তোমার এত আড়াআড়ি!
ভাল কাজেও কুচ্ছ রটাস্‌—এত বাড়াবাড়ি!
ইচ্ছে করে, নখে ক'রে, আবাগি তোর পেট্‌টা চিরে,
ছিঁড়ে ফেলি নাড়ী!—
যে নাড়ীতে জন্মে এত নষ্টামির কাঁড়ি!
তুই কি চ'খের মাথা খেয়ে, আপ্‌নি দেখে গেলি?
না, কাণ্‌ দুটোর মাথা খেয়ে, কারোর্‌ মুখে শুন্‌লি?
তখন্‌ বা কি ব'ল্লি—এখন্‌ স্বচক্ষে কি দেখ্‌লি?
এখন্‌ কেন অমন্‌ করে, নাকে হাত দে, অবাক্‌ হয়ে রৈলি?

(এই বলিয়া গান—রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি)

কৈ লো কৈ কুটিলে কৈ—নন্দের্‌ বেটা কৈ?
প্রাণ্‌ প্রেয়সী রাধা আমার, মুক্তকেশী পূজ্‌ছে ঐ!
থেকে থেকে চ'ম্‌কে উঠিস্‌, কথায় কথায় বৌকে দুষিস্‌,
কালী দেখ্‌তে কালা দেখিস্‌, ও কালামুখি!
আমার ঘরের লোকেই ভ্যাংরা তুল্‌বে, তা পরে বলবে কি?
এই কোঁৎকা তোর মাথায় ভাঙি—নৈলে এ রাগ্‌ মেটে কৈ? ১।

দুর্জ্জয় মানে কৃষ্ণের সন্ন্যাস-গ্রহণ ভাবের ছড়া

(দূতীর উক্তি)

দেখ দেখ কমলিনী! কুঞ্জদ্বারে আসি,
দাঁড়ায়ে র'য়েছে এক নবীন সন্ন্যাসী;—
ত্রিশূল-ডম্বুর-ধরা; পরা বাঘ-ছাল;
ববম্‌ ববম্‌ ঘন বাজাইছে গাল;

ভাং ধুতুরার ঘোরে আঁখি ঢুল্ ঢুল্ ;
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি ; কর্ণে ধুতুরার ফুল !
"ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি" ধীরে ধীরে বলে—
আহা ! কথাগুলির ছলে যেন সুধারাশি গলে !

(আসিয়া দেখিয়া তদুত্তরে রাধার উক্তি)

আহা মরি প্রাণ সই, কেমন সন্ন্যাসী ঐ,
ওরে দেখে প্রাণ কেন কাঁদে ?
কি দেখালি হায় হায়, নয়ন ফিরানো দায়,
প্রাণেরে বাঁধিল প্রেম ফাঁদে !
এ গোকুলে শত শত, দেখেছি সন্ন্যাসী কত,
এর মত কে কোথা দেখেছে ?
আহা কি লাবণ্য ছটা, সজল জলদ ঘটা,
ছদ্ম-বেশ-ভস্মেতে ঢেকেছে !
আর কিবা মনোলোভা, বিমল বদন শোভা,
তাহে কাল-শশীর কিরণ !
আবার সখি দেখ আসি— আমি যাহা ভালবাসি—
বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা ভ্রু-নয়ন !
তাহে অতি খরশান, কুটিল কটাক্ষ-বাণ,
সন্ধান করিয়ে হরে প্রাণ !
এ যদি সন্ন্যাসী সই, কেন গো অধৈর্য্য হই ?
ভণ্ড যোগী করি অনুমান !
কে এলো কি ক'রে ছলা, হেরে হ'তেছি চঞ্চলা—
অঙ্গ মোর অবশ হইল—
ঘরে ফিরে যেতে চাই, পথ না দেখিতে পাই—
এ কি সখি বিপদ ঘটিল !
যে হ'ক সে হ'ক সখি, সুধাইয়ে দেখ দেখি,
কি মনে সে এখানে এসেছে ?
কেনই বা গৃহত্যাগী, কি লাগি হ'য়ে বিবাগী,
এ নবীন বয়সে সে এ যোগী সেজেছে ?

প'ড়েছি তো বিষম্ ফেরে, অন্নের নাহিক এরে—
যা চাবে সই তাই এরে দিব—
কুল মান প্রাণ মন, জীবন যৌবন ধন—
জিজ্ঞাস গো কি দিয়ে তুষিব ?

(এই বলিয়া গান)

বল বল, প্রাণসখি, হ'লো কি আমার্—আকুল্ হৃদয়্ হায়্
যোগী বেশে কে এসে আ'জ, আমার্ মন হ'রে ল'য়ে যায়্ ?
একে কালা-কলঙ্কিনী, (আমার্) নাম্ রেখেছে ননদিনী,
এখন্ আবার্ সন্ন্যাসিনী, (বুঝি) হ'তেই বা হয়্
—একি দায়্ ! ১ ।

(সন্ন্যাসীর প্রতি দূতীর উক্তি)

প্রণতি করি গো পায়, সন্ন্যাসি ঠাকুর !
এ বয়সে এত ক্লেশ— অস্থি চর্ম্ম অবশেষ !
গৃহে কেন এত দ্বেষ ?
কাশী, কাঞ্চী কোন্ কোন্ দেশ, ভ্রমিয়াছ দেখিয়াছ
তীর্থ কত দূর ?
দীক্ষাগুরু কে তোমার— আশ্রম কোথায় তাঁর—
এ ভেকে ভিক্ষার দীক্ষা কে দিলে তোমায় ?
ঝুলি কক্ষে, ধারা চক্ষে, পদচিহ্ন ঢাকা বক্ষে,
যোগী হ'য়ে কি বাঁকা চক্ষে,
অমন্ ক'রে কু-কটাক্ষে, কুলবতীর কুল মজায় ?
কেন বা নগর গ্রাম ফেলে, শ্রীরাধার নিকুঞ্জে এলে !
এখানে তো ভিক্ষা দিবার যো যোজ নাই—
কেবল মোদের দেহ প্রাণ, আর আছে মানিনীর মান,
তা ছাড়া আর বাড়া কিছু খুঁজে তো না পাই !
এতে যদি থাকে ফল, তবে মনের কথা খুলে বল—
ব'লে হবে না নিষ্ফল—
যা চাবে তা পাবে ভিক্ষে, আজ্ঞে দিয়েছেন রাই !

(উত্তরে কৃষ্ণের উক্তি)

শুন দূতি, রসবতি, আমার পরিচয় ;—
মনের কথা, মর্শ্মের ব্যথা, ব'ল্‌তে ক'চ্ছি ভয় !
(কেন না) বড় মা'নুষের বৌ হ'য়ে কি ছোট কথায় থা'ক্‌বে ?
হতভাগার দুঃখের কথা, মন দিয়ে কি শুন্‌বে ?
এ বয়সে সন্ন্যাসী কেউ সাধ ক'রে কি হয় ?
প্যায়দায় সাজিয়েছে যোগী —আপন্ ইচ্ছায় নয় !
সংসার ক'র্ত্তে দায় দড়া সই নিত্যই লোকের হয় ,
কিন্তু, প্রেমের যেমন দায়, বুঝি কিছুর তেমন নয় !
সখি ! সেই প্রেম আমার দীক্ষা-গুরু পণ্ডিত গোঁসাই !
তিনিই আমার কাণে কাণে, খুব নির্জ্জনে—খুব সাবধানে,
ইষ্টদেবীর নাম ব'লেছেন—ব্রজেশ্বরী রাই !
রাধা-মন্ত্রে, রাধা-তন্ত্রে, গুরু দিয়েছেন দীক্ষে !
কাজে কাজেই ভেক্ নিয়ে সই, সেই নামেতেই ক'রে বেড়াই ভিক্ষে !
এই যে দেখ্‌ছো কাল্-ভুজঙ্গ, কাঁধে জড়িয়ে বই ;
রাই-নামের জোরে তার কামড়ে ভয় করিনে সই !
কিন্তু নামের জোরে, বাহ্য-সাপ্‌কে, অগ্রাহ্য যেমন ক'র্চ্ছি ;
তেম্নি মান্ ভুজঙ্গের বিষের জ্বালায়্ দিবানিশি জ্ব'ল্‌ছি—
তাতে জর জর, মর মর, চ'লে চ'লে প'ড়্‌ছি—
আর, শেষ কি হবে, সেই হতাশে, পুড়ে খুন হ'চ্ছি !
"সুধাদৃষ্টি" ঔষধ আছে, (তোমাদের) কমলিনীর কাছে ;
যদি সেই সুদৃষ্টিতে দৃষ্টি করেন, তবেই প্রাণটা বাঁচে !
যোগীর পক্ষে, চান্ সুচক্ষে, এই ভিক্ষাটী চাই ;
তবেই, জীবন পেয়ে জন্মের মতন চরণে বিকাই !

(এই বলিয়া গান)

মরি মরি সহচরি কি করি বল না ?
কে আছে আর কারে কই— যাতনা যত সই ?
তোমা বিনে কে বুঝিবে মরম-বেদনা ?
কাতরে মিনতি করি ছলনা ক'রো না ! ১ ।

সাধে কি সংসার-সুখ-সাধ ত্যেজিয়ে,
শ্মশানে মশানে ফিরি, সন্ন্যাসী হ'য়ে ?
দারুণ মান-দায়্,   যায়্ যায়্ প্রাণ যায়্,
কিশোরী-বিরহ-জ্বালা, আর তো সহে না !

(রাধার প্রতি বৃন্দার উক্তি)

বলি, শুন্‌লি তো গো রাই,   যা ভেবেছি তাই ;
কপট যোগী বলে কেবল মান ভিক্ষাটী চাই !
আর শরমে কাজ নাই—   আর গরবেও কাজ নাই—
পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ—সে বড় বালাই !
আপন মুখে ব'লেছ রাই,   যা চাবে দিবে গো তাই,
আর কি এখন ঘোম্‌টা টানা সাজে ?
কমল-বদন তোলো তোলো, মনের কপাট খোলো খোলো,
হৃদি সিংহাসনে ল'য়ে বসাও যোগীরাজে !
(যখন) সা'ধ্‌লে কাঁদ্‌লে পায়ে ধরে,
(তখন) চাইলিনেকো মানের ভরে,
এখন্ তো মান ভাংলে জোরে, সন্ন্যাসী গোঁসাই !
ধন্য শ্যামের নাগরালি   ধন্য ক'র্লে এই ঘটকালি,
সাবা'স বটে !   এক মুঠো ছাই গায়ে মেখে
মানের মুখে দিলে ছাই !
পোড়া বিচ্ছেদের বাদ ঘুচে গেল,   আমাদের সাধ পূর্ণ হ'লো,
কি আনন্দ আ'জ্ কুঞ্জধামে !
(তবে আর) মিছে বিলম্ব সৈতে নারি,   এস এস ব্রজেশ্বরী,
(আবার) কুঞ্জে ল'য়ে বংশীধারী,   দাঁড়াও তেম্নি ভঙ্গী করি,
(আমরা) জুড়াই নয়ন যুগল হেরি—রাই কিশোরী শ্যামের বামে !

(রাধার উক্তি—গান)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঢিমা তেতালা

চিনেছি চিনেছি সখি, এ তো যোগী নয়্ !
আমায়্ ছলে, মজালে ;   পেয়ে অবলা সরলা বালা,
ভুলায়ে মন্ হ'রে লয়্ !

সেধে কেঁদে যখন্ গেছে ;
তখন্ দুর্জ্জয় মান ভরে, চাইনিকো ফিরে তারে,
এখন্ অঙ্গে বিভূতি মেখে কর্ল্লে মানের্ পরাজয়্ ! ১ ।
গেল গেল—মান্ গেল !
বঁধুর এ দশা হেরি, আর কি রৈতে পারি ?
আমার কুল-শীল মান-প্রাণ, সঁপিলাম তায়্ সমুদয় ! ২ ।

(উভয়কে দাঁড় করাইয়া সখীদের গান)
রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়খেম্‌টা

মরি ! যুগল্ রূপে ভুবন ভুলায়্ ! নয়ন জুড়ায়্ !
শ্যামের বামে কমলিনী (যেন) মেঘে সৌদামিনী প্রায় !
দেখ গো কদম্বতলে, দাঁড়ায়েছে বামে হেলে,
বনমালা দোলে গলে (আহা) কিবা শোভা হ'লো তায়্ ! ১ ।

গান

(রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান)

হায় ! দেশের্ হ'লো কি ? —সব্ দেখি মেকি !
প্রবল্ ধলোর্ নকল শিখে, দুর্ব্বল্ কালোর্ বুজরুকি !
সেই, কালোর্ গায়্ ধলোর্ পোষাকে,
ময়ূর-পাখ্ যেন দাঁড়কাকে !
সেই, বিট্‌কেল্ জন্তু দেখে তাকে, বিজ্ঞলোকে হয় দুঃখী ! ১ ।
দেখে কেউ বা হাসে, কেউ বা দোষে, কেউ রোষে দেয় গালি !
ঘৃণায়্, কেউ বা ভাবে "মরণ্ আর্ কি"—কেউ বা দেয়্ হাততালি !
ও তার্, হাজার গুণ্ থাক্, তবু লোকের্ যায়্ না মনের্ কালী !
কালো পৈতৃক্-দলে এই তো গতিক্, ধলো পাড়াতেও ততোধিক্,
"ইম্পুডেন্ট ড্যাম্ নিগার নিক্—কিক্ হিম্ আউট" কয়্ রুকি ! ২ ।
এখন "ন্যাসন্যালটি" আর "লিবার্টি", কথায়্ কথায়্ কয়্ !
কিন্তু কাজের্ বেলা বিজাতী চা'ল্—স্বজা'ত্ ঠেলা রয়্ !

যাদের্ নকল্ করে, তাদের্ ঘরে এমন্ কি কেউ নয়্ ?
তোদের্ ! নেসন্ কৈ তার্ স্যাসন্তান্‌টি !—তোমরাই তো মজালি ঘরটা—
ভ্যাজাল্ দে খাঁটিকে মাটি, ক'র্লি রে ঘরের্ ঢেঁকি ! ৩।
রাজ্যে, রাজকীয় লিবার্টি খাঁটি, পাবার্ জো তো নাই !
কাজেই, সখ্‌টা তার্ মিটাবার পথটা, ঘরেই করা চাই !
অন্যে সবে না হাঁপ্, গরিব্ মা বাপ্, আছে ফেল্‌তে ছাই !
ও তাই, বুড়ো বাপ্-মার্ বুকে ঘাড়ে লিবার্টির নিশানটা গাড়ে।
তাদের্ সাধ্য নাই যে ঘাড়টা নাড়ে—স্নেহে হায়্ বাঁধা টিকি ! ৪।
সে তো, লিবার্টি নয়্, লাইসেন্স ঘোর, আর নেমক্‌হারামি !
আসল্ স্বেচ্ছাচার্, অত্যাচার্ সে সব্—ভণ্ডামি, ষণ্ডামি !
মা বাপ্ মর্ম্মে দহে, তবু সহে, কহে "বাছার এ পাগ্‌লামি !"
এক্‌বার্, ভাবে না কার্ অপার্ স্নেহে, মানুষ্ হ'লো বৈল দেহে ;
সেই মা বাপ্‌কে হায়্ কি মোহে, (জ্যান্তে) দহে নবা পাতকী ! ৫।
এখন্, গুরু লোক্‌কে গরু ভাবে, সমাজ্ ঘুঘু যারা !
ছুটো, বক্তিড়িতা ক'রেই ভাবে, (দেশের্) গ্যারিব্যাল্‌ডি তারা !
ধরে, নাম্ পেট্রিয়ট্, কাজে প্যারট্, পেটে স্বার্থ পোরা !
বাহ্য সভ্যতার্ মত্ততায়্ মাতি, বিদ্যার্ গাদায়্ ফুলিয়ে ছাতি,
কোলা ব্যাং যায়্ হ'তে হাতি, চাঁদ্ হতে চায়্ জোনাকি ! ৬।
আবার্, সমাজ্ শোধন্ আশা যাদের, (তাদের্) গতিক্ বাতিক্ প্রায়্—
কেবল্, অস্বাভাবিক্ নূতন এনে, (সাবেক) সব্ ঘুচাতে চায়্ !
ফাঁপা উন্নতির্ দাস্, ভড়ংবিলাস্ (নিরেট্) দলে না মিশ্ খায়্ !
দলে, জোটায়্ তাই সব্ অপোগণ্ড, (তথায়্) জ্যেঠা হয় তারা প্রচণ্ড,
তাদের্ ভবিষ্যৎ হায়্ ক'র্চ্ছে পণ্ড, (শিখে) ইঁচড়্‌পাকা চালাকি ! ৭।
দেখ্‌ছি ভালর্ মধ্যে ইন্দ্রিয়-দোষ্, নাইকো আর তেমন ;
এখন্, সত্য কথা কয়্ অনেকে ; জ্ঞান্-প্রচারেও দেয়্ মন ;
আর ঐ কেঁউ-বনে আর্ জ'ন্মে ক'জন্, ক'র্চ্ছেও হিত্‌সাধন্।
যদি, না রুখে নকলের্ ঝোঁকে, ভাল মন্দ তলিয়ে দেখে,
আর ভড়ঙের্ রং গায়্ না মাখে, (তবেই) জন্মভূমি হয়্ সুখী ! ৮।
সর্ব্ব ভক্ষ্যাভক্ষ্য মাদক্ পাতক (যদি) তার্ সাধক্ না হয়্ ;
[illegible]ধীন্, পরাধীন্ নয়্, (এইটা) বুঝে বসে রয়্ ;

রিপুর্ অধীন্, থাকাই অধীনতা, (যদি) তারে করে জয় ;
আর, বাক্য ছেড়ে ঐক্য ভরে, (যদি) জন্মভূমির্ কর্ম্ম করে ;
যেষ্ ছাড়ে দেশ-হিতের্ তরে ; (আহা !) তবেই তো গোল্
যায় চুকি ! ৯ ।

৬

বেদেনীর গান

রাগিণী বেহাগ্ড়া—তাল খেমটা

ভাঙা মন্ জোড়া দিতে, কার্ আছে আয়্ গো ছুটে !
বারমেসে আড়া-আড়ি, এক্ নিমিষে যাবে টুটে !
এম্নি মোর গাছ্ গাছ্ড়া, তেল্ পড়া আর্ ঝাড়ি ঝাড়া,
সতীন্ হ'য়ে ভাতার[১] ছাড়া, মরে বেটী মাথা কুটে !
এ অষুদ্ মোর ছুঁতে ছুঁতে, হুড়্কো বৌ[২] যায়্ আপ্নি শুতে,
বার-ফট্কা[৩] পুরুষ্ যারা, আঁচল্-ধরা[৪] হ'য়ে উঠে !

৭

গঙ্গাবন্দনা

(১২৯৩ সালে রচিত)

তেওট

তার মা তারিণি !
সুখদা, মোক্ষদা, জ্ঞানদা, ত্বং হি বরদা , ভক্তিপ্রদা,
মুক্তিপ্রদা, সুরধুনি !
ভাসি ভবার্ণবে, গো শিবে, কি হবে কিছুই না জানি ;
কেবল্, ভরসা চরণ্ তরী, গো জননি ! ১ ।

১ এখন এই শব্দ খুব কম ব্যবহৃত হলেও এককালে অন্দরকোণে ব্যবহৃত হত। সাধারণত অশিক্ষিত বা অনুন্নত শ্রেণীর উক্তিতে অথবা অবজ্ঞাসূচক মনোভাব প্রকাশে 'স্বামী'র পরিবর্তে প্রাচীন বাংলায় এই শব্দটি প্রচল ছিল।

২ যে-বউ শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চায় না, সুযোগ পেলেই বাপের বাড়ি যায়।

৩ লম্পট ৪ অনুগত, বাধ্য

শুনি পুরাণে কয়, শমন্ ভয় দমন্ হয়; সর্ব্ব পাপক্ষয়,
নাম্ নিলে মা!
আহা মহাপাপী, যত সন্তাপী, স্পর্শে যদ্যপি, তব বিমল্ জল্,
তবে তখনি সশরীরে অগ্নি মুক্তপ্রাণী! ২।
তব নীরে তীরে, সঙ্করে বিহরে, অথবা যে বাস করে,
যম-কিঙ্করে, রয় তার অন্তরে, সাধ্য কি স্পর্শিবে তারে?
তোমার্ অসীমা মহিমা মা আমি কিবা জানি? ৩।

(পঞ্চম সওয়ারি)

পঞ্চানন পঞ্চাননে গুণগানে মগন যখন্,
নারায়ণ্ তা করি শ্রবণ্, দ্রব হ'য়ে হ'লেন জীবন্,
সেই পাবন বারি মা তুমি আপনি! (ওমা ব্রহ্মময়ি!)

(ঝাঁপতাল)

ব্রহ্মকমণ্ডলু পূরি, রাখ্‌লেন্ করুণা জীবে করি,
তবে উরিলে শুভঙ্করি, তরঙ্গ ভঙ্গী ধরি!

(তেওট মেলতা)

কাল-ভয়-হরা, গো তারা, সারাৎসারা, ত্রিধারা রূপিণি!
দেহি অন্তিমে চরণে স্থান্ ওমা তরঙ্গিণি! ৪।

৮

গীত

(খাম্বাজ- চৌতাল)

ভজ রে মন ভূতনাথ, ভবভয় বারণং।
আদিদেব শূলপাণি, ত্রিপুরাসুর মারণং॥
পরিধান দৃঢ় বাঘছাল, লটাপট জটাজুট জাল,
কালরূপ কাল কাল, হাড়মাল ধারণং।
জলিত অনল চন্দ্রভাল, লোকনাথ লোকপাল,
দীনশরণ শিব দয়াল, সকল কলুষ হারণং।

অসিত রজত জিনিয়া রূপ, গঙ্গাধর ভূপ ভূপ,
গীত রসিক ভক্তি কূপ, চিরমঙ্গল কারণং।
ডিমি ডিমি ঘন ডমরু বোল, শৃঙ্গনাদ ঘোর রোল,
আধ নয়ন লোল, পাপিজন তারণং॥

৯

ছড়া

আজব শহর কল্‌কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
বলিহারি সভ্যতা॥
শহরে এক নূতন হুজুগ উঠেছে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই,
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা,
বঙ্গদর্শন এর নেতা।
এদের কথার মাত্রা অশ্লীলতা
সদা দেখ্‌তে পাই;
কারে বলে অশ্লীলতা
লেজ্‌ তুলে দেখা নাই।
যথা কাব্য লিখ্‌তে হালিকালি
ফোড়ন দিতে তেজপাতা॥
সস্তা দরে মস্ত নাম কিন্‌তে যত লোক,
এই সুযোগে তাদের সবার ফুটে গেল চোখ,
এরা লঙ্কাকাণ্ড কচ্চে বসে,
কীর্ত্তি রাখবার কি প্রথা।
সেদিন বাঙ্গালা ভাষার প্রধান প্রধান
কাব্য সকল লয়ে,
অশ্লীল বলে সে সব দিলে,
পাঠিয়ে যমালয়ে,
দেখ ভারতচন্দ্র পার পেল না,
অন্য কবির কি কথা।

কবিত্বের গন্ধ আর মায়া যদি থাক্‌তো দেশের প্রতি,
তবে দেশের গৌরব ভারতচন্দ্রের কর্তেন না এ গতি ;
এরা ইংরেজিতে পণ্ডিত ভারী, কাব্যদেবীর হন সতা ॥
সেদিন দেখ, থিয়েটরের যত দল বলে,
মারপিট কোরে জেলে দিলে, তাদের সকলে,
মরি আনন্দেতে 'মিরর' হোসেন,
ব্রহ্মজ্ঞানের কি কেতা।
বৎসরান্তে একটি দিন কাঁসারীরা যত,
নেচে-কুঁদে বেড়ায় সুখে, দেখে লোক কত ;
এতে গরীব লোকের আমোদ বড়, সভ্যতার মাথা ব্যথা ॥
বিম্বানেতে বিম্বানীতে আমোদ বড় পায়।
সামান্ত লোক নাচলে কুঁদলে আমোদ বড় তায়,
ছেলেপিলের সং দেখিতে আমোদ বড়,
বুড়োর কেবল ফাঁস কথা।
তাড়াতাড়ি কাগজে লিখে, বরার দেজ ধোরে।
বড় ইচ্ছা ছিল দেবেন পাস বন্ধ কোরে,
এখন দিগ্‌গজেরা রৈলেন কোথা,
রৈল কোথা ক্ষমতা।
গরীবের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে এরা ভাই,
ইংরেজদের কাছে কেমন দেখাচ্ছে বড়াই,
যদি নিজের লেজে পা-পড়িত,
দেখতে তবে বীরত্তা।
এত ভদ্রলোকের বাটীর সমুখে
যার যে যোরা যাই,
এতে খুশি বৈ ত বেজার মুখ,
কারো দেখি নাই।
যত মেয়ে-মদ্দে আমোদ করে,
বরফ দেবার কি কেতা।
যদি ইহা এত মন্দ
মনে ভেবে থাক,

নিজের মাগকে চাবি দিয়ে
বন্ধ কোরে রাখ,
জানি, সভ্যদের হয়ে স্বাধীন মেয়ে,
উঠিয়ে দেবে সভ্যতা।
এদের যদি বুদ্ধিশুদ্ধি
কাণ্ডজ্ঞান থাকে,
ঘরের ঢেঁকি—কুমীর এরা,
বুঝাই আর কাকে,
মোদের পালজী সদা সুখে থাকুন,
এদের মুখে বিশ জুতা॥

১০

গীত

আমরি কি নাকাল, কন্যার বিবাহ কাল,
আজ কাল হচ্ছে বঙ্গদেশেতে।
মাতৃদায় পিতৃদায়, এর আগে লাগে কোথায়,
ভিটে মাটি চাটি হয় বিয়ের ব্যয়েতে।
(কত শত মানীর হতেছে মান হানি,
ছাই চাপা পড়ে গেছে মানের মূলেতে।)
বল্লালি বাঁধা কুল, প্রায় হ'ল নির্ম্মূল,
বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, সুরু যে হ'তে।
এণ্ট্রান্স এক পেশে, এলে দো পেশে,
তে পেশে, মান্য ভারতে।
বল্লভি সর্ব্বানন্দ, ফুলে খড়দহ হয় না সন্ধ,
পাশ করা ছেলে পছন্দ, সকল মেলেতে।
কন্যা দিতে হন ব্যস্ত, অর্থ নাই শূন্য হস্ত,
হইয়ে ঋণগ্রস্ত পড়েন দায়েতে॥

১১

বারোয়ারি

ওস্তাদি সুরে খেম্‌সা

মহড়া

হদ্দ সব্‌ মন্দ বটে, বেহদ্দ কীর্ত্তি উড়িয়েছে!
দেখে, লম্ফ-ঝম্প, বহ্বারম্ভ, কেউ কাঁপ্‌ছে, কেউ হা'সতেছে!
এদের্‌, দাপটে চৌচাপটে, গাঁথান্‌ তোল্‌পাড় হ'তেছে!
কলি যেন উল্টে গিয়ে, ত্রেতা যুগ্‌ পা'ল্‌টে এসেছে!
তুল্‌তে মাথটের্‌ টঙ্কা, শুন্তে পাই যে জোর্‌ ডঙ্কা,
গাঁয়্‌ যেন লঙ্কা দাহর্‌ শঙ্কা ঘ'টেছে!
লোকের্‌ ফল পাকড়্‌, খড়্‌-বাঁশ্‌ দড়িতেও বর্গির্‌ হেঙ্গাম্‌ প'ড়েছে!

চিতেন

জুটে বার-ভূতে বারোয়ারি ঠাকুর্‌ তুলেছে!
গাঁয়ে, প্রচণ্ড এক লণ্ড-ভণ্ড, দোর্দ্দণ্ড কাণ্ড বাঁধিয়েছে!
দুপুরে মাতনের মতন্‌ গুণ্ডা সব্‌ মেতে উঠেছে!
ছ্যাচারাম্‌ বোঁচার্‌ সনে, ছিছিদাস্‌ ধিক-জীবনে,
বণ্ডাচাঁদ্‌ মণ্ডামারা পাণ্ডা সেজেছে!
পূজা না হ'তেই মা উগ্রচণ্ডা এদের ঘাড়ে চেপেছে!

অন্তরা

কিবা, মাঠ্‌ঘেরা কাঠ্‌গড়ায়্‌, বেড়ায়্‌, আখড়া বেঁধেছে!
ঠাকুর্‌ ঘরেও কুকুর্‌ ঢুক্‌তেছে!
কিবা, বাঁশের মাচান্‌ বেঞ্চ হ'য়েছে; মাথায় ঝুলঝুলে
পা'ল ঝুল্‌তেছে!

পরচিতেন

আসল্‌ পূজার ফর্দ্দ, যে বরাদ্দ, কার্‌ সাধ্য বলা?
কিবা নৈবেদ্য তিন বুরুল উঁচু, উপাচার্‌ প্রধান তায়্‌ কলা!
রোগ্‌ থেকে মা উঠে বুঝি এসেছেন্‌ খেতে এই পূজা!
শুন্‌রা ভোগ্‌ তাইতে হেন, ঘৃতহীন্‌ পথ্য যেন,

আতেলা নইলে কেন, কাঁচ্‌কলা ভাজা ?
ও তায় অর্দ্ধাশন্ গোচ্, খাইয়ে পাঁচজন্, ব্রাহ্মণভোজন সেরেছে !

পর-অন্তরা

ও সব্ সাত্বিক্ কাজে, মন কি মজে, ব্যয় সাজে কি তায় ?
এরা, বাজে খরচ্ বলে তায়্ ! বলে, এ কি পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধদায়্ ?
বারোয়ারির্ মানেই মজা, হায়্ ! কেবল আমোদ্ গড়ায় তার্ তলায়্ !
ও তাই, যষ্ঠী রত্নী পেত্নীর্ তয়্‌ফায়, খেমটা নাচিয়েছে !
তেম্নি যাত্রা কবি, নক্সা ছবি, আজ্‌গুবি আচ্ছা দেখিয়েছে !
বিদ্‌ঘুটে সোরত্ রটিয়ে, বিদ্‌ঘুটে ছর্‌কট ঘটিয়েছে !
চুণ্ কালি ঢলাঢলি, লাভ হলো গালি,
দশ্ মাসের্ গর্ভে, খালি বাতাস্ স'রেছে !
ঘরো ঝক্‌ড়ার যাত্রায়্ পুরো মাত্রায়্,
গঙ্গাযাত্রা শেষ্ হ'য়েছে !

১২

নগর সংকীর্তন—উদ্ধব সংবাদ

(তেওট—মহড়া)

উদ্ধব ! কি দেখ্‌তে ব্রজেতে আর্ এলে এখন্ ।
মধুর বৃন্দাবন্, বঁধু বিনা, সুধুই বন্ !
দেখ, স্বচক্ষে সবাকার্, শবাকার ; অনিবার, হাহাকার !
শ্যাম্-শশী বৈ, গোকুল্ অন্ধকার !
(কেবল) পেয়ে নয়ন্-জল্, প্রবল্ যমুনার্ জীবন্ !

(ঐ—খাদ)

রাখালগণ ঐ, যেন শ্রান্ত, ভ্রান্ত, নিতান্ত মগন !

(ঐ—ফুকা)

উঠে প্রভাতে সব্, মথুরার্ পথ্ যায় ; ডাকে উভরায়্,—
আয়্ রে কানাই আয়্,—অনেক দিন্ দেখিনি তোমায়্,—
ও তাই, একবার না দেখা দিলে প্রাণ্ যে যায় !

(তেওট—মেলতা)

বেণুর্ রব্ বিনা, চরে না আর্ ধেনুগণ !

(দশকুশি—ঝুকা)

শোকে বৃদ্ধ হ'ল, অকালে নন্দ ; মা যশোদা কেঁদে অন্ধ, হে !
গোপব্রজ সবে নিরানন্দ ! গোকুল্ নিরুৎসব, আর নীরব্ দেখ হে !

(একতালা—ঐ)

কিশোরী কনক-লতা ; শুখালো তাপে সে রাজ-সুতা !
কৃষ্ণ-বিরহ-তাপিতা, (উদ্ধব্ হে ! রাধার্ দশা একবার্
চক্ষে দেখে যাও !—
বিধুমুখী রাধা, আর্ সে রাধা নাই !) কৃষ্ণ-বিরহ-তাপিতা,
চাতকী তৃষিতা, সে জলদ বিনা জুড়াবে কোথা ?

(ছুটকিলে—ঐ)

যে আগুন্ তার্ হৃদে জ্বলে, জলে দ্বিগুণ্ জ্বলে—
সে তো জুড়াবার নয় !
ক্ষণে চৈতন্য হারায়ে রয়্ ধরায়্, ক্ষণে চেতন্ পায়্,
"কৃষ্ণ কৈ ?" বলে !

(তেওট—মেলতা)

কৃষ্ণ-প্রেমাকুল্ এ গোকুলে, পশু-নর্, পক্ষীকুলে,
সকলে—বুঝি সমূলে দগ্ধ হয়্ ব্রজ-ভুবন্ !

ত্রিবেণী

১৩

ওস্তাদি সুরে খেম্‌টা

মহড়া ।

সাচ্চা কুলীনের্ বাচ্ছা, আচ্ছা মান্ রা'খলে তাই কুলের !
ছিল, বাকী যেটুক্, হ'লো সেটুক্, দেশে দশে গেল টের্ !
হায়্, হায়্, সূর্য্যের গায়্ ছেপ্ ফেল্‌তে, এদের্ নিজের্ মুখেই
প'ড্‌লো ফের্ !

পরের যাত্রা ভাংতে বাছা, আপনার নাক্ ক'রেছেন বোঁচা!
কেঁচোর্ চার্ খুঁড়্‌তে গিয়ে, বেরুলো সাপ ফুঁস্কিয়ে,
তার্ বিষে ছট্‌ফটিয়ে, ভার্ এখন বাঁচা!
এখন্ কল্‌সী দড়ি আঘাটা বৈ,
উপায়্ আর্ দেখিনে এর্!

চিতেন।

সেদিন্ এজ্‌লাসে বেহায়া-চন্দ্র, আর্জি দিয়েছে;
তাদের্ অন্দরে আসামী ঢুকে, ঘরের্ বে-আবরু ক'রেছে!
এক্তারের্ লোক্ কলঙ্ক, নালিসের্ মোক্তার্ হ'য়েছে।
ও'ছারাম্, ছোঁচা পাজি, তুচ্ছদাস্ ধিক্ বাবাজী,
এরা সব্ সাজস্ সাজি, সাক্ষ্য দিয়েছে।
হ'লো দাদীর্ সঙ্গে বাদীর্ হাজত্, হুকুম্ জারি হজুরের!

অন্তরা।

এই সব চুলোচুলি, ঠুলোঠুলি, ঢলাঢলি গাঁয়,
কেবল দলাদলি এর্ গোড়ায়্, আছে হায়্, দুই পাড়ায়্!
কিন্তু ফুলের্ দলেই ফুলের ভাগ বেশী!
যেতে যায় যেন ঠিক ভূতে পায়,
জ্ঞান্ হারায়্, গায়্ জ্বালায়।

পর-চিতেন।

কুলীন্ তোম্‌রা এঁড়ে, মৌলিক* বেঁড়ে, দুদল্ দুপাড়ায়্!
এঁড়ে, ল্যাজের্ গ্যাদায়্ হুম্‌রে বেড়ায়্, তেড়ে তাই বেঁড়ের পাড়ায়্ যায়!

* প্রায় একশো বছর আগে ত্রিবেণীর কাছাকাছি কোন দুটি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড-ভাবে দলাদলি চলছিল। দুই গ্রামের মধ্যে এক গ্রামের অধিবাসীরা মৌলিক নামে পরিচিত ছিলেন, আর-একটি গ্রামকে বলা হত কুলীনদের গ্রাম। সেই সময় এই দুটি গ্রামেই বারোয়ারি পুজো হত। বারোয়ারি পুজোয় এক গ্রামের কর্মকর্তারা অন্য গ্রামের বারোয়ারির কর্মকর্তাদের টেক্কা দেবার চেষ্টা করতেন এবং এই নিয়ে দুই গ্রামের মধ্যে বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছিল। প্রতিমা বিসর্জনের দিন সঙ বের হত, আর সেই উপলক্ষে দুই দলের মধ্যে লাঠালাঠিও হত মাঝে-মাঝে। এক বছর এইরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরে কুলীনরা মৌলিকদের নামে এই বলে নালিশ করেন যে, অমুক-অমুক ব্যক্তি তাঁদের অন্দরে ঢুকে বে-আবরু করেছে। তারপর আদালতে মামলা চলেছিল অনেক দিন এবং এই ঘটনাটি নিয়ে ত্রিবেণীর সঙের মিছিলেও গান গাওয়া হয়েছিল।

বারোয়ারি উপলক্ষ, রণ্-দক্ষ দু-পক্ষই সমান্!
ওর মধ্যে কিছু নরম্, বেঁড়েরা সভ্য রকম্,
এঁড়েদের মেজাজ্ গরম, শরম্ তো নির্ব্বাণ!
বেঁড়ে, যেমন ঠাণ্ডা, লুচি মণ্ডা, পূজায়্ তেম্নি জোগায়্ ঢের!

পর-অন্তরা।

এঁড়ের্ পুজোর ঘটা ভেড়া পাঁটা, মহিষ্ কাটা শেষ্!
তখন্ বীর-মাতুনি ঘোর্ আবেশ্, অসুর বেশ, কাঁপায়্ দেশ!
(তায়্ আবার্) হয়, সুধা-চক্কর টক্কর্ দিয়ে বেশ!
পাড়ায়্, সবাই ভোলা বোম্-মহেশ! কেউ নিরেস্, নয় বিশেষ!

পর-পর চিতেন।

দেখে, চণ্ড-মুণ্ড-নাশিনী মার্ মুণ্ড ঘুরে যায়!
মায়ের্ মুখ্খানি গ'ড়েছে তেম্নি, মা যেন কাঁ'দছেন্ ঐ জ্বালায়!
ভাসানেতে সং বেরুলো, তাও হ'লো তেম্নি জবড়জং!
মরি কি রঙের সং, বিলাতী নাচের ঢং,
না'চ্লো না সাহেব্ বিবি, ছিঁড়ে প'ড়লো টং!
তাতে, দুয়ো খেয়ে, ক্ষেপে-গিয়ে, ভাংলে গে সং বেঁড়েদের!

জেলেপাড়া

১৭

বেলফুলওয়ালা

(১৩২১ সালের আগেকার রচনা)

আমি বেলফুল ফেরি করি, ফিরি পাড়ায় পাড়ায়।
আমার ফুল পরলে পরে, যুবতীর প্রাণ জুড়ায়॥
যুবতীরা গলায় পরে, যুবকের পরাণ হরে।
তাই দেখ না তারা আমায় কত আদর করে॥
আমার দেখা পাবার আশে, বসে তারা জানালায় পা
আমার ফুলের মধুর বাসে, অরসিকের চিত্ত ভাসে॥

পয়সা যদি না থাকে ঘরে, নিয়ে যাও না আজকে ধারে।
আমার ধার কেউ রাখে না, শোধ দিও গো পরে॥

১৫

পানওয়ালী

তৃতীয় অবস্থা মোর জান গো সবাই।
প্রথম দ্বিতীয় সদা রসেতে কাটাই॥
ভ্রমরের মত কত, রসিক বঁধু এসে।
লুটিয়াছে অহরহ মধু হেসে হেসে॥
যৌবন গিয়াছে চলে নাই রস আর।
গিয়াছে সকল বঁধু হয়েছে পগার পার॥
জীবিকার উপায় এবে নাহিক সংস্থান।
পথের ধারে বসে তাই বিক্রী করি পান॥
কোথায় ছিলাম, কোথায় এলেম, কি করিনু হায়।
নিজের কপাল নিজেই খেয়েছি, পথে বসেছি তায়॥
কুল মান ত্যাগ করে, ছেড়ে স্বামীর বাড়ীঘর।
না আস্‌লে হায়, ভুগতে হতো না এম্‌নি নিরন্তর॥

১৬

বেদেনী

তোরা কে সারাবি বাত?
আমরা বেদেনী যত কোমর বেঁধে বাতের মারি জাত।
আজকালকার দিনে,
বাবুদের চলে না বাত বিনে,
বাবুরা এক একজন বাতের ওস্তাদ॥
কারো বাত শুধু ফাঁকা,
মুখে মারে লাখ-পঞ্চাশ, কাজে খাঁ খাঁ।

কারো আগা-গোড়া সব ঝুটো বাত,
আসল থেকে বহু তফাত ॥
কারো বাত তোতার মন,
শুনে যেমন, কপচায় সে তেমন ।
বুঝে না কোন কথা,
যা বলে তার নাইকো মাথা,
সমে ফাঁক তাল বেতালে, করে গো আঘাত,
আরো আছে কত বাত, কাজের বেলা কুপোকাত ।
ঐ সব বাত, এক ফুঁকে সারি
ফুঁয়ে যার সানে না, তাকে এই ঝাড়ু ঝাড়ি ।
এ ঝাড়ন নয় যেমন তেমন;
ঝাড়লে রোগ পালায় ছুটে সাত হাত ॥

১৭

বেদে-বেদেনী

কে সারাবি বাত, আমরা বেদেনী-বেদে,
বাতের মারি জাত ।
গেঁটে ঘুর-ঘুরে বাত, পাত করি নির্ঘাত ॥
(ওগো) লম্বে আড়ে,
পুব-পশ্চিমে, কিছুই যায় নাকো বাদ,
আমাদের যে আছে রস,
কোথায় লাগে আনারস,
সদা করে টস্‌টস্‌,
খেলে ফুর্তি দিন-রাত ।
ফুঁক-ফাঁকেতে পেত্নী ঝাড়ি,
ফয়েদা না হলে ঝাড়ু মারি,
এ ঝাড়ন নয় যেমন তেমন,
দু-চার ঘায়ে বাজি মাত ॥

১৮

পেকুড়িওয়ালা

আয় আয় কে নিবি তোরা গরম পেকুড়ি,
আহা আ মরি মরি।
আমি এই যত্ন করে, এনেছি গো তোদের তরে,
বেচি সব ঘরে ঘরে,
পয়সায় দু-কুড়ি ॥
লঙ্কা বাটা, খোসা ডালে,
টাটকা ভাজি, আগুন জ্বেলে,
পস্তাবি সব একবার খেলে,
রসে গাল ভরি ॥

১৯

হিজড়ের দলের গান

(প্রায় শতবর্ষ পূর্বেকার রচনা)

(তোরা) সোনার খোকা পেলি কোলে নব-যুবতী।
বর্ষে বর্ষে আল্লার দোয়ায় হবি পোয়াতি ॥
আল্লা দোয়া করেছে, তাই হিজরা এসেছে,
হাততালি দিয়া নাচি হিলায়ে ছাতি ॥
খোকার বাপ থাকুক বেঁচে, আশীর্ব্বাদ করছি নেচে,
কোলেতে চাঁদ পেয়েছে এই ভাগ্যবতী ॥
ধুনতা ধুনা ধুনা, ধিনতা ধিনা ধিনা,
খোকাকে চোখা না মেনা, নোবো আর সোনা দানা
উড়ানি ধুতি।
এর পর আর এক ছেলে, যবে তুই পাবি কোলে,
আসবো মোরা হেলে দুলে সধবা সতী ॥
দে না লো টাকা কড়ি, সিন্দুর হাতে চুড়ি,
নাচি লো তোদের বাড়ী হিলায়ে ছাতি ॥

তোর খোকা ছিরি ছাঁদ, যেন আসমানের চাঁদ,
সংসারে পাতলি ফাঁদ দেখ্‌ছি সম্প্রতি ॥
হিজরাকে না দিলে ভেট, তোর তাতারের হবে পেট,
নাম রাখবো জগৎ শেঠ দশ ক্রোরপতি ॥*

২০

গোলাপজামওয়ালা

(১৩২১ সালের আগেকার রচনা)

কে নিবি, চাই সাধের গোলাপজাম ?
ফেরি করি দেশ-বিদেশে, জেলেপাড়ায় ধাম ।
আমার জাম মনোহরা, ছুঁড়ি-বুড়ি নিচ্ছে ছোঁড়া,
বেচি আমি পয়সায় জোড়া,
বেশী নয়কো দাম ॥
আমার এ জামের বশে,
অরসিকের মন রসে ।
একবার নিলে, আবার আসে,
করে কত নাম ॥
দাঁড়িয়ে আছ অনেক জনে,
দু-চার পয়সা নাও না কিনে ।
খেলে পরে শখের প্রাণে,
হবে গো আরাম ॥

২১

চুড়িওয়ালা

হাওড়া পোলের বালা, তোরা নে কুলবালা,
পরলে পরে রবে না তোর, বিরহ-জ্বালা ।

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সেকালে বহু যাত্রাগানের আসরে 'বিদ্যাসুন্দর পালা' হিজড়ার নাচ-গান দিয়ে শেষ করা হত ।

নামটি এর 'হাওড়া পুলে', প্যাক ভেঙ্গে এনেছি খুলে।
জেল্লা বাড়ে জলে ধুলে, ছাঁচেতে ঢালা॥
বোম্বায়ে হয় তৈয়ারী, বৎসরান্তে করি ফেরি,
আমি সাধ মিটাই সকলেরি, দিই নাকো টালা॥
করি কত কারিকুরি, এর ভিতর রং পুরি।
নইলে কে আছ হুস্তরি, পারে কোন শালা॥
পরাব ঠিক হাতের মাপে, বসে যাবে কাপে কাপে।
হবে না লো হাঁপে-ঝাঁপে, ঢিলে ঢালা॥
পরো যদি প্রাণ খুলে, আয়েশে মন যাবে ভুলে।
ভাঙ্গে না পরে শুলে, নয়তো গালা॥

২২

কাপ্তেনবাবুর গান

কাপ্তেনগিরি কি ঝকমারি!
কেঁদে কেঁদে শেষে চোখে পড়ে বারি।
পরিবারের অলঙ্কার, সেও হল ছারখার,
পয়সা বিনে এ সংসার শূন্য হেরি।
যত সব ইয়ার ছিল, এখন সব ছেড়ে গেল,
অসময়ে পর হল যাই বলিহারি।
প্রেম কি পরিপাটী, বোতল বোতল উড়লো খাঁটি,
ভিটে মাটি হল চাটি আহা মরি।
সব হল খোলা মালা, দিলুম আমি কান মোলা,
যেন করে নাকো কোনও শালা কাপ্তেনগিরি॥

২৩

গান

হলো ঘোর কলি কারে কি বল বলি।
সমাজ দিয়ে ছারে-খারে, সাহেব সাজে বাঙ্গালী॥

পমেটম সব দেয় চুলে।
তেলমাখা সব গেছে ভুলে॥
উচিত কথা সব বলতে গেলে,
বাবু গো, দিবেন আমায় গালাগালি।
সমাজ দিয়ে ছারে-খারে, সাহেব সাজে বাঙ্গালী॥

২৪

যৌবন বাহার টিপ

এ টিপ যৌবন বাহার ওলো অতি চমৎকার।
দেখতে বেশ পরতে আয়েশ রংটি খুব গুলজার॥
শুনতে নাম বড় তারিফ,
নামটি যৌবন বাহার টিপ,
জ্বলতে থাকে যেন প্রদীপ, টিপ কপালে সবার।
এ টিপ পরলে কপালে,
জ্বলতে থাকে চিরকালে,
একবার পরে দাঁড়ালে, মাণিক কোথা ছার॥
এ টিপ পরে এসে,
সাধ কর মনের আয়েশে,
থাকবে ঠিক সেই বয়সে, যেমন যৌবন যায়।
বিদ্যুৎ তার কোথায় লাগে,
চটক দেখে সেটা ভাগে,
টিপ জ্বলে রঙ্গরাগে, হীরেকে ধিক্‌কার॥
আছে টিপ নানারকম,
ছোট বড় দামে খুব কম,
ইজ্জতে বাড়ে সম্ভ্রম, সকল অবলার॥
পড়া টিপ আছে দামী,
বিগড়ে যায় যাহার স্বামী,
মেয়ে যায় বিপথগামী, বারফট্‌কা তাতার।

আমি টিপ ঘরে গড়ে,
দিয়ে যাব নাম পড়ে,
রেখে দাও থাক জাঁকড়ে* দিয়ে যাই ধার ॥
পরে টিপ ভালবেসে,
কাছে ঘেঁষে হেসে হেসে,
থাকবে মনের আয়েশে, যৌবন টাইটদার ॥

২৫

কলির বাবাজী

(বাবাজী দিবসে যাত্রীদের প্রতি)

সর্ব্বনাশের মূলে জেনো কামিনী কাঞ্চন।
এই দুটি হইতে দূরে রাখিও সদা মন ॥
বৈরাগ্য নাহিক যার বৃথা ধ্যান ধর্ম্ম।
আসক্তি বাড়ায় জেনো সকল পাপ কর্ম্ম ॥
দিনকা বাঘিনী রাতকা মোহিনী কামিনী।
ঘন ঘন লহে চুষে সর্ব্ব অনর্থকারিণী ॥
জগতে সকল অনর্থ মূলে রয়েছে কাঞ্চন।
তবে কেন বৃথা তাহে এত আকিঞ্চন ?
সাধুসেবা দেবকার্য্যে সদা কর অর্থদান।
ভুঞ্জিবে অনন্ত শান্তি লভিবে কল্যাণ ॥

(বাবাজী—রাত্রে চেলাদের সাহায্যে কামিনী লাভ করে)

হে কামিনী! তুমিই সৃষ্টির অমূল্য রতন।
ধন্যবাদ (তাঁরে) যে তোমায় করেছে সৃজন ॥
তুমি না থাকিলে হতো জগৎ অসার।
আমার আস্তানা হতো দিবসে অন্ধকার ॥
কৌমার্য্য সন্ন্যাস ব্রত সকলই ভণ্ডামি।
এ শুধু পেতেছি ফাঁদ, তব তরে আমি ॥

* জাঁকড়ে=কেনা জিনিস পছন্দ না হলে ফেরত দেবার শর্ত

সুন্দরি ! পড়েছ ধরা কেন যাও দূরে ?
আমার আখড়া জেনো শুধু তব তরে ॥
কাঞ্চন সংগ্রহ করি তব সুখ আশে।
সহ অর্থ লহ প্রাণ, যাও প্রেমে ভেসে ॥

২৬

জকির ছড়া

দিস্ অষ্ট্রেলিয়ান হর্স মাইরি বলছি,
আনতে ইণ্ডিয়ায় ভেরি কেয়ারফুলি,
আনিবারে নাইন থাউজেণ্ড রুপিস্ ব্যয়,
'দি কিং অফ্ বার্ড' নামটি ঘোড়ার,
এয়ারেতে চলে।
'চাইনিস্-ওয়াল-জাম্পিং' অতি অবহেলে ॥
আমি বিলেতে গিয়ে,
আই, সি, এস, পাস দিয়ে
টাইটেল পেয়েছি 'জকি',
আমার এই হুইপের কাছে,
ঘোড়ার বাবা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে,
মানুষ তো ছার বা কি !
94 ঘোড়ার নম্বর,
রাখ জেনে-শুনে M. L. R.
নামটি আমার,
আমি থাকি······স্কট লেনে।
এই খেলার 'টিপস্' দিচ্ছি এবার বলে,
এই ঘোড়াতে ধরলে বাজি হারবে নাকো ভুলে।
একটি টাকা দিয়ে গেটপাস নিয়ে,
গ্যালারীতে বসে,
'ইস্পোটিং লাইফের' দেখবে টাইপ
চোখে চশমা কষে।

বলি যদি টাকা না থাকে,
···· ···· কাছে চাইলে, লোন্ পাবে।
(ইস্ট্যামপে সহি দিতে হুঁশিয়ার হয়ো তবে,
একটি জিরো পড়ে গেলে, দশগুণ হবে)
বলি যে খেলার প্রেমে গেছে জমে
খেলেছে একবার,
··· ··· . .
ভোর কপনি পরা সার,
বলি ঘর-দরজা বাঁধা দিয়ে রেসের খেলা খেলে।
দেনার জ্বালায় কোথায় পালায়, মাগ-ছেলেকে ফেলে,
কেহ বা হেরে এসে ঘরে ওয়াইফ্‌কে ধরে মারে।
টাকার শোকে মনের দুঃখে, হার্টফেল হয়ে মরে।
কেহ বা হেরে গড়ের মাঠে পড়ে গড়াগড়ি খায়,
তৃষার চোটে ছাতি ফাটে, পুকুরের জল খায়।
(এক পয়সার গাণ্ডারী জোটে না)
কেহ ভদ্রাসন করে পাটিসন,
ভাইকে ফাঁকি দিতে, ফাঁকি দিলে নিজে,
ফাঁক বুঝে না মনেতে।
আসছে সেই খেলার দিন,
সবাইকে খেলতে হবে ভাই,
আসতে যেতে হবে দেখা---
গুড্‌বাই, গুড্‌বাই ॥

২৭

গোয়ালিনী

আমি দুধের ব্যবসা করি হরি গোয়ালিনী।
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি আমি দিবস যামিনী ॥
আমার ভাণ্ড অফুরন্ত যতই বেচি ততই বাড়ে।
টাকায় দুই সের বিক্রী করি দিই নাকো ধারে ॥

আমার দুধ খুবই খাঁটি সেরে তিন পোয়া জল।
খেলে পরে পাবে সবাই সদ্য সদ্য ফল॥
মাথাধরা, সর্দিকাশি, কলেরা, আমাশয়।
আমার দুধের গুণে জেনো অনায়াসে হয়॥
দুই কুড়ি বয়স হয়েছে, তবু রাস্তা চলা দায়।
পাড়ার ছোঁড়া পিরিত করতে পেছন পেছন ধায়॥
আমার দুধের আর রূপের ওগো কি বর্ণিব গুণ।
আমার দুধ আর রূপ যে দেখে সে আস্ত হয় খুন॥

২৮

নেতাগিরি কি ঝকমারি

গিন্নি : এ কি দশা তোমার হলো, ডিগবাজি কেন খেলে?
যাও না কেন এখন আর সভা-সমিতি হলে?
বড় গলায় লেকচার দিয়ে ফাটায়েছ টাউন হল।
তোমার লেকচারে পাগল হতো দেশ-সেবকের দল॥
খবরের কাগজে তোমার সুনাম বাহির হতো কত।
এখন দেখ গালাগালি দিচ্ছে তারা শত॥
তোমার নাম করে যারা অনুভব করতো সুখ।
তোমায় দেখে এখন তারা ফিরায় কেন মুখ?
ঝি, চাকর, গোয়ালা-বৌ, মেথরাণীও হায়!
তোমার কথায় নাক-সিটকায় মরি গো ঘৃণায়॥
কলসী আছে, দড়ি আছে, ডুব, না হয় ঝুলো গাছে।
মুখ দেখাতে পারছি না আর হায় গো এদের কাছে॥

কর্তা : (গিন্নি) নামের জন্যেই করতাম আমি বুজরুকি গুজব।
নাম অর্থ পরমার্থ জেনো অভিনব॥
স্বার্থের তরে করতে নারি জগতে কিছুই নাই।
যা' চেয়েছি, তা' পেয়েছি, মান-সম্মান ছাই॥
এদের কথায় দুঃখ করো না, ওরা সব পাগল।
অর্থ ও নামের মত কিবা আছে বল?

২৯

কেরাণীবাবুর কি সর্বনাশ !
জীবিকায় লেগেছে বিষম ত্রাস !!

কেরাণীবাবুর উক্তি :

বি, এ, পাশ করে হায় পাঁচটা বছর ধরে।
ঘুরে মরলাম কত স্থানে চাকরীর উমেদারী করে॥
হাতে পায়ে ধরে শেষে জুটল তিরিশ মাসে।
চাকরীর কথা শুনে গিন্নী দুঃখের হাসি হাসে॥
বলে, পড়বার সময় আমার বাপের 'দশ হাজার' করেছ শ্রাদ্ধ।
সে দশ হাজার থাকলে হাতে, হতে আজি মন্দ॥
পঞ্চাশ টাকা মেসের খরচ লেগেছে তোমার মাসে।
এখন তিরিশ টাকায় বিশ জনার চালাবে বল কিসে?
ছেলে-মেয়ে ভাই-ভগ্নী, গিন্নী, বুড়ো-বুড়ি।
সবাই নিয়ে আমার ভাই, আছে জনা কুড়ি॥
দেড়টি টাকা জনের ভাগে পড়েছে মাসে হায়।
কি করিয়ে চল্‌বে এতে বল গো উপায়॥
শুধু মুন আর ভাত যদি দু-বেলা খেতে পাই।
তিরিশ টাকায় বিশটি প্রাণীর তাও যে হয় না ভাই॥
চাল মুন কয়লা তেল কেরাসিন দেশলাই।
কোনটার কথা বলি ভাই! কোনটা ছেড়ে যাই॥
(এখন) আমায় চিনি আর খেতে হবে না,
বন্ধ করলে চিনি আনা।
মিষ্টিমুখ করতে হলে চাটবো গিন্নীর মুখখানা॥

গ্রেজুয়েটের ডিম

(মশাই) পাসের মুখে মার ঝাড়ু সপাশ সপাশ,
এম, এ; বি, এ, পাস করে কাটছি সবাই ঘাস।

বাপ, শ্বশুরের টাকা দিয়ে বি, এল, পাস করে,
ঝাউতলায় ঘুরে ঘুরে উকিলের দল মরে।
কোর্টে মিলে না কড়ি, জুটছে নাকো ভাত,
তবু দেখ ল-কলেজের কেমন মৌতাত!
বি, এ, পাস করে অমনি বি, এল, পড়তে হবে,
বি, এল, পাস করে অমনি ঝাউতলাতে যাবে।
না মিল্‌লেও পয়সা তায়, কিবা আসে যায়?
উপোস করে মরবে তবু উকিল হতে চায়!
হল না আমার ওকালতি, গিন্নির ঝাঁটার দায়,
ছেলেপিলে উপোস করছে, ছাড়তে হল হায়।
(মশাই) গিন্নির খেংরার চোটে ঝাউতলা ছেড়ে,
'অ্যাপ্লিকেশন' হাতে করে ঘুরলাম দোরে দোরে।
কোন দুয়ার, হায়, 'মেরিট' বুঝলো না মোর,
ধন্য 'ইউনিভারসিটি' ধন্য 'ডিপ্লোমার' জোর।
(তাই) ঝকমারি ছেড়ে দিয়ে ধরেছি ডিমের ব্যবসা,
আমার থেকে নিও সবাই, 'গ্রেজুয়েটের ডিম' খাসা!
চা-ওয়ালা, হোটেল-ওয়ালা, রিফাইও ধোপা হয়ে,
শোভিতেছে 'গ্রেজুয়েট' দল এখন পেটের দায়ে।
শুনছি মোদের আর এক ভাই হয়েছে পানওয়ালা,
কালে কালে আরও শুনবে, কানে লাগবে তালা॥

(১৩২২ সাল থেকে ১৩৩৬ সালের রচনা)

৩১

বউটি ঠুঁটো জগন্নাথ।
বাগ্‌দী বাম্‌নী রাঁধছে ভাত॥

বামনীর উক্তি :

বাঁকুড়ো জেলায় বাড়ী আমার,
নামটি বাদলমণি।

ভাতার ছিল, গতর ছিল,
ছিনু ঘরের ঘরনী ॥
পানসি বুড়ে,* মিনসে মলো,
খুন্নু হাতের শাঁখা।
পুঁটলি খুলে দেখি পুঁজি
আছে পাঁচটি টাকা ॥
বরাত-বশে বর্ষা শেষে
বিউলো বুধি ব'লে গাই।
তার দুধের ধারা সুধার পারা,
দুয়ে ডাবা ডোবাতে ডোবাই ॥
তাই যোগে-যাগে যোগান দিয়ে,
একবেলা চাল জোটে।
সাঁঝে আমি বাজা মানুষ
মোটে জল দিই না ঠোঁটে ॥
পোড়োবাড়ী কোড়ে রাঁড়ী,
আমি আগলে থাকি একা।
বেয়াড়া ছোঁড়ারা পাড়ার
দিত মাঝে মাঝে দেখা ॥
সতী সাবিত্তীর চরিত্তির আমার
জানতো সকল পাড়া।
ঘোষ বৌয়ের ঘরে ঘেঁষ পেত না কেউ,
ঘোষাল-ঠাকুর ছাড়া।
(তিনি) হ'য়ে মনঃক্ষুন্নি দিলে মুন্নি
আমার পুণ্যি পেত লোপ।
(তাই) পরকালটা কন্নু পাকা
এড়িয়ে বামুন কাকার কোপ ॥
(ঠাকুর) দস্তুর মত শাস্তর ঘেঁটে
(আমায়) বুঝিয়ে দিলে মর্ম্ম।

* পানসি=ছোট নৌকা, বুড়ে=ডুবে

(করে) গুরুবরণ, বস্তর হরণ,
হয় চারটি পোয়া ধর্ম্ম ॥
কি জানি কোন তে-মাথায়
কবে কখন মাড়িয়েছিনু তুক।
তারি ফলে প্রসবকালে,
দেখনু গুরুপুত্তুরের মুখ।
মনে মনে বুঝনু শরীরে আর
নাইকো কোন পাপ।
বামুন কাকা হলেন পাকা,
আমার খোকার বাপ ॥
গুরু বলে পা পূজেছি,
করেছি খুড়ো বলে যত্ন।
পাশে শুয়ে ভালবেসেছি,
ভেবে হৃদয়রত্ন ॥
(পাড়ার) পাঁচ অভাগী ভাতার খাগী
এই ভাগ্যি ভাল দেখে।
আমার নষ্ট নাম রটিয়ে দিলে
যত থানা পুলিশ ডেকে ॥
দৈবযোগে ঘোষাল তখন
রোগের শয্যায় পড়ে।
কলকেতাতে আনলে আমায়
কেওড়াদের কড়ে ॥
কড়ে ছোঁড়া আসতো যেত,
বলতো আমায় মামী।
তখন কে জানতো বল,
কালে, তায়ে হবে স্বামী ॥
হাবড়ায় নেমে গঙ্গা নেয়ে
পৈতে নিলে কড়ে।
শিয়লে পাড়ায় ঘরটি ভাড়া,
নিনু গিয়ে জোড়ে ॥

কড়ে কেওড়া—'কালী ভট্‌চাজ',
টিকি ফোঁটার ঘটা।
গয়লার মেয়ে বামনি হলুম
'বামা' নামে রটা॥
বড় গেরস্ত দত্ত কায়স্থ
এ যে শ্যামবাজারে বাড়ী।
বার টাকার মাস মাইনে
নামাই তাদের ভাতের হাঁড়ী॥
দশুমীর রেতে খেতে পাই
দুটি আনা জলপানি।
সেই পয়সায় একাদশীর দিনে
আমি নোনা মাছ কিনি॥
দিনে আর খাই না পান, পরি থান্,
রাতে শাড়ী চুড়ি।
সাজলে-গুজলে এ বয়সেও আমায়
দেখায় যেন ছুঁড়ী॥
কেওড়া ভট্‌চাজ এক মাস আজ
গোলদীঘির ঐ ধারে।
খুলে পাঁউরুটির স্বদেশী কুটীর
চালাচ্ছে পশারে॥
জাতিভেদ উঠিয়ে দিয়ে যারা
দল বেঁধে ভাই আজ।
গয়লা-কেওড়া-বাম্‌নাই দেখে
হরি বোলে নাচ॥

৩২

বাবুর উক্তি

(ওগো) তাঁর গায়ে আগুনের আঁচ সয় না।
রান্নার নামে কান্না আসে চোখের জল রয় না॥

(আবার) তার উপরে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
ময়লা হয় যে গয়না।
(আহা) কেমন কাতর হয়ে আমার পানে
হানে দুটি নয়না॥
(ওগো) যাকে বুকে রাখি আদরে,
ক্ষুধা করা সুধা যার ঝরে অধরে,
তাকে বল কোন প্রাণে ধরে বলি ভাই
যাও হেঁসেল ঘরে,
তাতে যদি মোটে উন্থন না ধরে,
আগুন লাগে সবার জঠরে,
(সেও ভাল, সেও ভাল) তবু পতি হয়ে সতীকে
আমি দিতে পারি না কষ্ট।
ভাল মন্দ যে যা ভাবে আমি বলে দিলাম স্পষ্ট॥
দেখে যাঁর বদন করেছি চরিত্তির শোধন।
আমি যার প্রেম গোয়ালের গোধন॥
যার জন্যে বন্ধ বাড়ীর বোধন।
দেখি চোদ্দ ভুবন অন্ধকার কল্লে তিনি রোদন॥
তিনি আমার ইষ্টি, পুষছি তাঁর গুষ্টি—
শালী, শালাজ, শাশুড়ী।
চাক্‌রি খেয়ে বেচে ঘুঁটে কাটায় দিন,
আমার মাসী, পিসী, মা, খুড়ী॥
তাঁর উল বুনতে ফোঁড় গুণতে
হাতে ধরে খাল।
পানটি চিবিয়ে খেয়ে বাছার (শ্রীবিষ্ণু) প্রিয়ার
গাল দুটি হয় লাল॥
যাঁর চুলের রাশি আমার কাশী
বদন বৃন্দাবন।
বক্ষ জুড়ি পড়ে আছে গিরি গোবর্দ্ধন॥
যাঁর বেণীঘাটে মুড়িয়ে মাথা ডুব দিলে পরে।
আন্তশ্রাদ্ধর আগেই আমার চোদ্দপুরুষ তরে॥

তাঁরি তরে ঘুরে ঘুরে উড়েপাড়া আর বাড়ীওলীর বাড়ী।
আমি শেষে সেধে ধোবে আনি জলতোলা ভারি,
আর গুড়ুক-টানা রাড়ী॥
অজাতের ভাতে-পাতে যায় না তো ভাই জাত।
মাগ যে এখন মাথার পাগ ঠুঁটো জগন্নাথ॥
পত্নীধর্ম্ম পত্নীস্বর্গ পত্নীহি পরমন্তপঃ।
পত্নীস্য দাস্য ভাবাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

৩৩

গান

কনের বোয়ের গতর গেছে,
এখন কাতর তারা কাজে।
জল-গেলাসটি এগিয়ে দিতে শঙ্কা সবার,
লঙ্কা কথার ঝাঁজে॥
কেউ এলো চুলে, ঢেউ তুলে, নভেল খুলে বসেন,
কেউ মিষ্টি মিষ্টি চিঠি লিখে, ইষ্টি রসে রসেন,
কারো কোমল স্বরে মধু ঝরে,
ঘরে হারমোনিয়া বাজে॥
কারো কচি ছেলের ঠোঁটে, দুধ জুটে না মোটে,
বিকিয়ে আছে মাথার চুল বাজার-দেনার চোটে,
তবু জাঁক ফলাতে পাকশালাতে মুচি ঠাকুর,
তেলে লুচি ভাজে॥
এখন মনিব বাড়ী ছেড়ে পাড়ী দিয়ে ঝিয়ের দল।
খোলার ঘরে খিল্‌টি এঁটে বাজায় গিল্‌টি-করা মল॥
রাঁধাবাড়া ছেড়ে বামনি পাছাপেড়ের সাজে।
মাথার ফুলের খোপা বুনে খোলে জলাঞ্জলি লাজে॥

৩৪

ধাপে ধাপে ভিন্ন ভঙ্গী।
ব্রাহ্মণ বংশে টেঁশ-ফিরিঙ্গী॥

Showmanএর উক্তি :

আমি খুলেছি এক Exhibition,
দেখাতে বাংলা Nation,
Generationএর পর Generation,
কেমন পাচ্ছে Promotion,
হচ্ছে নূতন Nation, নূতন Fashion,
পায়ে Dawson, মোটরে Motion,
ধুতি চাদর আর পায় না আদর,
চাঁদনি এদানি সাজায় বাঁদর,
অন্দরেতে অন্ধকার Electric সদরে।
দুঃখের মধ্যে নিত্তি Ration জুটে নাকো উদরে॥

দেখুন সবাই চোখ মেলে।
একটি বামুন বসে সেকেলে॥

(১)

(ইনি) বিজ্ঞান মণ্ডিত, পরম পণ্ডিত,
মুণ্ডিত মুণ্ড, শিরে শিখাধারী।
উপাস্য ভাস্য, নস্যের দাস্য,
শিষ্য পোষ্য, হবিষ্য আহারী॥
গৈরিক বসন, কুশের আসন,
যজ্ঞসূত্র শোভিত অঙ্গ।
কথঞ্চিৎ বিত্ত, প্রফুল্লিত চিত্ত,
সদাব্রত সদা সাধুসঙ্গ॥
শুদ্ধা বিদ্যাদান, সর্ব্বত্র সমান,
বিষয় বিভব ঋণ চিন্তাশূন্য।
হৃদয়ে অমলা, গৃহিণী কমলা,
সংসার তীর্থ, স্বামীসেবা পুণ্য॥

চিরহাস্য আস্য, ধীরতা প্রকাশ্য,
নাহিক আলস্য, রন্ধনে আনন্দ অধিক।
ভোজনের জন্য, আয়োজন অন্ন,
প্রয়োজনে পায় অতিথি পথিক॥
এ পবিত্র দৃশ্য যায় নেত্র হ'তে সরে।
পাশে দেখ পুত্র বসে অন্যরূপ ধরে॥

(২)

খাট খাট চুলগুলি থর-কাটা ছাঁটা।
পরিপাটি টিকি নড়ে ডগে গেরো আঁটা॥
পরিধান থান ধুতি, কাঁধে নামাবলী।
কটিতে কষেন এঁটে দিতে পাঁঠা বলি॥
পণ্ডিতের পুত্র ইনি পুরুত ঠাকুর।
কলুর কলার লুসে তুলেন ঢেঁকুর॥
কন্যাদানে পড়েন ইনি পিণ্ডদানের মন্ত্র।
পঞ্চমকার অধিকার ছুঁয়ে শুধু তন্ত্র॥
যেমন ভর্ত্তা তেমনি ভার্য্যা মুখরা প্রখরা দর্জ্জাল।
রাঁধেন বাড়েন, কাঁদেন ঝাড়েন কোঁদল করে ঝাল॥
রূপোর পৈঁছের তরে দু'নয়নে বইছে সদা জল।
শালগ্রামের পৈতে বেচে পতি গড়িয়ে দেছেন মল॥
পাঁউরুটির তন্দুর খুলেছে কোলকাতায় শ্বশুর।
তার বাসায় ব'সে প'ড়ে এল, এ, হচ্ছে ছেলে ইংরিজি অসুর॥
ভটচার্জ্জির তেউড় ক্রমে এল, এ, করে পাস।
বংশের মাঝে হলেন খাড়া বেয়াড়া বেউড় বাঁশ॥

(৩)

ঠাকুরদাদা করে দিলে পাদোদক জল।
ভাবতো কত রাজা-রাজড়া পেলেম মোক্ষফল॥
তাঁরই নাতি ফুলিয়ে ছাতি চাপকান এঁটে গায়।
কেদারায় বসে কলম পিষে চাকরির ভাত খায়॥

Municipal Inspector এঁর ইজ্জত খুব জবর।
কার পায়খানায় কত ময়লা, লন প্রাতঃকালে খবর॥
বাপের ধর্ম্ম পাপের কর্ম্ম ক্রমে জন্মে গেল জ্ঞান।
তাই গজিয়ে দাড়ি চশমাধারী (এখন) সমাজেতে যান॥
জঞ্জাল ছিল যজ্ঞসূত্র জামার ভিতর লুকিয়ে।
পৈতে ফেলে ভাল ছেলে দেছে সকল লেটা চুকিয়ে॥
সকালে চলে হোটেলের ভাত, সাঁজে রুটি কাবাব।
ভিখারী এসে দোরে দাঁড়ালে পায় স্পষ্ট জবাব॥
গ্রাম থেকে শালগ্রাম এনে বাবুর পরিবার।
প্রেমলিপিতে চাপা দিয়ে, দেখেন টেবিলের বাহার॥
তাঁর ঘোমটা ঘুচেছে, সিন্দুর মুচেছে, জুতোয় ঢুকেছে পা।
তিনি প্রিয় ভগ্নী শতেক ভ্রাতার কেবল, মোদের লক্ষ্মী মা॥
মায়ের আমার বড় কষ্ট, সময় নষ্ট, একটি হল ছেলে।
সেটি বড় হয়ে কি হয়েছে, দেখুন চক্ষু মেলে॥

(৪)

ব্রাহ্মণত্ব চুলোয় যাক্, নাই বঙ্গ চিহ্ন অঙ্গে।
ফিরিঙ্গী সেজে দাঁড়িয়ে আছেন কে দেখেছ রঙ্গে॥
ইনি ঐ পরম পণ্ডিত বিপ্রবরের প্র-পৌত্র।
পবিত্র গঙ্গাজলের স্থলে যেন গর্দভের মূত্র॥
ছিলেন প্রপিতাম--অগ্নিহোত্র,
বাপ পোড়ালেন যজ্ঞসূত্র,
ইনি এখন গোত্রহারা হা-ঘরে।
(ইনি) বাংলা বসন, বাংলা অশন,
বাংলা আসন, বাংলা ভাষণ, সব ভাসালো সাগরে॥
বাবু খাতা খুলে চাঁদা তুলে, নিয়ে টাকার রাশ।
গিয়েছিলেন বিলেত বাসে শিখতে জমি চাষ॥
হয়ে পাশ করা চাষা, দেশের আশা, দেশে এসে ফিরে।
ভাবছেন দোক্তা করবেন কচুর পাতে, তক্তা ধান গাছ চিরে॥
পটোল গাছে আঁকশি দিয়ে পাড়বেন বসে ফল।
কাগজে এঁকেছেন ইনি আশ্চর্য্য এক কল॥

অনেক আলু কেটে কেটে বীজ না পেয়ে ভিতরে।
জাপানেতে ইনডেণ্ট দেছেন আলুর বীজের তরে॥
নিজের গোঁফে চাষ দিয়েছেন কামিয়ে দুটি ধার।
ঘাড়ের দিকে নেড়া মাথা, সামনে বাগ-বাহার॥
মাথার উপর ধুচনি চাপা, গায়ে Monkey coat।
চুরুট চেপে ধরে আছে দুটি ভস্মমাখা ঠোঁট॥
গলায় দড়ি জোটে নাই তাই নেকটাই আছে এঁটে।
পেটটি ভরান 'পেলিটিতে' পাতের প্রসাদ চেটে॥
এঁর আবার আছে মেম ঘরানা ঘরের Miss।
Mother Homeএ কাপড় কাচতেন
three penceএ Piece॥
ভট্টাচার্য্যের বংশধর এখন Mr. Vat।
বিলিতী বাম্‌নি কি ছেলে বিওবেন ভাবছি আমি that॥

৩৫

গান

নিত্য নূতন বেশে বাংলা দেশে নূতন অবতার।
ঘটলো লোটা কেবা কেটা বাপের বেটা চেনা ভার॥
কারো মাথায় টিকি নড়ে কোমরেতে গড়া,
কারো কালাপেড়ে জামা জোড়া একটু মিঠে কড়া;
কেউ বা কামিজে, ইংরেজি আমেজ,
টেরি কাটা ঘাড় ছাঁটা ইয়ার॥
শালের সামলা শোলার গামলা, পিরিলি পাগড়ী ক্যাপ,
যে যা ধরেন, মাথায় পরেন, কেউ বা সাজেন জ্যাপ॥
কারো খোট্টা ঠাটে গালপাট্টা, দাড়িতে ছাগল কেউ,
কোন পাগল কামিয়ে নেছে গোঁফের দুটি ধার।
রঙ্গিলা বটে বাংলা মুলুক
রং-বে-রংয়ের সং বাহার॥

৩৬

পর্দা পার্ক*

স্ত্রীর উক্তি :

মুন্সিপালের মজলিসে ওগো
হয়ে গেছে ধার্য্য।
এবার হুকুম অনিবার্য্য,
গিয়র পার্কে মার্কা মারা রমণীর রাজ্য ॥
আদরের ভাতার আমার
সভামাঝে কল্লেন আবেদন।
নারীর গতর মাটি, শরীর কাঠি,
না করে হাঁটাহাঁটি, পাচ্ছেন প্রাণেতে বেদন ॥
মাথায় শোণের নুড়ি মাসী-খুড়ী,
বুড়ীরা সব গঙ্গাস্নানে যায়।
ও যে অসভ্যতা, নাই ভব্যতা,
নব্যাদের কি সেটা শোভা পায় ॥
বিশেষ বড় ময়লা জলে ভরা,
সেই ভগীরথের খানা।
ম'লে মুক্তি হ'তে পারে,
জ্যান্তে যেতে সেথা কিন্তু ডাক্তারের মানা ॥
মেনি থ্যাঙ্কস্ ডক্টর বেঙ্কস্
আমরা ফ্রেঙ্কলি তোমায় বলি।
দিয়ে 'হরির' দোহাই যা না পাই,
শেষে তোমায় দিয়ে দেওয়ালে তা' কলি ॥

* কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় হরিধন দত্ত মহাশয় কয়েক বার মহিলাদের জন্য একটি পৃথক ভাবে পার্ক তৈরি করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছিল। পরবর্তী একটি অধিবেশনে Dr. Banks ওই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে তা গৃহীত হয়। এই পার্কটি আপার সার্কুলার রোডের 'লেডিস পার্ক', যা এক সময় 'পর্দা পার্ক' বা 'গ্রিয়ার পার্ক' নামে পরিচিত ছিল। জেলেপাড়ার সঙের এই ছড়াটি ১৩২৩ সালে রচিত হয়েছিল।

বাঁচা গেল, খাঁচা গেল, জীবনটা এখন
মিছে বলে হচ্ছে না আর বোধ।
কর্ত্তে যাব পায়চারি, মিলে যত নারী,
একটু পড়ে এলেই রোদ॥

পুরুষের উক্তি :

চন্দ্র, সূর্য্য সাক্ষী, উনি আমার ঘরের লক্ষ্মী,
ওঁর বাক্যি শুনে (আপনাদের) কিরূপ
হচ্ছে অনুমান।
(এখন) আমি যদি কথা কই, পড়ে যাবে হৈচৈ,
(বলবে) আমি কভু সভ্য নই,
আস্ত হনুমান॥
বসবে সেথা রূপের হাট,
(সেটা) পর্দা ঘেরা ফর্দা মাঠ,
সোনার পাথরবাটী শোনা ছিল,
এবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
মুন্‌শীপালের মুনশীয়ানা,
চিরদিন ত আছে জানা,
এক রাস্তায় তিনবার থানা,
কাটেন এঁরা যত বুদ্ধিমান॥
এই মাগ্‌গির বাজারে,
কন্যাদায়ের মাঝারে,
এ কি নূতন সাজা রে,
জিজ্ঞেস করি হাজারে, বলে দাও উপায়।
গিন্নিরা ত শুনবেন সাড়া, নেবেন পাড়া,
এখন কোথা থেকে দিই গাড়ীভাড়া,
তার উপরে গুঁতো, দিতে হবে জুতো,
খেঁদির মায়ের পায়॥
কান্না ধরে রান্নাঘর,
ছেড়েছে আজ কত কাল।
(সেথা) হাড়ীর বউ হাঁড়ী নেড়ে
বাড়ী যায় চুরি করে ঘি, তেল, চাল॥

একটু পাতের কাছে বসতে এসে
বসলে খেতে ছেলে।
হলো ভাল -- গেলাসটা এগিয়ে দিতো
অফিস থেকে আমি বাড়ী এলে।
ঘুচলো সে সব পাপ, উঠলো আর এক ধাপ,
ঝাঁপ ছাড়বে এবার গিয়ে বাগানে।
সোয়ামী-পুত্তুর বাড়ী এসে,
আপনি বেড়ে খাবে ঠেসে,
নয় মেসের বাসায় করে নেবে,
বিকেল বেলায় যোগানে॥
আর এক কথা নয়কো মন্দ,
এক বেলা করে খাওয়া বন্ধ,
পছন্দসই গাড়ী কর ভাড়া।
(উনি) ভূধে মুখখানি গাড়ীর ভিতর মুদে,
গায়ে একটু ফুঁ-দে,
বেড়াতে যাবেন পাঁচ পোয়াতীর পাড়া॥
এই তো সবাই বলি 'অম্বল, অম্বল',
কারুর ডায়েবেটিস্ সম্বল,
খাওয়া কমলেই শরীর যাবে সেরে।
নইলে, একে ত ঐ মাইনে,
বাঁয়ে কুলোয় না, আস্তে ডাইনে,
বেড়াবার খরচ কোত্থেকে উঠবো পেরে।
শুধু নয় গাড়ী ভাড়া, তা ছাড়া
নিত্যি নূতন কাপড়-জামার চটক্।
যত মেয়ে কর্বে ঠাট্টা, পরে শুধু লাট্টু মার্কা,
পেরলেই গিয়ের পার্কের ফটক॥
খোকার মিল্ক বন্ধ করে, শাড়ির সিল্ক কিনবো দরে,
গন্ধতেল না চুলে দিলে,
চুলের বাহার খুলবে না॥

ব্রেসলেট ভেঙ্গে বালা,
নেকলেস বেচে মটর মালা,
ধার না করলে আর কাণে দুল দুলবে না॥
পার্কে অবিশ্যি খুলবে দোকান,
সেথা হবে চা-পান,
সোডা-লেমনেড, ছাঁচি পান,
টান মিস্সের ধরে কান,
টাকা আন—টাকা আন।
প্রেজেণ্ট্ দিবে লেভেণ্ডার,
তার উকিলের ভাণ্ডার,
ঠাণ্ডার জন্যে আইসক্রীম,
মুখশুদ্ধির চকোলেট, দিতে ফেরার ভেট,
এ অধম 'ব্লাকজেট',
দরজায় লিখে 'House to Let',
বৃন্দাবনে পিট্টান॥

৩৭

ছুটো ঘরের কথা

শুন গো নগরবাসী, বছরে বারেক আসি,
হাসি হাসি পুরাতনে দিতে গো বিদায়।
রজনী প্রভাত হলে চৈত্র চিত্র যাবে চলে,
নববর্ষ হর্ষে আসি বসিবে ধরায়॥
আগে এই চৈত্র শেষে,
আমাদের এই বঙ্গদেশে,
সন্ন্যাস মেনে শিবোদ্দেশে,
সবাই পার্ব্বণ কর্ত্তো চড়কে।
তখন জ্যান্ত ছিল দেশের লোক,
শরীরে শক্তি মনে রোখ,

খেতে পেত যাহোক-তাহোক,
হয়নি সব গাঁ-উজোড় ম্যালেরিয়া-মড়কে ॥
দেশের যত জোয়ান জাত,
বুকখানা তার দশ হাত,
পাথরে দেখে শিবসাক্ষাৎ,
করে আপন দেহের রক্তপাত,
বরের তরে প্রণিপাত কর্ত্তো হরের পায়।
ছিল তাদের কত সহ্য, একটি মাত্র ব্রহ্মচর্য্য,
এক সন্ধ্যা মাত্র ধার্য্য, হবিষ্য বা ফল আহার্য্য,
সঙ্গে হাড়-ভাঙ্গা শ্রমের কার্য্য জঠরের উপায় ॥
কোথায় সে সব শৈবভক্ত,
যারা ঢেলে দিত দেহের রক্ত,
তেতালা উঁচু তক্তা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তো
কাঁটার বোঝায়, বঁটির আগায়,
এগিয়ে দিয়ে বুক।
(ওগো) বলবো কি অধিক,
ঢেকুর তুলতে যাদের কোঁকে ধরে ফিক,
তাদের ঠাকুরদাদা জিভ ফুঁড়ে বিঁধতো লোহার শিক,
আবার সেই সঙ্গে নেচে রঙ্গে,
হর হর ববোম ববোম বলতো তাদের মুখ ॥
চলতো রুখে কত ছোঁড়া,
দু-পাশ দশলকি ফোঁড়া,
আগায় জ্বালা নেকড়া মোড়া, ধুনো পোড়ার কি সে ধুম।
সঙ্গে ঢাকের বাজন, চলতো গাজন,
আসত রাজন, দেখতে সাজন,
তাণ্ডব নাচন, বাজতো নূপুর ঝুমুর-ঝুম ॥
আজ কারো কি মনে আছে,
পিঠ-ফোঁড়া সেই চড়ক গাছে,
চড় চড়া-চড় বাজে ঢাক, চেঁচামেচি দে-পাক, দে-পাক,
লাখে লাখ গলায় ডাক,

ব্যোম ব্যোম ব্যোম বাবা বোলে।
শিব-তলাতে ধুনি জ্বালা, মূল সন্ন্যাসীর মাথা চালা,
গলায় তার ফুলের মালা, পিঠে তার রক্ত ঢালা,
সোনার বালা দিচ্ছে মনিব, বাগদীপ্রজায় বাবা বলে॥
এখন সভ্য হয়েছেন বঙ্গমাতা,
গুজরত খোদে ভরা খাতা,
চাপরাস দেখলে হন দাতা,
দরজায় দু-খান পড়ে না পাতা,
অন্নদানের চিহ্ন।
(এখন) বাবুদের বাবুয়ানা মোটরে,
বৈঠকখানা পরিবারের কোটরে,
ডিসপেপসিয়া জঠরে, আলাপচারি লেটারে,
দেখা কর্ত্তে এলে কেউ হন মনে মনে খিন্ন।
পৈতৃক হুঁকো সিন্দুকে বন্ধ, ছেলেদের মুখে চুরুটের গন্ধ,
সবার উপর সবার সন্দ, দেখলে পরের মন্দ,
একটু আনন্দ কারু কারু হয়।
এমনি গরম করেছে টাকা, পৌষ মাসেতেও চলে পাখা,
জুতো খোলেন না মলে কাকা, হিসেবেতে এম্নি পাকা,
খুড়ীর কাছেও সুদের কড়ি ছাড়া উচিত নয়॥
হঠাৎ জামাই এলে সন্ধ্যাকালে, শাশুড়ী জ্বলেন গায়ের ঝালে,
বলে কে এখন আর উনুন জ্বালে,
ঝিকে ডেকে আড়ালে পাঠান দোকানে।
তখন বিশুর মাসী হাতে কাঁসি আর এনামেলের কপ,
চলে যায় প্রথমেতে ফুলকো লুচির সপ,
কেনে বুটের ডাল, পেঁজের ঝাল,
ছালের কালিয়া আর বেড়ালের নাড়ীর চপ্‌।
তাড়াতাড়ি খপ করে ফেরে মাসী
মণ্ডা তার ডিমের ধোঁকা নে॥
এখন ছেলেরা এক নূতন টাইপ,
চোদ্দ না পেরতে পাকা রাইপ,

মুখে আগুন ঢুকিয়ে পাইপ,
একমাত্র life ধারণ wifeএর চরণ কর্ত্তে ধ্যান।
এদের লেখাপড়ায় আছে মন,
বই-এর বোঝা দু-দশ মন,
চশমা-পরা পদ্মলোচন,
কোট-পেণ্ট আঁটা ডোণ্ট কেয়ার গোছ জেণ্টল্‌ম্যান্‌॥
এরা নূতন অর্থ করেন গীতার, ভুল ধরেন পরম পিতার,
বলেন 'মরেল কারেজ' ছিল না সীতার,
নৈলে কি তার trial বিনা
Internment হয়।
ছিলেন বশিষ্ঠ ত Prime Minister,
তিনি অবিশ্যি শিষ্টভাবে কর্ত্তেন Law-administer,
হলে সীতা শিক্ষিতা Sister,
এই বনবাসের ····· motive question করে
কর্ত্তেন বার।
দিতেন maintenance এর তরে,
আর গয়নাগাঁটির দাবী করে,
বলে হনুমান ম্যাজিষ্টারে,
রামের নামে শমন করে রাখতো Homer॥
কেউ বা দু-পাত জ্ঞানো পড়ে,
জ্ঞানের মাথায় বসেন চড়ে,
বলে ফেলেন বিজ্ঞের তোড়ে,
দিতে পারি মানুষ গড়ে,
একটু protoplasm পেলে
সৃষ্টি করা শক্ত কথা নয়।
মর্ত্ত্যের কথা বলবো কি, ব্রহ্মলোকেও এই দুর্গতি,
জ্বলে 'কুসুম' শরে 'গণপতি'
সরস্বতীর মটকাতে চান ঘাড়।
দেখে কুমার বিষম রোষে
গেল দিতে বার্ত্তা কর্ত্তা আশুতোষে,

ভোলা ছেলের আশুতোষে
বলেন মণ্ডা খা বাবা কোলে বসে,
গণার কথায় রাগ করিসনি ও একটা ষাঁড় ॥

(সম্পদ পেয়ে)

দেবতারা সব নিদ্রাগত,
নইলে মানুষের কি সাহস এত,
Garden party চলছে কত
কালীঘাটের পীঠস্থানে।

আগুনের জ্বালা ধরে অঙ্গে,
দেখে পুণ্যভূমি সাধের বঙ্গে,
রঙ্গিনী-ভঙ্গিনী-সঙ্গিনী সঙ্গে,
মন্দর মন্দনা যান সাগর-সঙ্গমে স্নানে ॥

এই শিব-রাত্রে সেই দিন,
দেখে এসেছে এই দীন,
বাবু বেশে কত লজ্জাহীন,
ঘোমটা খোলা খেমটা নাচ
নাচাচ্ছেন তারকনাথে বসে।

পূজতে যেথা সতীনাথে,
কত সতী পতি সাথে,
গঙ্গাজল বেলপাতা হাতে,
গেছেন রোদে তেতে থেকে উপোসে ॥

অনেকে হয়ত বলবেন বচন,
এই জন্যে ত তীর্থগমন, বন্ধ করেছি শিক্ষিত সুজন,
করেছি নূতন তীর্থ দার্জিলিং, মিহিজাম,
ওয়ালটিয়ার।

হায় এই আমি ত আছি তফাতে, কাজ কি এত ফেসাদে,
বলে কতকগুলো জেঠাতে,
গিয়ে নিজের ল্যাঠা কাটাতে দেশটা কল্লে ছারখার।
গেল হিন্দুত্বের গৌরব, ব্রাহ্মণের সৌরভ,
স্বর্গে সৃষ্টি হল রৌরব,

পাল-পার্ব্বণ পর্ব্বে সব প্রেত অত্যাচার।
করজোড়ে নিবেদন করি মহাশয়,
যতদিন হিন্দু বলে দেন পরিচয়,
যতদিন তীর্থে তীর্থে হিন্দু নারীর হয় শুভোদয়,
ততদিন ষণ্ডা পাণ্ডাদের ক্ষয়,
অগ্নি তুষস্ত মোহন্তদের লয়, করুণা দিয়ে নয়।
দেখুন আর আর সকল ধর্ম্মে,
করলে আঘাত লাগে তাদের মর্ম্মে,
ভেবে আপন কর্ম্ম ছোটেন গলদ ঘর্ম্মে,
কেউ বা চাবুক মেরে পিঠের চর্ম্মে,
দর্মা বুনে করেন অন্যায়ের সংশোধন।
আপনারা ত এত হিন্দু,
গায়ে লাগে না কি এক বিন্দু,
দেখে এই পাপের সিন্ধু,
শুনে তীর্থের নিন্দা আর অপমান।
যা হোক আজ এই চব্বিশ শেষে,
চত্তিরের রোদে আমোদে এসে,
না গিয়ে টালিগঞ্জের রেসে,
আমাদের রং দেখতে এই সঙ-এর
বেশ দেছেন দরশন।
তার জন্য হে লোকারণ্য,
নগরের যত গণ্যমান্য,
প্রাণভয়ে কচ্ছে ধন্য ধন্য,
সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে এই অধীন জন॥

৩৮

গান

হায় হায় কোথায় গেল, আমাদের এই অসভ্য সেকাল।
হলো সভ্য হয়ে লভ্য মাত্র গোরার চোরা চাল॥

মুখে বলি লম্বা কথা ভালবাসি দেশ,
দেশের আচার-ব্যবহার রং-তামাশা হয়ে গেল শেষ,
আছে মাত্র গাত্রে কালো রংটি অবশেষ,
তাও ধপধপাতে ধবল করে সাবানেতে মাজি ছাল।
দেশকে ভালবাসি বলে ছাড়ি চাপকান চোগা,
আগে রাখতাম দাড়ি, এখন কামাই গোঁফের ডগা,
মাকে রেখে গাঁ আগলাতে,
মাগের সঙ্গে কতই রঙ্গে শহরেতে কাটাই কাল॥
আর্য্য বলি, হিন্দু বলি, বলি আমরা সনাতন,
বলি আর্য্য-কীর্ত্তি কাশী, গয়া, মধুর বৃন্দাবন,
কিন্তু প্রেতের নৃত্য তীর্থে চলে
মনকে বোঝাই কলি কাল॥
সাহেব সাজ মোগল সাজ, সাজ ইণ্ডিয়ান,
বাঙ্গালী নামের করো নাকো গয়ায় পিণ্ডদান,
রাখ বাংলার পাল-পার্ব্বণ খেলাধুলো
নিজের জেতের ভাতের থাল,
ভাড়াটে কোঠার চেয়ে অনেক ভাল
বাস্তুভিটের খড়ের চাল॥

৩৯

সভ্যতার দোকানদারি

এবারেতে বর্ষফল, স্পর্শ করে অস্তস্থল,
জ্বালিয়ে গেছে শোকানল,
চোখের জলে দল এবার ছিল নিমগন।
ভদ্রমুখ ভাদ্র মাসে, আর্দ্র ধরা রৌদ্রে হাসে,
দৈবে কালো মেঘ আসে, রবি ছবি যথা গ্রাসে,
করে ধারা বরিষন॥
সেইরূপ গত ভাদ্রে, এনে কাল চিরনিদ্রে,
এ দরিদ্র সমাজ ভদ্রে, মুদ্রিত করিল দুটি
পবিত্র নয়ন।

আমাদের দলপতি, ফকিরচাঁদ* শুদ্ধমতি,
গোলোকে করিতে গতি, হরিপদে করি নতি,
করিলেন চিতায় শয়ন ॥
হারায়ে সাধন ধন, সে ফকির মহাজন,
ফকির হয়েছে মন,
ফুকারে কেঁদেছি খুঁজে চৈত্রের ফিকির।
সে যে ছিল ষোল আনা, সকলের মন টানা,
জুটায়-পুটায় আনা,
মোদের সামর্থ্য কোথায় একটি সিকির ॥
তবে লোকে কিবা কবে, নগর নিবিয়া রবে,
অনেকে নিরাশ হবে,
এই ভেবে আজ সবে এসেছি এ পথে।
পঁচিশে বিদায় দিতে, হাসিখুশি নৃত্যগীতে,
চোখের জল চাপিয়ে চিতে,
সাজেগোজে বাহির হয়েছি কোনমতে ॥
(জানি) নটের নিজের কান্না শুনতে কেহই চান না ,
দর্শকে আমোদ পান না,
বাড়িতে হাঁড়িতে তার রান্না চড়েছে কি না চড়েছে শুনে।
(তবে) আপনারা সব সদাশয়, চেহারাও মন্দ নয়,
হাসিমাখা মুখময়,
তাই ভ্রূকুটি না করে ত্রুটি ক্ষমেন নিজগুণে ॥
(থাক) কান্না রেখে রান্নাঘরে, খাই না খাই কামিজ পরে,
বাইরে বেরিয়ে এলে পরে,
চক্ষু দুটি যায় যে ভরে দেখে লক্ষ্মীর রাজ্য।
দেখি পুরানো ভিটে প্রায় লোপ, উড়েছে পায়রা, রয়েছে খোপ,
বোনেদে বসিয়ে গাঁতির কোপ,
বাস্তভাঙ্গা রাস্তা মরি কি বাহারের বাহ্য ॥

* জেলেপাড়ার সঙের প্রধানতম উদ্যোক্তা ও দলপতি ফকিরচাঁদ গরাই মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত ছড়া।

শুনছি সভ্যতার প্রতিশোধ, শহরটা হবে সবই রোড,
মিউনিসিপেল কোড, আর রম্পাসের বোর্ড
কচ্ছেন তারই চিন্তে।
বেঁচে আছেন অ্যাসেসার, আকুইজিসেন সার্ভেয়ার,
টাউনহলে মেজেষ্টার, ঘুচিয়ে সাত-পুরুষের বাঁধা ঘর
ধাপায় গিয়ে জমি পার কিনতে॥
বিশেষ মিটিংএ হয়েছে ধার্য্য, রাস্তা কবাটা লাভের কার্য্য,
দশ হাতের জন্য দশ কাঠা অ্যাকোয়ার-র্য,
কত ইনেসপেক্টারের বাড়বে আহার্য্য,
সারপ্লাস land বেচে।
লোকসান করে নিদ্রার কার্য্য, বড় বড় কমিশনার আর্য্য
করেছেন চেয়ারম্যানের যুক্তি গ্রাহ্য,
যার যাবে তার যাবে আমাদের কি এঁচে॥
(আবার) রাস্তার গতর বাড়বে যত, কাতারে কাতারে তত
নিয়ে পাটের কাঁড়ি, মোষের গাড়ী চলবে কত,
(আঃ হায় রে স্বদেশ !)
আমাদের স্বদেশী শত শত,
পাবে জেটী সরকারী কাজ।
তার পরে মোটার চলা বৃদ্ধি হলে, পড়ে তার চাকার তলে,
হাজার দুই বেগার বা বেকার মলে, সভার মাঝে
আমাদের আর থাকবে নাকো লাজ॥
এতেও কতকগুলি টমাস্ পিট,
বুঝছি আছে কিছু বায়ের ছিট,
বলেন আজও আমরা হইনি ফিট্
সিট পেতে সেল্ফ গভর্ণমেণ্টের তক্তে।
আরে সাহেব ছি ছি ছি, ভাবছি তোমাদের বুদ্ধি কি,
আমরা কি আর আমরা আছি, চার পুরুষের এ, বি, সি,
মিশে গেছে যে রক্তে॥
দেখ সেল্ফ গভর্ণমেণ্ট বাড়ী বাড়ী, চারটি ভাই-এর চারটি হাঁড়ি

বাপ চড়ে না ছেলের গাড়ী, নাইকো আর নাড়ীর টান
অসভ্য আচারে।
এখন আর নাইকো সেদিন, সবাই স্বাধীন,
চাকর বলে জবাব দিন, তাকে হেঁটে যেতে বল্লে বাজারে ॥
মাষ্টার ব'কলে পোড়'কে, ভ্যাঁ করে ছেলে কেঁদে অন্দরে ঢোকে
(বাপ রে বাপ !)
বৌমা চোখ রাঙ্গায় কি রোখে,
ছেলের বাপ তখন বাপের বে দেখে,
ভাবে গেল বুঝি লাইফ্।
বধূ বিনোদিনী ছড়িয়ে এলো চুল, মুখ ভোমরা ভরা পদ্মফুল,
বলেন 'পতি! ও দুর্মতি! ড্যাম রাসকেল ফুল,
হোমরুলের ভয় নাইকো তোমার থাকতে আমি ওয়াইফ ॥
আমরা মানি কি আর পুরোনো শাস্তর,
খাই কি পুরোনো বালাম, পরি কি পুরোনো বস্তর,
জানি আইন একমাত্র অস্তর,
ল'য়েই হয় বিশ্ব লয়,
ল'য়েই অর্থ উপার্জন।'
তাই পূজ্য বাপের চেয়ে ফাদার-ইন-ল,
মায়ের চেয়ে মাদার-ইন-ল,
প্রাণের ভাই ব্রাদার-ইন-ল,
আর একমাত্র সিষ্টার-ইন-ল'র সিষ্টারই
আমাদের ল-ফুল গার্জেন ॥
দেখ, রাস্তায় কি আলোর জাঁক,
ঠকিয়েছি সেই বিধাতাকে, সমান চোখে দেখি সবাকে,
যার ঘরে নেই তেলের কড়ি, সেও ঝাড়ে লাইটিং বিল।
শহরে আর হয় না লাইট, তাই ঘুমিয়ে না কাটিয়ে নাইট,
বাবু, বায়, রাজা, নাইট, জন্ ইন্ সাইট
হলে করেন ঘরের দিকে খিল ॥
দেখ, দোকান কি সব সার বাঁধা,
কোথাও জাল চচ্চড়ী কাঁকড়া রাঁধা,

কোথাও লুচি, কচুরি, রুটির গাদা,
হাটে অন্নপূর্ণা বাঁধা, ঘরে অন্ন থাক না থাক।
এ রাজ্যে কারো নাইকো চিন্তে,
যদি বুদ্ধি করে পার চিনতে,
এখানে পাবে সবই কিনতে,
জাতি, খ্যাতি, যশ, নাম বাজাবার ঢাক॥
ডাক্তারখানায় দাস্ত বিক্রী,
তারে স্বাস্থ্য বজায় নরযোনে ডিক্রী,
আদালতে কিনতে ডিক্রী,
চাকরি বিক্রী, বড়বাবুর কাছে।
বিকোয় পুরোনো শিশি বোতল,
সোনা বলে বিকোয় পেতল,
কিনতে পারে নামের হাতোল
তেলের জোগাড় যার ঘরে আছে॥
টেঁকে যার টাকা আছে,
বিদ্যে বিকোয় তার কাছে,
সরস্বতী স্বয়ং নাচে পুঁতির হার গলায় প'রে
পুতের রসনায়।
আর এক হয়েছে নতুন ছিষ্টি,
কলেজে ভর্তির লিষ্টি,
পেট ভরে কিছু খেতে মিষ্টি,
দৃষ্টি দিয়ে আছে বাছার পকেট পানে হায়॥
দোকান বুঝে দিলে দাম,
বেরিয়ে যাবে কবি নাম,
স্বদেশী কি ঋষি গুণধাম,
সবই জেনো কেনা-বেচারাম।
পটলডাঙ্গায় দিলে দর, পাবে মেয়ের ভাল বর,
বোস, বসাক, বাঁড়ুয্যে কি ধর,
ছাপমারা সব নজরাম॥
আবার কিনতে চাঁদি বিনি মূলে,

বীজমন্ত্র আছে মূলে,
চাঁইকে ভজ ভাইকে ভুলে,
ছাঁদা বেঁধ চাঁদা তুলে,
চ্যারিটির কার্য্য।
ভিতরে থাকুক পোকা,
কারুর হবে না ধোঁকা,
পাকাও বনে যে বোকা,
দেখে যদি বাহারের বাহ্য ॥

৪০

গান

সকলই ভাই দোকানদারি সভ্যতার এ রাজ্য।
(হেথা) গরজে সব গলাগলি,
(নিজের) কাজ ফুরোলেই ত্যাজ্য ॥
এ সমাজে সে মজে না, যে জানে ভাই বেচা-কেনা ;
(হেথা) চেনা লোকের দেনা নিলে
জানা মেলাই গ্রাহ্য ॥
নাইকো চোখে লজ্জা-সরম,
মুখে বাক্যি গরম গরম,
খাতায় খালি কথার খরচ,
নাই জমার দিকে কার্য্য ॥
স্বদেশ স্বদেশ করলে পরে পসার জমে বঙ্গে,
'ধর্ম্ম-মা' পাতিয়েছি তাই 'ভারতমাতার' সঙ্গে,
শীতলা হাতে ঘারস্থ হলে গেরস্ত ভিক্ষে দেবে ধার্য্য ॥
উপরে নিকন-চিকন, ভিতর ফোঁপরা ফাঁক,
বুকে নাইকো কড়ার বল, মুখে লম্বা হাঁক,
পেটে অন্ন থাক বা না থাক
কি বাহারের বাহ্য ॥

৪১

টাকা

(টিপ্পনী)

টাকা—রূপচাঁদ—পূর্ণ ষোলটি আনায়,
শশী যথা বিকশিত ষোড়শ কলায়।
ষোলটি শোলোকে তাই টাকার এ ছড়া;
পূর্ণ বটে রসাবেশ—ঠাসে, মিঠেকড়া।
টাকা কারো বশ নয়, রাখে সবে বশে,
কৌরবের বাঁধা ভীষ্ম—টাকারই রসে।
সংসারে টাকার কথা সুধার সমান;
ভণে কবি রসময়, শোনে ভাগ্যবান্।

/০

টাকা—টাকা—টাকা—
তুমি সুশীতল, কঠিন প্রবল,
রজতে উজ্জল চাকা,
রাজার মুণ্ড ধরিয়া বক্ষে,
বিশ্বাস আন' প্রজার চক্ষে,
তোমার বসতি যাহার কক্ষে,
তাহারি বচন বাঁকা,
তুমি দেববর, রূপ মনোহর,
জড়েও অজড় টাকা।

৵০

টাকা—টাকা—টাকা—
বাজে তব ধ্বনি, পড়ে যে তখনি,
সকল রাগিণী ঢাকা;
নর্ত্তকী নাচে, কতই বিলসে,
গায়িকা, নিত্য গায় তব আশে,

নায়িকার প্রেম ? নায়কের পাশে,
তুমি না থাকিলে ফাঁকা !
ঢাল' নব রস, কঠিন পরশ—
হলেও তুমি যে, টাকা ।

৶৹

টাকা—টাকা—টাকা—
জগতের সার, তুমি গোলাকার,
হে দেব রূপার চাকা !
ওঙ্কার মূক—ঝঙ্কার তব,
নিমেষে ক্ষান্ত—রণ-বিপ্লব,
লভে শ্রীবৃদ্ধি শিল্প-বিভব,—
দেশের সমৃদ্ধি ছাঁকা ;
হে সুদর্শন, জিনি নারায়ণ,
চক্র তুমি যে, টাকা ।

।৹

টাকা—টাকা—টাকা—
কবি, শূর, বীর, ধরিতে অধীর,
তোমার রূপার চাকা ;
শত শত লোক ধাইছে নিত্য,
পাইতে তোমায়, হে গোল বিত্ত,
কেহ বা মরিছে জ্বলিয়া পিত্ত,
কেহ খায় ভ্যাবাচাকা ;
রজতের চাঁদ, পাত' ভাল ফাঁদ,
সুধা-বিষে মাখা, টাকা ।

।৵৹

টাকা—টাকা—টাকা—
সজাগ দেবতা, জুড়াইতে ব্যথা,
নিরত তোমায় ডাকা ;

বিবাহের পণ করিতে চুক্তি,
কন্যার দায়ে লভিতে মুক্তি,
হইল বিকল সকল যুক্তি,
বেহাই বড়ই ন্যাকা ;
আসে তাঁর বোধ পাইলে নগদ
বরের ওজনে টাকা।

।৶০

টাকা—টাকা—টাকা—
কত অপকারে, কত উপকারে,
ঘুরিছ রজত-চাকা ;
এধারে তোমার জাগিছে কুশল,
ওধারে তোমার অশুভ মুষল,
রজনীর মত ঘুরিছে ভুবন,
পাশাপাশি অমা-রাকা ;
কা'রে কর চুর, কা'রে বা প্রচুর,
দাও সুখ-মোহমাখা।

।৵০

টাকা—টাকা—টাকা—
তোমার বিহনে, হেরি যে নয়নে,
এ ভুবন ফাঁকা-ফাঁকা ;
মিছে এ জীবন, ভূতের এ কায়া,
মিছে ভালবাসা, স্নেহ, দয়া, মায়া,
মিছে সখা, সখী, ছেলে, মেয়ে, জায়া,
জ্যেঠা, মামা, পিসে, কাকা ;
তোমারই স্নেহে বল পাই দেহে,
রুধির, তুমি যে টাকা।

॥০

টাকা—টাকা—টাকা—
চাষীর কুটীরে, হেরি যে ধনীরে,
ধান তা'র হ'লে পাকা ,
ডাক্তার ঘোরে মোটর হাঁকিয়া,
কৌন্সেল ওড়ে গাউন আঁটিয়া,
এঞ্জিনিয়ার—হ্যাট্ বাঁকাইয়া,
ছুটে ছোটে লয়ে ঝাঁকা ,
ফেরাও সবারে ভবের বাজারে
হে রজত-রূপী টাকা ।

॥৶০

টাকা—টাকা—টাকা—
পাপ-পুণ্য ভুল, তুমিই যে মূল,
যতদিন ভবে থাকা ;
তোমার প্রভাবে যশোমাল্য পরি'
সাধু হয় লোক, পরধন হরি',
জিতেন্দ্রিয় সে, ভূঙ্গতা করি'—
সব দোষ যায় ঢাকা ,
হোক্ কদাকার, ফটো ওঠে তা'র,
মদনমোহন বাঁকা ।

॥৵০

টাকা—টাকা—টাকা—
সংসারীর সার, চাঁদি গোলাকার,
সর্ব্বস্ব তুমি একা ,
তুমিই ব্রহ্ম—নাহিকো দ্বিতীয়,
কিবা ছোট বড়—সবাকার প্রিয়,
তুমি না থাকিলে আঁধার যে গৃহ,
হে গৃহ-দেবতা পাকা !

কুরূপা প্রেয়সী হয় যে রূপসী
সাথে যদি আসে টাকা।

॥৶০

টাকা—টাকা—টাকা—
এত পাশ দিয়ে, বিনা পণে বিয়ে
করে' দায় ঘরে ট্যাকা,
জোগাইতে মন তরুণী বামার,
দিতে হবে তাঁরে চিরুণী সোনার।
রাখিতে আয়তি চাই যে তাঁহার
দু'গাছি গিনির শাঁখা।
শুনিয়া কবিতা, ভোলে না বনিতা,
চিনেছে তোমায়, টাকা।

৸০

টাকা—টাকা—টাকা—
তুমি ছাড়া নাই মানুষ যাচাই,
করিতে নিকষ পাকা,
কৈকেয়ী, ভরত, দ্রুপদ ও দ্রোণ,
তুমিই দেখা'লে কে কেমন জন,
ত্যাগ ও স্বার্থ—মধুর, ভীষণ
চিত্র তোমাতে আঁকা;
জেলে যায় শশী, কাঁদে চোখ ঘসি'
প্রমদা—ছাড়ে না টাকা।

৸৶০

টাকা—টাকা—টাকা—
কাতর ভক্ত, হয় রে শক্ত,
তোমায় ধরিয়া রাখা;
সম্ভাবে তব বুঝা যায় বেশ—
জোছনা, বাঁশরী, কোকিলের রেশ,

কুসুমে, মলয়ে ভরে' যায় দেশ,
ময়ূর মেলে যে পাখা ;
সরিষার ফুল হেরে কবিকুল,
অভাবে তোমার, টাকা।

৸৵০

টাকা—টাকা—টাকা—
বাড়াইলেই লোভ, জেগে ওঠে ক্ষোভ,
অশান্তি দেয় যে দেখা ;
মরণের কালে লুণ্ঠিত ধন,
হেরি' মামুদের ঝরে দু' নয়ন,
সকলি বিফল—বিভব-রতন,
ফেলে যেতে হয় একা ;
ক্লাইভের ফাঁদ, ঘুঘু উমিচাঁদ
মরে, তব শোকে, টাকা।

৸৶০

টাকা—টাকা—টাকা—
সভা-সমিতিতে, রেসে, রণহিতে,
হাসিমুখে দাও দেখা ;
তোমার কারণে হয় রোজ ফাঁদা—
কতই উপাধি,—বক্তৃতায় কাঁদা,
করুণার নামে তোলা হয় চাঁদা,
দেশে দেশে খুলে শাখা ;
কঠিন, ধবল, কুটিল সবল,
তুমি যে সচল টাকা।

১৲

টাকা—টাকা—টাকা—
তুমি ভরা-পেটে রহিল পকেটে,
যায় বেশ তেজে থাকা ;

রোগে, শোকে, তুমি দাও বরাভয়,
সৃজন পালন, ঘটাও প্রলয়,
ঘুরিয়া বেড়াও এ ভুবনময়,
যেন নিয়তির চাকা,
দেবতার সার, নমি বারবার,
সাকার রূপার টাকা ॥

(স্তব)

অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপ্ত চরাচরে,
খণ্ড রূপে স্বপ্রকাশ—রৌপ্য কলেবরে।
পরিলে লালসাঞ্জন—সুখ-শলাকায়,
ফুটে উঠে দিব্য চক্ষু—লভিতে টাকার।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-টাকা সর্ব্বোত্তম ;
টাকা মর্ম্ম, টাকা কর্ম্ম, টাকাই বিক্রম।
সংসারে সবাই সঙ্—টাকা মাত্র সার,
টাকার চাকার তলে কোটি নমস্কার ॥

(অথ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন)

১

সব ঠাকুরের সেরা তুমি, সাবাস্ তোমায় টাকা,
দেখ্ছি এ দুনিয়া-ভুমি, তোমারি এলাকা।

২

তেত্রিশ কোটী দেবতা আছে,
কল্কে পায় না তোমার কাছে,
তুমি নইলে হয় যে পাছে,
উপোস করে থাকা ;
সুস্থ হ'বার পরশমাণিক,

দুঃস্থ দেহের তুমিই টনিক্
বল-বুদ্ধি-ভরসা ক্রমিক
তোমার তরেই রাখা।

৩

জগৎ চালান জগন্নাথ,
কিন্তু তাঁহার কোথায় হাত ?
তোমার চক্রে চল্‌ছে কি হাত
ক্যা বাৎ মজার চাকা!
দাতা তোমার কদর জানে,
দেশের হিতে উদার প্রাণে,
তোমার কীর্ত্তি নিত্য দানে,
দেখান কতই পাকা।

৪

কৃপণ তোমায় করে' জড়,
মনে মনেই মস্ত বড়,
চিনির বলদ—বৈতে দড়,
ভাগ্যে নাই তার চাখা ;
তাপে তুমি গল' তবু,
গলে না তা'র হৃদয় কভু,
তোমার চাপেই হেন প্রভু
ভঙ্গী ধরেন বাঁকা।

৫

ব্যাঙ্কে কর আনাগোনা,
কার্‌বারে যে ফলাও সোনা,
কর্‌তে তোমার উপাসনা,
চাকরি যে চায় ঢ্যাকা।
সচ্ছল র'বে নিরবধি,

বইবে যাবৎ জীবন-নদী,
তোমার পুণ্যে উড়ায়ে দি'—
বিজয়-পতাকা ॥

গান

হায় রে সেকাল ফিরবে কি আবার,
যখন দেশের অন্ন থাকতো দেশে,
ছিল নাকো হাহাকার,
সেকাল ফিরবে কি আর।
যখন দিত না গরীবের নাতি-পুতি,
মাথায় প্যারামিটার ছাতি,
পরতো নাকো খড়ম ছাড়া,
ডস্‌ন, ল্যাটিমার।
হীরের চুড়ির জন্যে গিন্নীর
হত না মুখভার,
হায় রে সেকাল ফিরবে কি আর ॥

(অংশ)

রিফরম—গরম গরম

গুডবাই ভাই তের শ' আটাশ,
পরকালটা সুখে কাটাস,
সেথা ঘাঁটাসনে, চটাসনে,
পাঠাসনে কাউকে জেল।
আসতে বলিস নববর্ষে,
সঙ্গে কিছু নিয়ে সর্ষে,

হেথা সব ফরসা, নিভরসা,
কারুর ভাঁড়েই নেইকো তেল ॥
চার দিকেতেই শুনছি বাণী,
সবার ভাঁড়ে মা ভবানী,
খেতে হবে খুব চোবানী,
এর চাবানী ও জবানী শুনছি কানে।
পেয়ে রিফরম গরম গরম,
স্বাধীনতার বুঝছি মরম,
কাউনসেলেতে খুব দহরম,
প্রাণ যায় বুঝি হেঁচ্‌কা টানে ॥
স্থরুতেই বুঝেছি সার,
পেয়েছি খুব অধিকার,
বাড়াতে নিজের টেক্সর হার,
আপনার গলায় ছুরি দেবার খোলসা হুকুম।
পোড়া বিধাতা গোল বাধালি,
সাধের গুড়ে পড়লো বালি,
সরকারের সব তবিল খালি,
হেলি, হুইলার, কারের হয় না ঘুম ॥
রাজ্য-রথের চারটা চাকা,
সেপাই, পুলিশ, মন্ত্রী, টাকা,
টাকার চাকা হলে ফাঁকা,
রথখানিকে চলতি রাখা,
চলে না আর কোনমতে।
দোবরা চিনি মাখা,
আর যে তিনখানি চাকা,
না পেয়ে টাকার টান,
মুখ হাঁকান, রথ নর্দমায় উল্টে পড়ে পথে ॥
রাজনীতি ও উদার নীতি,
(কিন্তু) চলবে কিসে উদর নীতি,

সেই হয়েছে মনে ভীতি,
ঘরে ঘরে রীতিমত পড়ে গেছে কান্না।
ভাত কাপড়ের বাড়ছে দর,
যাচ্ছে বেড়ে রাজকর,
ডরে গায়ে এয়েছে জ্বর,
সন্দ মনে বন্ধ এবার হবে বুঝি রান্না ॥
কাউন্সিলে কে চাললে চাল,
দেশে আর ধরছে না মন মন চাল,
জমে গেছে অনেক মাল,
কুণ্ডু, পাল, আড্ডিবাবুর আড়তে।
মন করা আট টাকা থেকে,
থেঁকে উগরে ফেলছে লোকে,
কোন মেম্বার দেখেছেন চোখে,
ভাতের ভাবনা এবার আর নাইকো ভারতে ॥
(অগ্নি) হুকুম পাশ করলে কাউনসেল,
কাঁটার আইন হইল ক্যানসেল,
হলো চঞ্চল চালের অঞ্চল,
দেড়টাকা মন করা দর বাড়লো সকালে।
মাস মাইনে বন্দোবস্ত,
তিরিশ টাকা মাত্র রেস্ত,
কচি-কাঁচায় সংসার মস্ত,
গৃহস্থ কাঁদে আর চড়ায় আপনার গালে ॥
দরজায় লোহার গেট,
তকমা পরা চাকরের সেট,
ভরান নিজের আর পরিবারের পেট,
তার জন্যে পৈতৃক স্টেট—To let,
বাড়ী দশ-বিশখানা ভাড়া খাটছে শহরে।
এ হেন যে অমূল্যনিধি,
সেজে গরীব প্রজার প্রতিনিধি,

গড়তে ভাঙতে আইন বিধি,
সুখে হয়েছে শখের মেম্বর ভোটের বহরে ॥
নয়তো তিনি জগমল খান্না,
চানা ছাড়া আর কিছু খান না,
গলায় পরেন হীরে পান্না,
গরীবের নিত্যি কান্না,
সব দিন চড়ে না রান্না, তাতে এঁরা অচেতন।
(আর) বুঝলেই বা করবেন কি ?
মিছামিছি চেঁচামেচি,
বলতেই হবে হাঁ জী, হাঁ জী,
নইলে বলবে পাজী,
বদমেজাজী শুভ্র সভাজন ॥
পথ নেই অদৃষ্ট ছাড়া,
গাল নেই মড়ার বাড়া,
চারদিকে যা দেখছি তাড়া,
এবার যদি কাটে ফাঁড়া,
বুঝবে কপাল জোর।
চাল শুনছি বাড়বে আরো,
ময়দার মন সাড়ে বারো,
নব্বই-এ ঘি খেতে পারো,
টাকায় দু'সের দুধ খাওয়া নয়
পয়সার খালি খোর ॥
দেশের হিতৈষীর দল,
খুললেন কাপড়ের কল,
মনে একটু বাড়লো বল,
সস্তায় করবো লজ্জা নিবারণ।
(ও মা) এ যে সেই শেয়ার, সেই ডিভিডেন্ট,
লাভের আশার নাইকো end,
সে যে শিক্ষায় tend, মনের bend,
'দেশ'টা খালি trade-এর আবরণ ॥

তার পরেতে ভায়ার কি,
শুধু হাতে নয় ইয়ারকি,
খরচ-খরচা চায় আর কি,
যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ ফিয়ার কিবা তার।
(কিন্তু) মহাজনদের আছে মিল,
জমিদারদের দোরে খিল,
উকিল উঁচিয়ে দেখায় কিল,
এদের বাক্সর ওপর টেক্স ধরা দায়॥
এই থিয়েটার আর বায়স্কোপ,
মন্দ নয় এ তুটো ঝোপ,
এরই ওপর বসাও কোপ,
এদের মা বলতে বাপ বলতে
নাইকো কোথাও hope।
(অয়ি) তারাবাল্লা তাবারাল্লা,
কাউনসেলে হাসির হল্লা,
কেল্লা থেকে দাগলো বাইশ তোপ॥
এই বাবুদের শাস্ত্রে কয়,
আমোদেতে অর্থক্ষয়,
সেটা কেবল অপচয়,
মনকে নেই নাওয়াতে-ধোয়াতে,
খাওয়াতে ফুলের বাতাস।
যারা খাটচে মরুক,
খেটেখুটে আপিস ছুটুক,
ভোরে উঠে মন মেজে নিক,
মনিবের বুটে ঘুঁটে কুড়ক বা কাটুক ঘাস॥
এঁদের প্রাণের ছবি নোটে আঁকা,
বাক্সি শোনায় চাঁদির চাকা,
(আর) মোটার ভেঁপুর কুকুর ডাকা,
কেবল মিষ্টি লাগে কানে।
এঁদের প্রিয় অতি পোড়া আস্ত,

বিষের জ্বালা দেখে হাস্য,
অর্থ একমাত্র উপাস্য,
মন মরে গেছে দাস্য-ফাঁসের টানে ॥
বিবাহেতে বাজনা বাজে,
যাত্রা হয় শুভ কাজে,
অগ্নি হয় দয়ার উদয়
এদের হৃদয় মাঝে,
বলেন, বাজে খরচ তুলে দিয়ে
করাও কাঙ্গালী ভোজন।
ব্যস! সানাই বেচে কানাই আসুক,
ঢোল বেচে ঢুলি,
ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে আসুক
যাত্রার ছেলেগুলি,
তখন দয়াময়রা করবেন দয়া
নিয়ে পরের ধন,
(অফ্ কোর্স্ চাঁদা থেকে কেটে নিয়ে
কিছু কমিশন।)
এই ত গেল আমোদ-কর,
তারপর আছে ডাকঘর,
বাড়ছে টিকিটের দর,
মাইডিয়ার কে লিখতে হলে
দিতে হবে দুনো মাসুল।
পোষ্টকার্ড অর্দ্ধ আনা,
তাতে লেখা চলে মন্দয়ানা,
প্রিয়ার প্রাণের কথা টেনে আনা
খামের ভেতর চিনির পানা,
এক আনার কম হবে না ত তা উসুল ॥
বিল সরকারের মাথায় ছাতি,
দেখে কারো ফাটলো ছাতি,
বলে কি নবাবের নাতি,

খাতা হাতে ছাতা মাথায় এত বাবুয়ানা।
বাজেটে অমনি বেরুল বোল,
এই ছাতি আর প্যারাসোল,
এক তালিকায় দুই-ই তোল,
লাকসারির একই কারখানা॥
বাড়াতে এই রাজ্যের আয়,
আমরা বলতে পারি সদুপায়,
অনেক টেক্স হবে আদায়,
ঘুচে যাবে তবিল ঘাঁকতি কর্জ হবে paid।
বন্ধুদের entertainmentএর জন্য
করলে তাদের নেমন্তন্ন,
খাওয়ালে মাছ, ভাত, লুচি, পরমান্ন,
দিতে হবে four annas per head॥
যখুনি যেথা হবে কন্যাদান,
তখুনি সেথা যেন অ্যাসেসার যান,
বুঝে নগদ কি রুপোর দানের পরিমাণ,
টাকায় আট পাই,
ম্যারেজ ট্যাক্স করুন তো আদায়।
B, A, বরকে কর্ত্তে purchase,
ভদ্রাসন তো দেছেন mortgage,
আছে কনের বাপের মনের তেজ,
টেক্সর টাকা কর্ত্তে case,
গিন্নীর গহনা আছে ত তাঁর উপায়॥
যার বাড়ীতে বাজবে বাজনা,
তাকেই দিতে হবে খাজনা,
কিছু অন্যায় সেটা আজ না,
আমাদের স্বাধীন রাজ নিজের রাজ্যপাট।
টেক্স দেবে পুজো বাড়ী,
টেক্স দেবে লক্ষীর হাঁড়ী,
বরের গাড়ী, বোম্বাই শাড়ী,
ছাড়লে নাড়ী, আসবে মড়ার খাট॥

আগে লিখে দিয়ে বণ্ডে,
দেবে এক টাকা ইউনিভারসিটি ফণ্ডে,
তবে লোকে করবে মণ্ডে,
এলো চুলে হবিষ্যি বিকালে গঙ্গাস্নান।
দেখতে পাচ্ছি বেশ স্পষ্ট,
বিশ্ববিদ্যার অর্থকষ্ট,
হবে এতে আশু নষ্ট,
সরকারী তবিলে পড়বে নাকো টান॥
থাকবেন মাস ছয় ঐ বড়লাট,
তাই শহর হচ্ছে ঘিরে মাঠ,
নতুন দিল্লী, রাজপাট,
তার ঘাট খরচা ত হবে যোগাতে।
নুনের উপর ডিউটী ধরে,
আর দেশলাই-এর দু-গুণ করে,
ঐ নবাবীর খরচার তরে,
গরীব প্রজাকে হবে একটু ভোগাতে॥
দেশী চিনির বেচাকিনি,
ঘুচে গেছে অনেক দিনই,
কিনছি বিদেশী চিনি,
খেলছি টাকার ছিনিমিনি,
তার উপরে বাড়বে আরো কর।
চরকা বলছে গান্ধীর কথায়,
হেলি যদি হিসেব খতায়,
চরকা পিছু এক কথায় চার আনা
ধর্ত্তে পার হয়॥
Idu র কি বেজায় beauty,
ডবল ডবল বাড়ল duty,
Income tax এর নিয়ম new টি,
মতলব মন্দ নয়।
সরকারকে দিলে ধার,

এক শ' টাকা পাবে পার (proper),
পঞ্চাশে বিকোয় না আর,
সাড়ে তিন সুদ পাচ্ছ
কি আর তাতে ভয় ॥
ভারতের মঙ্গলের জন্যে,
দিতে এক রাজত্ব অৰ্দ্ধেক কন্যে,
ছুটিয়ে প্রাণে দয়ার বন্যে,
এসেছেন ইংরেজ আমাদের এই দেশে।
কুলীরা পায় না খেতে,
তাই ত খেটে দিনে-রেতে,
আসামে বাগান পেতে,
এসেছেন হাঁ করারা চা-করের বেশে ॥
এই যে Clive Streetএর সওদাগর,
দেশে ধনে ধানে পোরা ঘর,
মনটা শুধু দয়ার আকর,
আপিস্ খুলেছেন কেরাণীর জন্য।
আহা নামে তারা খালি বাবু,
পয়সা বিনে বিষম কাবু,
দুধ জোটে না খাইয়ে সাবু
ছেলেকে পড়ান পোড়ান জোটাতে অন্ন ॥
দয়াময় এই ইংরাজ,
বাঙ্গালীকে দিতে স্বরাজ,
ভাড়া দিয়ে চড়ে জাহাজ,
এসেছেন কষ্ট করে এই ভারতবর্ষে।
ম্যানচেষ্টার কি ল্যাঙ্কেসায়ার,
গ্রেহাম কি বার্কমায়ার,
ওডায়ার কি মাইকেল ডায়ার,
তৈরি সবাই বুনতে হেথা সর্ষে ॥
খুলে বললে নিজের নোসান,
আছে পিনাল কোডের সিডিসন,

তাই করলুম না আর অ্যাডিশান,
আটাশের সেশন, এইখানে হয়ে রইল বন্ধ।
ঘুচিয়ে মনের ময়লা রাশি,
সুখে ফোটাতে মুখের হাসি,
বছরেতে বারেক আসি,
দেখাতে এই সঙ-এর মহানন্দ ॥

১৪

গান

মন ভুলিস না ভুলিস, বদন তোল রে হরি নাম।
ও নাম বাজারে বিকোয় নাকো,
হয় না হাটে এক কড়া দাম ॥
চৌরঙ্গীর পৌরভঞ্জ নদের গৌর ছেড়ে
তোর চলবে কেতাব,
ফলবে খেতাব,
মাইনে যাবে বেড়ে,
ভজ ভজ রে ভজ কালেক্টার,
ভজ মন রে ইনস্পেক্টার,
ভজ সেক্রেটারী গুণধাম।
ভজ গ্রেহাম, রেলী, টারনার মরিসন,
ভজ টেলার কেল্লাস্ বুট মেকার ওয়াটসন,
ভজ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ক্যামাক ষ্ট্রীট,
চুনো গলি, আলু-গুদাম ॥

১৫

গান

সব কয়লা নির্ভয়লা সবার ভাঁড়ে মা ভবানী,
নেই নেই নেই নেই রব যে শুনছি সবার জবানী।

ব্যবসার বাজার বেজায় মাটি,
টাকার হাটে কান্নাকাটি,
আধা খাদে মিলিয়ে খাঁটি,
লাভ জমে না ভাবছে দোকানী ॥
আবার এ কি করলি কালী,
সরকারের সব তবিল খালি,
ঘোর তুফানে দুলছে ডিঙ্গী,
পায় না ত আর হালে পানি।
কি আগুনে দিলুম ঝাঁপ,
রিফরম কি গরম রে বাপ,
গায়ে টেক্সর ভাপে হয়েছে ফোসকা
আবার দেবে শুনছি চোবানী ॥

৪৬

আপনা আপনি নারাজ
হয় না তাতে স্বরাজ।

এল গেল আর এক সাল,
আসিবে তিরিশ কাল,
ভেবে দেশ...............
আপনা আপনি বাড়ে কাল শিক্ষিত বাঙ্গালী।
কালনিদ্রা অনুক্ষণ,
পরছিদ্র অন্বেষণ,
দেখে না দরিদ্র মন,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুক কাঙ্গালী ॥
বন্যার প্লাবন জল,
করে কি দিল শীতল,
জলেছিল যে অনল,
শান্ত বঙ্গ অন্তঃস্থল করে বিদারণ।
রাজ উপেক্ষা ছিল দীক্ষা,

লভে সবে মহাশিক্ষা,
না করে পর প্রতীক্ষা,
যেচে রাজসাহী তরে ভিক্ষাব্রত কি গো
হল সমাপন ॥

সর্ব্বকার্য্যে আগুয়ান,
স্বদেশীর জন্মস্থান,
পণ-ধন-প্রাণ-দান,
এই বঙ্গে জন্মেছিল 'বন্দেমাতরম' গান।
আজি কিনা সেই বঙ্গ,
ঢেলে দিয়ে প্রাস্ত অঙ্গ,
(করো) অহঙ্কারের মন্দ সঙ্গ,
ঘরে ঘরে রণ বঙ্গে দিচ্ছে দেশ বলিদান ॥
নাইকো বক্তা রামগোপাল,
বামুন হরিশ নীলের কাল,
ন্যাশানাল নবগোপাল,
পাল কৃষ্ণদাস হায় নাইকো আর বঙ্গে।
লুপ্ত শিশির মতির লেখার ছন্দ,
নাই আনন্দমোহন, উমেশ বন্দ্যো,
সুরেন্দ্রের গেছে সুগন্ধ,
মুখ বন্ধ তার মন্ত্রীগিরির সঙ্গে ॥
বোম্বেয়ে মান্দ্রাজী………,
বজায় রেখেছে বাকির চোটটা,
অনেক নয়া নয়া পার্টী,
বাঙ্গালীকে এখন করে ঠাট্টা,
ঠাট-টা মাত্র রেখেছেন খাড়া দেশবন্ধু দাশ।
দেশের দশা দেখে বিপন্ন,
হয়ে স্বধীর অগ্রগণ্য,
ষাট বছর অবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ করে ধন্য,
কি ভেবে বঙ্গবাসী (আজ) আলগা দিচ্ছে বাঁধ ॥
সহযোগ কি অসহযোগে,

তাই নে' মিছে গোলযোগে,
কর জাতের হিতে যোগাযোগে,
নইলে প্রতিপক্ষ দেশ জাগবে না
করবে আসন গেড়ে।
পূজবে মায়ের পাদপদ্ম,
যার যেমন আছে সাধ্য,
মনের মত দাও নৈবেদ্য,
নিরামিষ কি ছাগল বধ্য,
তাই নিয়ে গোল করো না টিকি নেড়ে॥
নইলে পুরুষ সাবধান,
তোমার বুকে ভান্‌বে ধান,
বঙ্গে নারী হবে প্রধান,
নিদানে নামেন শক্তি দেবাসুর রণে।
ইতিমধ্যে তাঁরা জাগ্রত,
নিয়েছেন দেশের সেবাব্রত,
এবার ইলেক্‌সন হলে আগত,
হবে কত পুরুষের দর্পহত কর্পোরেশনে॥
নামলে শ্যামা রণস্থলে,
মুণ্ডমালা দুলিয়ে গলে,
যাবে অট্টহাস্যে বিশ্ব টলে,
(তখন) পড়ে পদ্ম পদতলে,
বলেন 'শিব' রক্ষ রক্ষ রক্ষ তারা।
তাই বলি শিব জীব রাখ,
পর বাঘ-ছাল ভস্ম মাখ,
ভূত-প্রেত আপনার দেখ,
গরল হজম কর্তে শেখ,
নইলে দশভুজা হয়ে পূজা নেবেন হরদারা॥
কমিশনার·········
আছেন পুরুষ······
কাঁটা ধরেননি কোন কালে,

জানেন না কখন প্রদীপ যুলে,
কলের জল কখন এলে কখন গেলে
সংসার চলে সুখে।

তাই নারীরা রেগে,
শুয়েছিলেন সময় তেগে,
এইবার উঠেছেন জেগে,
বাবুদের দেবেন দেগে,
দেখো মিটিংরুমে ঢুকে॥
হবে সেট সেট ফাষ্ট কেণ্ডিডেট খাড়া,
ভোট লুটতে ছুটবে তখন টেক্সি করে ভাড়া,
পদী, বিধু, নিধু, সিধু ছুটবে পাড়া পাড়া,
করে আপিস কামাই, বাবার জামাই,
ভোটের টোটাল দেখবে কষে।

তখন দেখবো কোন সাহেব কত মন্দ,
করেন লেডির স্লিপিং টাইমে আবদ্ধ,
ললনা রসনা চালিলে পন্থ
শুনতে হবে হয়ে বাধ্য মুখটি বুজে বসে॥
রমণী জানে রাখতে মান,
নারীরই শোভে অভিমান,
তাঁরা যদি কাউন্সিলে যান,
ন্যায্য গণ্ডা চেয়ে না পান,
করে অভিমান বসবেন ঘোমটা টেনে।
(বলবেন) যেন কুঞ্জে আসে না বিলিতী চতুর,
বিলিতী বসন করে দে দূর,
বিলিতী বেলোয়ারী করলো চুর,
পুষো না পুষো না বিলিতী কুকুর,
বিলিতী বাবুরে বাঁধ লো চেনে॥
তখন স্টেটিস্‌টিকের শতান সেট,
বেসিন র‍্যাকেটের এটিকেট,
বড়লাটের সার্টিফিকেট,

বাড়িয়ে দিলে নুনের করের হার।
সুভদ্রা কি সরোজিনী,
না কেঁদে সারা রজনী,
হয়ে একমত সব সজনী,
লবন ভোজন-ই কর্ত্তেন পরিহার॥
অসীম নারীর সহ্যগুণ,
একদিনে ত্যাগ কর্ত্তেন নুন,
বাবুরা ম'লে হয়ে খুন,
আলুনী ব্যঞ্জন ছাড়া দিতেন নাকো পাতে।
এতে নাইকো কোন সিডিশন,
পেনাল কোডের বিভীষণ,
খালি একটা আইটেম রেমিশন,
দু'দিন বাদে অভ্যাসটা বসে যেত ধাতে॥
(আর) বসতে হলো কথায় কথায়,
নুনে যদি দুনো যায়,
চাষার কি-বা ক্ষতি তায়,
সে যে দিন আনে সে দিন খায়,
বাক্স-পেটরায় নাইকো দায়,
খসবে না তো পুঁজি।
অতি আবশ্যক যেমন মদ্য,
লোকে নুন খেতে নয় তেমন বাধ্য,
ওটা সৌখিন খাদ্য,
জরায় শরীর সদ্য বলে বিজ্ঞান সোজাসুজি॥
বরং সাহেবেরা যে হয়েছেন বেজার,
দেখে পেট্রোলের চড়ছে বাজার,
মোটর বিক্রি মোটে বিশ হাজার,
এটা বাজারে বেজায় অত্যাচার।
কি যে কষ্ট ছিল অদৃষ্টে,
মোটর ফেলে লাক্সারি লিষ্টে,
এত অনিষ্টে আছেন তিষ্ঠে,
শুধু শিষ্টভাবে নেটিভ বিষ্টের কর্ত্তে উপকার॥

ছিলেন টেক্সশাস্ত্র বিচক্ষণ,
পুরাকালের বিপ্রগণ,
জন্মাবধি আমরণ,
কর করেছেন নিরূপণ,
কৃপা করে আজ পর্য্যন্ত করেন তা গ্রহণ।
……সূতিকা, ষষ্ঠী আদি,
অন্নপ্রাশন নাম উপাধি,
টেক্স দিয়ে গাঁদি গাঁদি,
বিবাহে দক্ষিণা চাদি, শ্রাদ্ধ বাদে সপিণ্ডীকরণ ॥
সেই ব্রাহ্মণ বলে বড় বোষ্টার,
স্থার হয়ে আজ ভ্রষ্ট মিষ্টার,
স্বাস্থ্য আস্ত রাখবার চোস্ত মিনিষ্টার,
করলেন এক বিধি এডমিনিষ্টার,
চালিয়ে চতুরালি আতুরের উপর।
রোগী গেলে হাসপাতালে,
আস্তে আস্তে তলে তলে,
দয়ার একটু দাম খতালে,
কাঙ্গালীর কিছু হাতালে,
টাকের উপর উঠতে পারে টাইটেলের টোপর ॥
(যাক) সরকারী টেক্স বাড়ার সঙ্গে,
জ্বালা ধরে সর্ব্ব অঙ্গে,
নামি আমরা এক সঙ্গে,
রণরঙ্গে করতে তাতে আপত্তি।
কিন্তু মহাজন সাধুবর,
দোকানদার গুণধর,
খামকা যে বাড়ান দর,
কি উপায় অতঃপর ঘুচাতে সে বিপত্তি ॥
কাউন্সিলে বিল না হতে পেশ,
অবাক হয়ে দেখছে দেশ,
আগে থাকতে করে শেষ,

এক টাকা মন বাড়ালে বেশ,
চক্ষু-লজ্জা লেশ যত মুনের মহাজন।
হয়নি চিনির উপর নতুন কর,
তবে কেন তার বাড়ছে দর,
লোভ এনেছে লাভের জ্বর,
তাই খুঁজছে সবাই অবসর,
পুরতে পেটে পরের ধন॥
(ও মা) ছ' আনা মন ছিল কোক্,
রেলের উপর ঠেলে জোঁক,
একেবারে দেড় টাকা থোক,
মরে গেরস্ত গরীব লোক,
গয়লার শিষ্য কয়লাওয়ালা জল ঢালে তার মালে।
যেথা ধর্ম্ম কর্ম্মে ঘোর ঔদাস্য,
অর্থ মাত্র এক উপাস্য,
প্রকাশ্য ধনীর দাস্য,
সেথা অবশ্য এসব ফলবে কলিকালে॥
করতে আরাম বিষম রোগ,
একমাত্র মুষ্টিযোগ,
করে সবাই সহযোগ,
কমিয়ে দিতে হবে ভোগ,
বৈদ্য ডেকে সদ্য ধর আয়ুর্ব্বেদী পথ্য।
করি মিনতি লক্ষপতি,
পায়ে ধরি মা সাধ্বী সতী,
ঘুচাও দেশের অবনতি,
গেরস্তদের কর গতি,
বুঝিয়ে সাদা চোখের তথ্য॥
কত কারণ আছে আশঙ্কার,
কাজ কি ঘরের ভিতর অহঙ্কার,
গিলটি করা অলঙ্কার,
আপনা আপনি হুহুঙ্কার,

হয়ে লঙ্কার বিভীষণ।
আজ চৈত্রের শুভ সংক্রান্তি,
বুঝুন হিংসা দ্বেষ মনের ভ্রান্তি,
কাজ কি হিসেব কড়া-ক্রান্তি,
বিবাদে বোধ করুন শ্রান্তি,
আপনার দেশে আপনি শান্তি করুন আনয়ন॥
গায়ে রংয়ের দিনে সংয়ের ছাপ,
আজ আমাদের সাতখুন মাফ,
তাই মেরেছি তুড়ি লাফ্,
পাপ ভেবে দেবে না তাপ,
দেশের মা-বাপ-ভাই।
আবার যেন আসছে চোতে,
চড়ে এগ্নি ষাঁড়ের রথে,
গাইতে গাইতে পথে পথে,
সবার হাসি মাখান মুখ দেখতে পাই॥

৪৭

গান

সালের শেষে ময়লা কাপড় কেচে ফেল আজ।
নববর্ষে ফরসা হয়ে কর হেসে দেশের কাজ॥
(মোদের) এক ঘরেতে সবার বাসা,
(মোরা) এক ক্ষেতেরই সবাই চাষা,
অহংমার্কা মদের নেশায় ফসকে গোসায়
মজাচ্ছি সমাজ॥
ঘটায় কর শক্তি পূজা দিয়ে বলিদান,
একগুঁয়ে মোষ কেটে ফেল বরা'র অভিমান,
রাখলে মায়ের জন্ম ভাইএর মান,
নাইকো তাতে লাজ॥

হবে আপনার বোঝা আপনি বইতে,
আপনার লোকের কথা সইতে,
চাঁড়ালকে কোলে পুড়িয়ে পৈতে,
তবেই আসবে সে স্বরাজ ॥

৪৮

মুখ রেখ ভাই !
মুখ রেখ ভাই !!

নিত্য নতুন চাচ্ছে নেশান, দণ্ডে দণ্ডে ফিরছে ফ্যাসান,
তাইতে ভাসান কর্পোরেশান, এপ্রিলেতে নতুন সেশান,
খুললো মুন্সীপাল।
পুরান নাম কমিশনার, তাতে আর নাইকো অনার,
নতুন আইন করে এবার, কাউন্সিল কাউন্সিলার
নাম হলো বহাল ॥
যখন রাজা-রাজড়া হলেন অস্ত, দাঁড়ালেন উকিল-ডাক্তার মস্ত মস্ত,
এঁরা ৪৭ বৎসর করলেন কস্ত, হলেন না এখন তাঁরাও বরদাস্ত,
বরখাস্ত করে তাই ঢুকলেন নতুন দল।
এঁদের এখন মেজাজ গরম, ফুসলে-ফাসলে হবে না নরম,
চুটিয়ে এবার দেখবেন চরম, শিকড় সুদ্ধ উপড়ে তুলে
যদি না ফলে ফল ॥
নাশ কর্ত্তে কি আর দাস, এঁদের দাঁড় করালেন সি, আর, দাশ,
(ভাই) লোকে কতই কচ্ছে আশ,
এঁরা ঘুরবেন নাকো এ পাশ-ও পাশ,
থাকবেন সোজা পথে।
এঁরা স্বরাজ্যের সেকসান, ভবানীপুরের সিলেকসান,
হলেন নির্বিবাদে ইলেকসন, দেখে দেশবন্ধু
দাঁড়িয়ে আছেন রথে ॥
শহরের সকল লোক, নিজের নিজের বুকে চোখ,
না দিলে একটা ফোক, যাঁকে করছে সবে বরণ।

বুঝে এঁরা রাজা চিত্ত মন্ত্রী, এঁরা যন্ত্র তিনি যন্ত্রী,
তিনি বাদক এঁরা তন্ত্রী, যন্ত্রণা বুঝি সবার হবে বারণ ॥
বাংলা চক্ষে করলে লক্ষ্য, প্রমাণ পাবে স্পষ্ট সাক্ষ্য
বাজে খরচ লক্ষ লক্ষ, প্রত্যক্ষ প্রজার দুঃখ হয় না অবসান।
বসবে কমিশনার ক'জন, আড়াই হাজারে চেয়ার হাফ্ ডজন,
এই হারে সব আয়োজন, হলে ময়লা গাড়ী দু-খান প্রয়োজন,
টাকার তবিলে ধরে টান ॥
পুষতে অবশ্য পোয়ের ঝাড়ে, নিত্তি আপিস বাড়ছে আড়ে,
টেক্স চাপছে প্রজার ঘাড়ে, সাড়ে উনিশে আর কিসে বা
কুলোয় তার খরচা।
দু' দুটো তাই মেজেষ্টার, কিছু ক্রটী করছেন না চেষ্টার,
যাতে ছাপিয়ে প'ড়ে রেজিষ্টার, বেড়ে যায় জরিমানার চর্চা ॥
ঝাড়ু দিয়ে ঝাড়ুদার, রাস্তা করে পরিষ্কার, কর্ত্তে তাতে তিরস্কার,
চাপরাসীর আবিষ্কার, ওভারসিয়ার পায় পুরস্কার,
চাপরাসীরে কর্ত্তে সুশাসন।
এই যে এত লোক লস্কর, এরা কি সবাই তস্কর?
তাই প্রজার জীবন করে দুষ্কর, যো সো করে কর বাড়াতে
খোলা খাস বিচারাসন ॥
আছে ত সব ধার্য্য কর, জরিমানা আয়ের আকর,
তার উপর পাতেন কর, ছোট বড় কত চাকর,
নইলে ধর-পাকড় আর টাউনহল।
দশ টাকা পুঁজি ফুলুরী বেচে, জল পড়েছে উহার ছেঁচে,
অম্নি তারে সমন দেছে, আটটী টাকা ফাইন নেছে,
কাজেই পচা খুদ দে' সুদ সমেত পুষিয়ে নেয় আসল ॥
বাড়ীর নকশা কর্ত্তে পাশ, দোকান দেখবার নাই অবকাশ,
সিঁড়ি ভাঙ্গতে বাড়ে কাশ, ন' মাসেও নয় কষ্ট নাশ,
ম্লান মুখে প্রান নিয়ে খালি যাতায়াত।
সেই নকশা কর্ত্তে মকশ, খালি হয় হাতবাক্স,
টেক্সি থেকে ক্রমে রিক্স,
দোষ মন্ত্রীকে দিয়ে টেক্স,

আর কামাই করে আপিসের ডেস্ক,

বাড়ীওয়ালা হল কুপোকাত ॥

ভিটের ইটে যত ধরে লোনা, ছাদের যায় টালি গোনা,

বরগায় চলে চুপড়ি বোনা, পাপ-আসনের বিবেচনা,

ততই বাড়ে বাড়ির দর।

চাণক্যের চেয়ে বেশী কৌটিল্য, (তাই) পুরানো গুড়, তেঁতুল, ঘৃতের তুল্য,

সুরকী হতে রাবিশের অধিক মূল্য, রুল করেছেন হয়ে প্রফুল্ল,

রুল নয় শূল চালান অ্যাসেসর ॥

নিলে খরচা করে দোতলায় নল,

মল্লিকঘাটের বেল্লিক কল,

পাম্প কর্ত্তে পারে না জল, closet তাতে হয় না মোটে ফ্লাসিং।

ট্রাম, ইলেকট্রিক, মুন্সীপাল,

খোঁড়েন রাস্তা করেন খাল,

অবস্‌ট্রাক্‌সন চিরকাল, (কিন্তু আপনি আমি)

ফুটপাতে পাতলে টুল তখুনি রুল,

হয় না তাতে ব্লাসিং ॥

চৌরঙ্গীর কি চারটে মাথা, তাই উড়ে পড়লে গাছের পাতা,

ধাঙ্গড় ছুটে ধরে হাতা, ঢাকনি ঢাকা ডাষ্টবিন

অষ্টপ্রহর সাফ্।

আমরা বুঝি কন্দকাটা, তাই দশটার পর মেথর খাটা,

ধুলো উড়িয়ে বুলোয় ঝাঁটা, ভাঙ্গা ফাটা জঞ্জাল-বাক্স

যায় গড়াগড়ি পাপ ॥

জুটিয়ে ভোট হয়ে সামবড়ি,······চেয়ারে দমের গদি,

একবার তাতে বসলেন যদি (হায় রে আমার প্রতিনিধি !)

মেজাজের আর নাই অবধি, দূর করে দেন মিষ্ট শিষ্টাচার।

যদি বলেন 'তুই কেন চটিস্',

সহ্য হয় না যে 'টেক্ নোটিশ',

মান্ধাতার আমলের এই প্রাক্টীস্, জুটিশ কি সটিস্,

জাষ্টিসদের আমলের এই স্মার্ট ব্যবহার ॥

সাদরে শহরে কাম ইন্, বস কাউন্সিলে সয়েজমিন,
এবার দিতে হবে একজামিন,
দেশবন্ধু আছেন জামিন,
এই কথাটি যেন বন্ধু সদাই থাকে মনে।
বারে বারে হারিয়ে হোপ, বিশ্বাস প্রায় পেয়েছে লোপ,
লঙ্কায় গেলেই রাক্ষসের কোপ,
এই বেড়ালই বন-বেড়াল
থাকলে পরে বনে॥
যদি করতে করতে অবসট্রাকসান,
কর্তারা পান ইনসট্রাকসান,
হয় যদি ভাল কনসট্রাকসান,
তবেই লোকের সেটিসফেকসন,
আশীর্ব্বাদ মিটলে মনের আশা।
সামনে আসে নবীন বর্ষ,
দেখাও লোকে নব আদর্শ,
শুক্‌নো প্রাণে আন হর্ষ,
বাসের কষ্ট ঘুচিয়ে সবার কেনো ভালবাসা॥
একটা মনে রইলো খেদ,
এই যে সবাই করে জেদ,
নারীর বেড়ি করলে ছেদ,
বিধি বদলে দিলে তাদের ভোটের অধিকার।
তবে কেন ইলেক্‌সনে, রমণী নাই সিলেক্‌সনে,
আইন হলো করেক্‌সনে,······কেন তার নাই ব্যবহার॥
যে সংসারে নাইকো গিন্নী,
সে সংসার যে ছিন্নি হীন্নি,
বিলি ব্যবস্থা ছিন্নি ভিন্নি,
সব সংসার ধন্তি মান্তি কেবল গিন্নীর গুণে।
মা লক্ষ্মী না রাখলে দিষ্টি, বাড়ীতে পড়ে না লক্ষ্মীর বিষ্টি,
সুখ শান্তির হয় যে ছিষ্টি,
বললে ইষ্টি মেনে গিন্নীর কথা শুনে॥

দিয়ে প্রভাতে ঝাঁট গোবর ছিটে,
গিন্নীই রাখেন পক্ষের ভিটে,
জল তুলিয়ে রাখেন মিঠে,
সন্ধ্যায় বন্দনা করে তিনি দেখান আলো।
গিন্নী না দেখলে খরচপত্তর,
সবই হয়ে যায় একচ্ছত্তর,
নিত্তি বাজার কি বার চত্তর,
কত বরাদ্দ কোথায় তত্তর,
গিন্নী বই কে আর বুঝতে পারে ভার,
সেই বকেয়া মন্দা গলায় লেকচার,
থাকলে একটু মেয়েলী মিক্‌চার,
হতো অতি মিষ্ট পিকচার,
গন্ধমাখা মুন্সীপালে উঠতো পদ্মের লহর।
প্রবোধ দিতো গোঁফে চাড়া, প্রভাবতী নথ নাড়া
সভায় একটা পড়তো সাড়া,
বুড়ি নাড়া তাড়ায় তোলপাড় হতো শহর ॥
(যাক) প্রত্যক্ষে কি অন্তরে, এই অধম জীব কান্তরে,
কান্তাই চালান মন্তরে,
কার্য্য করো আর্য্যপুত্র ভার্য্যার উপদেশে,
মনে রেখো শাস্ত্রের উক্তি, শক্তির কাছে চেয়ো শক্তি,
তবে অভিব্যক্তি হবে ভক্তি,
শেষে অনায়াসে মুক্তি আসবে দেশে ॥

৬৭

গান

মুখ রেখ ভাই, মুখ রেখ ভাই
থাকুক বুকে বল।
(যেন) গলায় নাকো শেকলটা পেয়ে নাড়ি বল।

কতবার করলুম আশা,
বারে বারে ভাঙ্গলো বাসা,
পিপাসায় জ্বলে মলুম (হায় হায়)
পেলুম নাকো জল ॥
এতদিন চললো শব্দ, শুরু হয়েছে এখন জব্দ,
(কবে) ভাগ্যে হবে সুখ লব্ধ ভাবতেছি কেবল,
সারা দেশের আশীর্ব্বাদে,
জয়ী হও নির্ব্বিবাদে,
পড়ে ফাঁদে যারা কাঁদে (হায় হায়)
ঘুচাও তাদের শোকানল ॥

৫০

ছড়া

অন্ন অর্জন, অন্ন অর্জন !
তারপর তর্জন গর্জন !!
কালকে হবে হালখাতা, অঙ্গ নেড়ে বঙ্গমাতা,
খতিয়ে খতেনের খাতা,
দেখবেন কি হিসাবটা একবার।
এমন যে এই কলকাতা, কত লক্ষ লোকের অন্নদাতা,
এখনও সকলের জোটে না পেটভাতা,
কোন নেতা, কি ভ্রাতা, ছাতা দিয়ে মাথা রেখেছেন কার ॥
বাজেটে বাড়ান কার্ধা রাজার,
বেজায় গরম চাকরীর বাজার,
পাসের ছেলে হাজার হাজার, গতর খাটাতে সবাই বেজার,
রাজনীতি একটা মজার গাজন মাত্র।
বসে হুকুমদার, সব সর্দ্দার,
সদা আড়ালে থাকেন পর্দ্দার,
নিজের বেলা খুব খবর্দ্দার,
উপোসী, সন্ন্যাসী সেজে নাচে যত ছাত্র ॥

এরাই করে শিবের গান, এরাই পোড়ে, ফোঁড়ে বাণ,
নিজের রক্তে করে স্নান, দোরে দোরে মেগে দান,
এরাই করে ভিক্ষে।
মাথায় করে ঝাঁকা, ফল পাকড় পাকা,
গামছা কাপড় টাকন,
পুরুতবাড়ী পৌঁছে দেবে এই গাজনের দীক্ষে॥
তাই বলি মা মুখটি তুলে, দেখ একবার খাতা খুলে,
বিনা বামুন করা ধরে ছুলে, মূলের উপর মুনাফা কিছু
হয়েছে কি আর।
বুরোক্রেশী, কি চরোক্রেশী,
আমাদের সেই গেরোক্রেশী,
চোরোক্রেশী, জ্বরোক্রেশী, মরোক্রেশীর হাতে
নাইকো নিস্তার॥
সেই দশটা পাঁচটা সামলে ডেস্ক,
পোনেরইএর পর খালি বাক্স,
হাঁচতে কাশতে দাও টেক্স,
অন্নভক্ষ্য মধ্যবিত্তের বাঁধা পলিটিক।
কত উদয় হলেন গেলেন অস্তে,
দেখলুম বাক্যি ঝেড়ে, কোমর কস্তে,
শেষ বুঝেছি পোস্তে পোস্তে কস্তামী,
যখন যাঁর হস্তে তিনি আস্তে আস্তে টিপে ধরেন
গলার নলী ঠিক॥
রাইট রাইট রাইট, শুনছি বুলি ডে এণ্ড নাইট,
কাগজে কাউন্সিলে চলছে ফাইট,
গ্যাসলাইটের আলোয় বসে বলছে ক্যাস-নাইটের দল।
ছেড়ে বিষ্ণারণ্য, তরুণ যুবা অগণ্য, বলছে অন্ন অন্ন অন্ন,
দেখিয়ে নিজের নিজের শূন্য উদরতল॥
যৌবনের এক মহানন্দ, স্বার্থে যুবা হয় না অন্ধ,
কারুর উপর নাইকো সন্দ, করতে যায় না পরের মন্দ,
আপনার ভালর তরে।

কিন্তু ক্রমে তাদের খুলছে চোখ,
আসছে কেটে নেশার ঝোঁক,
এখন জাগিয়ে দিলে করতে রোখ,
দু' একবার বা গিলছে ঢোক,
পিতামাতার হতাশ মুখ দেখে ঘরে ঘরে ॥
খদ্দের কমা বিদ্যের বাজার,
ছোকরারা সব পড়তে ব্যাজার,
তারা বুঝেছে পাসের মজার,
গেল ম্যাট্রিকে তিনটি হাজার
ছেলে কমেছে একজামিনে।
মেডিকেল কলেজে মেলে না সিট,
ল'য়ে টাইট অ্যাডমিট্,
হয় না শিবপুরেতে খরচা মিট,
শিখলে অডিট,
চাকরী হয় না সার্টিফিকেট জামিনে ॥
এর উপর বিদ্যের সঙ্গে বিলাসবৃত্তি বাড়ছে বঙ্গে,
চিকন-চাকন সাজিয়ে অঙ্গে,
মন মেতেছে প্রেমের রঙ্গে,
পতঙ্গের প্রায় সব উড়ে পাখা নেড়ে।
পলিটিক্-এ যেমন স্বরাজ,
প্রেমেও তেমনি সপটা দরাজ,
সতী করতে নয়কো নারাজ,
বিরাজ যদি বরণ করে এসে বারান্দা ছেড়ে ॥
আচ্ছা! এদের কি দিব অপরাধ,
এমন সব সোনার চাঁদ,
মিটল না মনের কোন সাধ,
তাই রাঙ্গা ফল দেখে কাঁদ পানে চায় না নজরে।
তার উপর নিত্য নতুন পড়ছে যুক্তি,
নিত্য নতুন শুনছে উক্তি,
যুবক যদি চাও হে মুক্তি,

হারিয়ে পুরাতনে শ্রদ্ধাভক্তি,
নিজের শক্তি বাড়াও সজোরে ॥
কেউ বুঝিয়ে দিচ্ছে পরিষ্কার,
ঈশ্বর হলে নমস্কার,
মন্দ একটা সংস্কার,
পুরোহিতের আবিষ্কার,
ভয় দেখাতে সংস্কারক বীরে।
ঈশ্বর যদি থাকতেন ঠিক,
বুঝতেন আমাদের পলিটিক্,
সমাজনীতি ততোধিক,
তার সঙ্গে ইকনমিক্ রইতেন না আড় হয়ে
ক্ষীরোদসাগর নীরে ॥
থাকুক বা না থাকুক হরি,
আপনা আপনি ঘর করি,
একটা কথা জিজ্ঞেস করি,
এসব ছেলে মরিয়া হয়ে তেরিয়া হলে
করবে কি উপায়।
পেটের ভিতর হলে রায়ট,
এরা সত্যি হবে পেটরিয়ট,
চাইবে রক্তচক্ষে কটমট্,
তখন স্পিকটি নট,
করলে মিটবে না ত দায় ॥
উঠলে জেগে ক্ষুধাসুর,
বদলে যাবে সবার সুর,
হবে প্রত্যুত্তরে দর্পচূর,
অনেক গোপালের কপালে উঠবে নেত্র।
মনে মনে বুঝছ ত অবস্থা,
যা হোক কর তার শীঘ্র একটা ব্যবস্থা,
খানিক বন্ধ রেখে বাঁধা নিজের বক্তা,
রাস্তা খুঁজে দেখিয়ে দাও যুবার কার্যক্ষেত্র ॥

আগে অন্ন অর্জন, অন্ন অর্জন, তার পর তর্জন গর্জন,
পুলিশ সার্জন, কি মিনিস্টার বর্জন,
সেই অন্নের পথে উঠছে রোজ
গজিয়ে কাঁটাবন।
রসদ বিনা হয় না লড়াই,
খালি পেটে মুখের বড়াই,
সেই অন্নদায় ত আগে এড়াই,
অন্য কাজে ধন্য হতে তখন দিও মন॥
ফিরিয়ে ভোল রকম রকম,
শুধু ডিগ্রী দিলে বি, কম,
হতে পারে দু-একটা চাকরি করা ইনকম্,
(কিন্তু) কমার্স ত সব ভাটিয়া গোরা
মাড়োয়ারীর হাতে।
আছে ধনী উকিল, ধনী কাউন্সিল,
ধনী কণ্ট্রাক্টার,
ইদানীং হয়েছে ধনী কত মাতব্বর,
ডাক্তার এগিয়ে এসে হল না তারা দেশের প্রটেক্টার,
খুলল না কেন মিল, ফ্যাক্টরী,
একটা উপায় হয় যাতে॥
যুবারা যখন মন দেয় পাঠে,
বড় বুক ফাটে বড় বুক ফাটে,
হাড়ে হাড়ে বিঁধে শিরে শিরে কাটে
কিবা ভবিষ্যৎ কিবা ভবিষ্যৎ সব পথ বন্ধ।
এই যে কষছ বসে অ্যাল্জাব্রা, ট্রিক্নোমেট্রি,
ক্যাশ দে' শিখছে গ্যাসের নাম,
টেষ্টটিউবের কেমিষ্ট্রি,
প্রেম চাপলে স্কন্ধে কি,
পেট্রিয়াটিক ছন্দে লিখে ফেলছে কোথাও,
এই পণ্ডিতির গণ্ডীর ভিতর
নাই ত কোথাও উপার্জনের গন্ধ॥

কলের চোটে কাজের হাতে
অসাড় করেছে পক্ষাঘাতে,
নমস্ত আজ ব্যাপারী তাতে,
ভস্ম ঢালছে চাষার ভাতে,
ধরে দিয়ে কিছু চাঁদার খাতে, এঁরা উঠেন জাতে।
হয়ে বসেন দেশপূজ্য,
দেশ কিন্তু তেষ্টায় মরে,
ফাগুন থেকে জষ্টিতে,
শ্রাবণের বন্যা আবার কুঁড়ে ভাসায় বিষ্টিতে॥
মরে মানুষ জল শুকোলে,
ওলাবিবির দিষ্টিতে,
কালান্তর পালাজ্বর,
লেখা বাকী সবার কোষ্টীতে,
দেশ উদ্ধারের লিষ্টিতে বলে কি সব করে থাকলে।
আর নিশান ধরে নাচতে দেখে অপোজিসন কার্যা,
হয়নি যারা মত্ত আজও প্রভুত্বের মদে,
মাথা রেখে সেই সব ভদ্রলোকের পদে,
ভাসিয়ে বক্ষ চক্ষের জলের নদে,
বলছি কাতরে, রাখ বঙ্গ মাতঃরে
ঘোর বিপদে মায়ে কর পার।
একটু কমিয়ে ঐ ঘোড়ার এণ্ডা, প্রোপাগেণ্ডা,
আর নেওয়া পাওনা গণ্ডা, সেজে পাণ্ডা,
ছেলেদের করুন মেজাজ ঠাণ্ডা, শক্তির ষণ্ডা,
না হয়ে পরের অধীন বুঝুক তারা স্বাধীনতা তার॥
মিনতি করে বলছি সকল ভদ্দরে,
যাঁরা লজ্জিত নন সজ্জিত হয়ে খদ্দরে,
দাঁড়াতে এই চৈত্তির শেষের রোদ্দুরে,
ভাসতে যশে কোমর কোষে
দেশের অভাব ছাড়াতে।
(নেইকো) অভাবের যে হয় গো অধীন,

সে যে সবার চেয়ে পরাধীন,
যে ঘুরে চাকরী খুঁজে দিন দিন,
সে দেশ করতে স্বাধীন ক'দিন পারে দাঁড়াতে ॥

৫১

গান

আবোল তাবোল বোল বলে
আর নিজের কোলে ঝোল টানে,
দুঃখে যাদের বুক ফাটে হায়!
চায় না তাদের মুখপানে।
মরে মরুক সব গেরস্ত, এরা প্রভুত্ব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত,
আর উপস্বত্ব নিতে মত্ত নিত্য নূতন ভানে ॥
নিস্বার্থ দেশের হিতে মাত্র, প্রাণ দিতে চায় যত ছাত্র,
যেন দিবারাত্র কৃপাপাত্র, ব্রতী আত্ম-বলিদানে।
কাজের বেলা বাজে সাজনে, তাদের গো মাতায় গাজনে,
তারা রঙ্গ ভেবে সঙ্গে চলে,
জয় বঙ্গ জয় বঙ্গ বলে,
অঙ্গ বিঁধে বাণে ॥
কাজ ফুরোলে যান গো ভুলে,
ধর্ত্তা দেওয়ার কর্ত্তারা সব,
ছেলেরা ধন্না দিলে কান্না নিয়ে
শুনেন নাকো কানে ॥

৫২

হোমরুল

Mr. Dutta— এ'বাঙ্গলা'র যে হোমরুল,
তার নাইকো কোন মূল।

ওই এসেছিল মণ্টেগুদা,
নাগাবে হুল থু॥
(এ'বার পা'ব যে হোমরুল।)

ছিলুম যখন কমিশনার,
দেখেছ ত ভেটের বাহার।
বড় কেউকেটা নয়—'এম, পি', হলে,
দে'খবে তখন ইশের মূল॥
(এ'বার পা'ব যে হোমরুল।)

(তখন) ফ'লবে সোনা কাপাস গাছে,
মাণিক পা'বে হালের নিচে,
ঝরবে মুক্ত—পাবে মুফ্‌ত,
নইলে আমায় বল fool॥
(এ'বার পা'ব যে হোমরুল।)

(সবাই) দেখেছ ত আমার spirit,
দিনকে আমি করি night,
'এম, পি,' হ'লে আমার বোলে,
দেখবে চোখে সরষে ফুল॥
(এ'বার পা'ব যে হোমরুল।)

চুনগলির ঘেউ ঘেউ স্বরে,
কাণে সবার তালা ধরে।
হাকুরে চাবুক ক'রব সিধে,
তখন তা'রাও হ'বে মসগুল।
(এ'বার পা'ব যে হোমরুল।)

কেউ ভেবনা'ক সবই ভেস,
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
Canvassing দাও শুরু ক'রে,
আমার তরে নাইকো ভুল॥
(এ'বার পা'ব যে হোমরুল।)

কাটব মাথা সবার হাতে,
চি'নব কি আর কাকেও ধাতে।
তখন 'এম, পি,' হব ডিনার খাব,
ফোটাব গায়ে বিষম হুল ॥
(এ'বার পা'ব যে হোমরুল।)

Mrs. Dutta— হ্যাঁ গা! পে'য়েছ হোমরুল?
হ'ব আমি Lady M. P. নাইকো তাতে কোন ভুল,
Sure shall I shine bright,
তুমি mere satellite,
আমার sakeএ honoured হ'বে,
কত ফুটিয়ে দেব ফুল।
(হ্যাঁ গা! পে'য়েছ হোমরুল?)

তোমায় বল চিনত কেডা?
Had I not been Mrs. Dutta ,
এখন বেঞ্চে বসে বিচার কর,
বল·কেবা তাহার মূল?
(হ্যাঁ গা! পে'য়েছ হোমরুল?)

র‍্যানকেন যোগা'বে স্যুট,
কথ্ বাট্সন্ দেবে বুট,
হ্যামিল্টনের pearl নেক্লেস,
আর দুলবে কাণে হীরের দুল!
(হ্যাঁ গা! পে'য়েছ হোমরুল?)

যখন ব'সব গিয়ে সভার মাঝে,
ক'ইব কথা 'এম, পি', ধঁাজে,
কত jealous eye তোমার পানে,
থাকবে চে'য়ে চুলচুল।
(হ্যাঁ গা! পে'য়েছ হোমরুল?)

Master Dutta— (বাবা ! রেখে দাও হোমরুল ।)
Humbugism বাইরে ক'র,
লাভের কথা এখন বল,
ভেবে ভেবে সোনার তনু,
দিনে দিনে হ'চ্ছে স্থূল,
(রেখে দাও হোমরুল ।)

ওতে কি গো ভ'রবে পেট,
দেখছ হাতে copper plate,
প্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় হঠাৎ famous হয়েছি,
সাহিত্যিকের সম্মিলনে আসন নিয়ে ব'সেছি ।
ভেবে ত দেখছি বটে,
শুধু হাত কি মুখে ওঠে,
সকলের সার টাকা ধর্ম্ম অর্থ কাম ।
টাকাই সারাৎসার, টাকাই স্বর্গের দ্বার,
টাকা বিনা চাই না কিছু,
চাই না বাজে নাম ॥

Mr. Dutta— ওরে বেটা হতভাগা— নাই কি তোর shame,
বেশ্যা ম'ল—তার টাকাতে দিলি কিনা claim !
হায়া পিত্তি নাইক' তোর—
সা'জলি ভিক্ষে-ছেলে,
পুড়িয়ে দিলি মুখটা আমার,
নাম ডোবালি জলে !

Master Dutta— কি ক'রব বাবা !
অশোক রাজা লি'খছে তাম্রলিপি, বেশ্যার heir আমিই বটে,
ভুল না তা'তে দেখি ।
বাবা ! বেশ্যা কিবা ছার—
চণ্ডালের পো হ'তে পারি পেলে টাকার ভার !
টাকা বিনা চোখে আমি দেখি যে দিকশূল,
বাবা ! রেখে দাও হোমরুল ॥

Miss Dutta— Papa ! চাই না হোমরুল।

Light Houseএ ক'রব join,

নামটি এমন ক'রব coin,

Lieutenant Miss Dutta হবে সবার cynosure,

আঁখিবাণে নাশব যত জার্মান বগার।

কিনে দাও একটা টাট্টু,

ঘুরে ফিরব যেমন লাট্টু,

Uniformএ হিঁদুয়ানি হাতেতে ত্রিশূল,

ধরব ঘাড়ে জার্মানেরে যেমন ভীমরুল।

(Papa ! চাই না হোমরুল ॥)

(কপ্‌নি পরিয়া বৃদ্ধের প্রবেশ।)

Shame—Shame ! Fie—Fie !

Grand Papa ! লজ্জা নাই,

নগ্নপদে নগ্নদেহে লেডির সম্মুখে !

Smelling salt কোথা গেল ?

Hysteria বুঝি হল !

Papa—Mama ! কেন রহ দোঁহে অধোমুখে !

বৃদ্ধ— কিয়ে শালি ! এত বুলি

শিঁখলি কোথায় বল !

লজ্জা পে'য়ে চোখটা যে তোর

ক'রতেছে ছলছল !!

আমার কোলে মানুষ হ'লি,

সে সব কি তুই ভুলে গেলি,

আমায় দেখে সরম করে

করলি যে তুই ঢং।

অবাক হ'য়ে দেখছি আমি

জেলেপাড়ার সং ॥

Dutta— মাথা কাটা গেল আজ কথা কয়ে
কিবা কায়,
এই কি তাহার কাণ্ড, পিতা বলি যা'রে ?
বৃদ্ধ— না বলিতে পার তুমি অনুগ্রহ করে।
Dutta— 'এম, পি',র পিতা তুমি নাহি আছে লাজ,
কৌপিন ধরিলে দেহে কেন বল আজ ?
Really father, I am ashamed of you,
Kindly save me from the infernal view.
বৃদ্ধ— তা ত বটে, বেটা আমার সভ্য হয়ে গে'ছ,
বাজে হুজুক নিয়ে তুমি হোমরুলে মেতেছ।
আগে মিলত যাহা ছয় আনাতে,
এখন মিলে নাকো ছয় টাকাতে,
দেশের তাঁতি ম'রে গে'ছে তোমাদের কৃপায়।
এখন Manchesterই লজ্জা রাখে
পোড়া বাংলায়॥

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হল,
উলু খাগড়ার প্রাণটা গেল,
একাদশে বৃহস্পতি মাড়োয়ারির ঘর।
রাখছে চেপে যত কাপড়,
দিতে হবে একটি চাপড়,
ন'ইলে আমার মত সারা বঙ্গে
সবাই হবে দিগম্বর॥

কার্পাসের চাষ আবার কর,
তাঁতিরা সব এ, বি, ছাড়,
চাষাদের সব বুকে টান,
সেই ত' আসল হোমরুল।
নইলে কেবল বক্তৃতাতে,
ভিখারী যায় অধঃপাতে,
নিজের ঘরটি গ'ড়ে আগে, কর দেখি তাহাই rule,

বুড়োর কথা শোন দেখি,
সেই ত' আসল হোমরুল।
নইলে তোদের সবই মেকি, সবই তোদের বিষম ভুল।
নাও— আসল হোমরুল॥

৫৩

গান

লা'গল দেশে হুলুস্থুলু,
পা'ব যে হোমরুল।
চোখ রাঙ্গিয়ে চুনোগলি,
বাগিয়ে ধরে বিষম রুল॥
কেউ আহ্লাদে আটখানা,
কেউ দেখেন ধরা সরাখানা,
কা'রও মুখে তুবড়ি ছোটে,
কেউ শুকনো ডালে ফোটান ফুল॥
(হেথা) ভা'বছে লোকে ঘরে ঘরে,
লজ্জা কিসে রক্ষা করে,
ছ' টাকাতে মোটা কাপড়,
তা'ও মেলা ভার, যায় যে কুল॥
(যেথা) কাশিমবাজার মুর্শিদাবাদ কাপড়ে ঢাকায়
বিলাতের মেম দিত যে বাহার,
(আবার) ঘরে ঘরে চরকা ছিল,
পুড়ে গেল, বল সেটা কাদের ভুল॥
যদি ক'রতে পার কার্পাসের চাষ,
বু'নতে পার নিজেদের বাস,
তখন নিজেদের হোম, নিজেই তোমরা
করতে পা'র রুল।
নইলে পোড়ার মুখটি পুড়বে আরও
চাও যদি কেন্ হোমরুল॥

৫৪

আবোল তাবোল*

আজ চৈত্রের দুপুর রোদে,
বেরিয়েছি পাগলা আমোদে,
জানি না কি খেয়াল মাফিক্
বক্‌বো আবোল তাবোল।
যদি কারো গায়ে লাগে,
উঠবেন না ক্ষেপে রাগে,
মুখের কথা নয় ত কুড়ুল,
গাঁতি কিম্বা সাবোল॥
কেয়াবাৎ কাউন্সিল রঙ্গমঞ্চ,
প্লে হচ্ছে তায় তঞ্চ-নঞ্চ,
কিম্বা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ
নামক প্রহসন।
যারা ছিল ইনডিপেনডেণ্ট,
জয়েন করলে স্বরাজ্য টেণ্ট,
এবার বুঝি হয় কুপোকাৎ
কনষ্টিটিউসন॥
নন্‌-কোঅপারেশন ম'রে,
উঠলো দানোয় মূর্ত্তি ধ'রে
চুনপারা মুখ মাইনে হারা
দেখুন মিনিষ্টার।
বিলকুল গ্রাণ্ট হচ্ছে বাতিল,
চুলোয় দিতেই ফাটছে পাতিল,
চাকরি চেঁচায় রিট্রেন্‌চ্‌মেণ্ট
বড়ই সিনিষ্টার॥
দেশ দাশেরা করছে নৃত্য,
শুনছি অনেক পুলিশ ভৃত্য,

* রচনা—[illegible] ঘটক। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘটক মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং তাঁর অনুমতি-ক্রমে মুদ্রিত।

রেগুলেশন ছেড়ে এবার
টান্ করবে লেদার।
গুণ্ডাইজিম বাড়বে নাকি?
বাড়তেই কি আছে বাকি,
লাট করবেন নিজ খরচে
সিমলা যাত্রা দেদার॥
অপোজিসন ফন্দীবাজ,
পাকা চালিয়াতের কাজ,
জানেন বলে চাল চেলেছেন
এক কিস্তী মাতের।
শুধু কম্পরসের জোরে,
উল্টোদিকে পাল বা ঘোরে,
সি, পি, নয় এ জন্মভূমি
হচ্ছে উমিচাঁদের॥
যা হবার সে তাই হোক,
এবার অন্যদিকে চোখ,
ফিরিয়ে দেখুন এসেমব্লীতে
চলছে মজার কাণ্ড।
না-মঞ্জুর লবনের ট্যাক্স,
রেভিনিউ যার দু' চার ল্যাকস্,
কাজেই সরকার উপুড় করে
দিলেন ভিটোর ভাণ্ড॥
আবার কি হচ্ছে দেখুন,
জানি না এ বেন্ কি খুন,
গুঁড়িয়ে মিউনিসিপ্যালিটি
হয়েছে নূতন ঢালাই।
আনকোরা বিলাতী ছাঁদে,
এবার প্রাণ বাঁচে না বাঁচে,
কে বল্‌বে শহর ছেড়ে
কোনখানেতে পালাই॥

"চেয়ারম্যানসিপ" গেল উড়ে,
'মেয়র' নাকি বসছেন জুড়ে,
করপোরেশন মজলিসটির
সর্ব্ব উচ্চ চেয়ার।
সেলামী দু' লক্ষ টাকা,
হাইয়েষ্ট বিডার দিচ্ছে পাকা,
শুনছি, কিন্তু হলপ করতে
করছি নাকো ডেয়ার॥
কমিশনার অল্‌ডরম্যান,
সব স্বরাজ্য দল প্রধান,
মারলে গরু জুতো দানটা
অন্তত হবেই।
বাড়ার ভাগে হচ্ছে আশা,
সুবার্বেও গ্যাস জ্বলবে খাসা,
মশা আর ছারপোকার বাসা,
রইবে না এ ভবেই॥
দেখুন দেখুন আবার চেয়ে,
স্বাধীন হচ্ছে হিঁদুর মেয়ে,
সতীর মাথা পতির চেয়ে
ছাপায় সমাজে।
খোঁপা হচ্ছে বিউনী সার,
ঘোমটা তার টেকে না আর,
মত্ত সবাই ভোট দিবার ও
বক্তৃতার কাজে॥
সাহিত্যেতে আবার দেখুন,
চলছে রোমান্স গল্প ও খুন,
'কাঁটার ফুল' আর 'চরিত্রহীন'
ইয়ং বেঙ্গল হাতে।
মাসিকপত্র বাড়ীর শিরে,
ভিজে কাপড় চিত্রশিরে,

গড়ছে কেমন বাহার দিয়ে
শিল্পী কত্তার পাতে ॥
কামশাস্ত্রের বেজায় কাটতি,
পড়তো নাকো মোটেই ঘাটতি,
যদি না হ'ত প্রসিকিউসন
আবার দেখুন চেয়ে।
সন্ধ্যাবেলা কি দোকানে,
মোদক বিক্রি হু হু টানে,
চশমা আঁটা ছোকরা
পয়সা দেয় কিছু না চেয়ে ॥
আবার দেখুন একটার তোপ,
একদম হয়ে গেল লোপ,
টাইমের ঘাড়ে ইকোনমি
দিলে কোপ জোরসে।
কার সাধ্য এঁচে বলে,
কোন ঘড়ি পাংচুয়েল চলে,
খামখেয়ালী ঘড়ির দলে,
চল্‌ছে যে যার ফোর্সে ॥
সরকার কি বাহাদুর,
দেশের দৈন্য করতে দূর,
তোপ দাগবার মস্ত
বাজে খরচ দিলেন তুলে ॥
হায় কি পেনি ওয়াইজ ফান,
উঠে গেল ট্রু টু দি গান্,
দুর্ভিক্ষ দৈত্য এবার
চড়লো বুঝি শূলে ॥
চলুন এবার অন্যদিকে,
ফিরিয়ে দেখুন চতুর্দিকে,
রংপুরেতে কি প্যাথেটিক
দৃশ্য দেখা যায়।

হিন্দু-মুসলমানের প্যাক্ট,
কাগজ-কলমে ইন্‌ট্যাক্ট,
নারী-নির্য্যাতনের ফ্যাক্ট,
তাকে বা ওল্‌টায় ॥
ফূর্ত্তি করে ভাবছিলুম যে
পাকলো বুঝি মিল,
পাস হয়েও প্রায় এসেছিল
ভাই পাতানো বিল।
মিলেও এসেছিল প্রায়
পেঁয়াজে ও কাঁচকলায়,
লুঙ্গিতে ও থান ধুতিতে,
এমন সময় দিল্
বিগড়ে দিলে চাচা ছুঁড়ে
খুড়োর গায়ে ঢিল ॥
পীরের সিন্নী, হরির লুটে,
পাগড়িতে আর তাজে,
সবে মিলে যাচ্ছিল ভাই
সন্ধ্যা আর নমাজে।
বদনাতে আর জল-ঘটিতে,
পয়জারে আর তাল-চটিতে,
দরগাতে আর মন্দিরেতে,
বেমালুম সব কাজে,
এমন সময় কাণ্ড এ কি
শুনেই মরি লাজে ॥
এমন ধারা কার্য্য যদি
আবার ফিরে হয়,
আল্লা হরি স্টপ করুন
এর সেকেণ্ড অভিনয়।
তা'হলে ভূত মামদোর সঙ্গে,
লড়াই করবে বিকট রঙ্গে,

কংগ্রেস খিলাফতের মধ্যে
ফারাক সুনিশ্চয়।
হাসিয়ে সাদায়, কালোয় কালোয়—
যুদ্ধ ভাল নয়॥

৫৫

গান*

আমরা সবাই শিবের চেলা (আমরা) ভূত গাজনের সং,
বছর ভ'রে তা ধেই তা ধেই নাচছি জবর জং,
(মোদের) এক চোখেতে মায়ার কান্না,
এক চোখেতে হাসি।
(আমরা) ঝগড়াঝাঁটি কুৎসা হুজুগ স্বার্থ ভালবাসি॥
(মোদের) চোখে মুখে দিলেই তা হয়
চুন-কালি আর রং।
রংপুরেতে মুসলমানে, হিঁদুর বিবি ধরে টানে,
কাউন্সিলেতে তিন দলেতে নিত্যি রেগে টং॥
মুন্সীপালের বৈঠকেতে, রেটপেয়ারের মুণ্ড পেতে,
ব'সে এক এক প্রতিনিধি জাহির করেছেন ঢং।
মহেশ্বর ধর্ম্মপীঠে, লাল সাবান ফুঁড়ে পিঠে,
রসের চড়ক দোলায় ঘোরেন মহান্ত বেদম।
সাহিত্যে সমাজে ঘরে,
সং নাচে পুরো বছরে,
সংয়ের সং আজ এক নজরে,
দেখুন ভড়ং ভং।

* রচনা—সতীশচন্দ্র ঘটক। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘটক মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব

খৃষ্টান হওয়া উঠে গেছে, বেহ্মগিরি কোরে।
হিঁদুয়ানী দেশে ফিরেছে, আবার পুরোদমে॥
এখন গোরার পোশাক পরেন বাবু,
ব্রীজ খেলেন ছেড়ে গ্রাবু,
মুর্গি-মটন আরো কিছু যায় বটে গর্ত্তে।
কিন্তু ঠাকুরতলায় টুপি খোলেন,
হাই তুলতে হরি বলেন,
হলিডে করেন হিঁদুর পুজো-পর্ব্বে॥
তবে এখন Science বসেছে মাথায় চড়ে,
কচি খোকাও বিজ্ঞান পড়ে,
বৈজ্ঞানিক না অর্থ গড়ে,
কেউ করে না কোন কর্ম্ম।
(তাই) বেদের গান হচ্ছে রাষ্টিক,
যোগ অভ্যাস Gymnastic,
গায়ত্রীটি hypocriticএর Mystic একটা মর্ম্ম॥
দশ অবতার Evolution,
চণ্ডীপাঠ Elocution,
হোমে হয় Sanitation ম্যালেরিয়া নাশ।
রাখলে টিকি North Poleএ,
Magneticএ বুদ্ধি খোলে,
Oxygenএ শরীর কোলে,
করলে একাদশীর উপবাস॥
পৈতেটা অন্ত কি আর,
Electric conductor,
তুলসীর মালা এক এক factor,
Healthএর given numberএ।
Municipality অমরাবতী,

ইন্দ্র তার সভাপতি,
বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম Elected Commissioner
Committeeর member-এ ॥
রিসার্চ স্কলার ছিলেন শিব,
রেডিয়াম স্নেম কালীর জিভ,
অস্ত্রগুলো কেমিষ্ট্রি আর অল্‌কটের occult।
ছিল না তখন copyright act,
ঋষিরা তাই আসল fact,
Selfish tactএ লুকিয়ে গেছেন
এইটেই যা fault ॥
বুঝা যায় দেখে মাঝে মাঝে
'আই-এম-বিক্' ছন্দ,
দিশী বিদ্যেটা মুনি-ঋষিদের
ছিল নাকো মন্দ,
তবে না থেকে মোটে পেঁজের গন্ধ,
লেখায় হয়নি তেমন তার।
না থাকলে I am up, given my top,
Here there no where খোলে কি বিদ্যের বাহার ॥
একটু যদি ইংলিশ পড়ে জাহাজ চড়ে,
একলা কি জোড়ে যেতেন তাঁরা বিলেতে।
ঢুকে Cambridge কি Oxfordএ
কিম্বা Education বোর্ডে,
Learningএর hardটা বাড়িয়ে নিতেন
কোমথ, মেলথাস, মিলেতে ॥
তা হ'লে না হ'য়ে নেকেড নিগার,
বনের বেগার,
হতেন Huxley কি সোপেন হেগার,
ব্যাস, বাল্মীকি, পাতঞ্জল, কপিল।
হতেন সেই বসু Law Member,
উকিলপাড়ার বাজখ্যোর জেমার,

হয়ে প্রেসিডেন্সির প্রফেসার,

বৃহস্পতি পেতেন আমাদের মতন Pupil ।

শেখাতে বৈষ্ণব-সাহিত্যের মর্ম্ম,

নারদ পেতেন ইউনিভারসিটিতে কর্ম্ম,

গেয়ে হরিনাম ক'রে গলদ ঘর্ম্ম,

বেড়াতে হোত না পাঁচ দুয়ারে করে ভিক্ষে ।

শুকদেব লিখতেন text-book,

কমিটি কাটতেন ফুলচুক,

টাউন হলে ফুলিয়ে বুক,

শৌরি লেক্‌চার দিতেন পলিটিকস শিক্ষে ॥

(এই দেখ) মন্মথবাবুর লক্ষ্মী ছেলে,

হেমেন আমাদের পড়ে এল, এ,

পুরাণ পদ্ধতি ফেলে,

করলে কেমন দুর্গোৎসবের আয়োজন ।

বাপ গিয়েছে মফস্বলে,

উপযুক্ত পুত্র বলে গঙ্গাজলে, বিল্বদলে,

পূজ্‌তে মাকে হেমেনের উপর ভারার্পণ ॥

পোদ সমাজের শিরতাজ,

মাণিক মোহন পদ্মরাজ,

ধরে পৈতেধারী সাজ,

বিরাজিত দেখি আজ হেমেনের সাথে ।

নাহিক জ্ঞান নত্ত-বত্ত,

বিদ্যে এঁর বিখিদত্ত,

বিজ্ঞান আর প্রত্নতত্ত্ব,

যেখানে ইনি খোঁড়েন গর্ত্ত,

শিলালিপি তাম্রশাসন ঠেকে যায় হাতে ॥

হেমেনের বাপের অর্থ,

মাণিকের বৈজ্ঞানিক অর্থ,

আর বঙ্গমাতার মঙ্গলার্থ,

নবীন মুরতি দুর্গা বাগানে উদয় ।

পিচাটিয়া পাম টবে,
নূতন কলাবউ হবে,
পাতায় প্রজাপতি রবে,
হেমেনের পরিবারের আবদার অতিশয় ॥
তপ্পাপাত্র ঠাকুরের ছেলে,
পৈতৃক পৈতেগাছটি ফেলে,
ইংরাজি চাল চেলে,
সাজলেন সাহেব প'রে হ্যাটকোট।
ছেড়ে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম,
শিখতে কুম্ভকারের কর্ম্ম,
নিয়ে নিজের কৃষ্ণ চর্ম্ম,
গিয়েছিলেন কামস্কট্‌কায়
ক'রে এক ধনীর সঙ্গে পোট ॥
এখন ইনি বিলিতী কুমোর,
আটাশ উমোর, বেজায় গুমোর,
খান ডুমুরের ঝোল,
বলেন ফিগ্‌ স্যুপ।
ইনি গড়তে পারেন কাপ্‌, জগ্‌, সসার,
তাতে হয় বেশ পসার,
তবে ভারতমাতার সুসার,
কামস্কট্‌কায় মাটি মেলে না
খুঁড়ে দেড় কুড়ি কূপ ॥
এই Bottompot সাহেব ক'রে রোক,
নিয়ে নগদ তিন শ' থোক,
মর্ত্যলোকে আনলেন আলোক,
প্রতিমা গড়েন নূতন ধরণ।
আসছে লোক লাখে লাখ,
যে দেখে তার লাগে তাক,
বিলিতী বিদ্যের একি পাক,
কারিকুরির বালাই নিয়ে হয় যেন মরণ ॥

পার্ব্বতীর মুখ ভুটিয়া ছাঁচে,
মা দাঁড়িয়ে আছেন আমড়া গাছে,
অস্ত্রআইনে বাধে পাছে,
দশ হাতে তাই নূতন হাতিয়ার।
পঞ্চ শঙ্খ পঞ্চ করে,
বিবাহ ঘোষণা করে,
এক করে দরখাস্ত ধরে,
চাঁদার খাতা অন্য করে দিতেছে বাহার॥
আর এক করে ক'রে ভক্তি,
টনিক মিক্‌চার ধরেন শক্তি,
হাত থাকতি অন্য দু-হাত দেখান ইশারায়।
লক্ষ্মী কোথায় গেছেন চ'লে,
কাবলিওয়ালা তার বদলে,
দাঁড়িয়ে মায়ের বাঁ বগলে,
চক্ষু মুদে করে সুদ আদায়॥
চশমা পরা চারু চক্ষে,
ভারসিটি গাউন মেডেল বক্ষে,
সরস্বতী দাঁড়িয়ে দক্ষে
বেগুতে বাজান অপেরার গান।
তার পায়ের তলায় গণেশ দাদা,
কাটা শুঁড়ে Bandage বাঁধা,
নিয়ে কাগজের গাদা,
টাইপরাইটার টিপছেন দিয়ে মন-প্রাণ॥
কার্ত্তিকের Evening coat,
সিগারেট আঁটা ঠোঁট,
হাতে লেখা হ্যাণ্ডনোট,
ভোটতলাতে হরিলোট দিতে যাচ্ছেন উনি।
প্লেগ বিস্তারের ভরে,
নিয়ে যেতে হাজত ঘরে,
তাঁর ইঁদুরের লেজটি ধরে,
মিউনিসিপ্যাল ইনস্‌পেক্‌টার কচ্ছে টানাটানি॥

দম দিয়ে গ্রামোফোন যন্ত্রে,
বিলাতী আমদানি মন্ত্রে,
নব্যভাবে সভ্য তন্ত্রে,
বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পূজা যা'র।
ইলেকট্রিকে পাঁঠা বলি অতি চমৎকার,
যাত্রার বদলে তিন রাত্রি লেকচার,
শেষে বিজয়ার শোক-সভা চূড়ান্ত ব্যাপার॥
এই রকমই ভক্তি দেখে,
শক্তি গেছে শক্তি থেকে,
এখন মুক্তাহারা শুক্তি এনে,
বসাই সবাই ভিটেতে।
নৈলে যে দুর্গানাম নিলে মুখে,
দুঃখ পালায় মন দুখে,
সেই দুর্গার দোরে মাথা ঠুকে,
কেন গাধার বোঝা মোদের পিঠেতে॥

৫৭

দিল্লীকা লাড্ডু

করজোড়ে করি বিনয়,
দিচ্ছি নিজের পরিচয়,
শুনুন সব মহাশয়,
মিনিট পাঁচেক দিয়ে মন।
নিয়ে কৃশ দেহ রুক্ষ অঙ্গ,
অদৃষ্টের দেখতে রঙ্গ,
আলো করেন যাঁরা বঙ্গ,
আমি তাঁদেরি মধ্যে একজন॥
কখন নাম আত্তাহুদ্ধ,
কখন বা হয় আতুদ্ধ,

আছুড় গা ছেঁড়া মাদুর,
জন্ম সেই নন্দনে।
বিধাতার সেরা ছিষ্টি
মায়ের কোল বড় মিষ্টি,
কোন মতে গেনু ত তিষ্টি,
পড়ে মায়ের মায়া বন্ধনে॥
বেটি নিলে কোলে তুলে,
ভূমিষ্ঠ কষ্ট গেলুম ভুলে,
কাঁকে কোলে দুলে দুলে,
লাগলুম আমি বাড়তে।
জীবনে জন্মাল মায়া,
কারাগার আর নয়কো কায়া,
রোদে দেখে নিজের ছায়া,
ইচ্ছে হল না এ খেলা ছাড়তে॥
বাড়ীর লোকে কথা কয়,
শুনে আমার বোধোদয়,
কানে কথা শিক্ষা হয়,
চোখে দেখে লোক চিনি।
মা বলেন আন তো বাটি,
আমি যাই হাঁটি হাঁটি,
দুধ খাবার পাত্র যেটি,
সেইটি চিনে আনি॥
এমনি করে দিন দিন,
কেটে গেল বছর তিন,
নেচে বেড়াই ধিন ধিন,
আঁচি পৃথিবীটা নাচঘর।
(ভাবি) খাওয়া খেলা আদর
ঢাকাই ধুতি চাদর,
বাড়ির বুড়ো শোলার বাঁদর,
এই নিয়েই কাটবে অতঃপর॥

কিন্তু ভাগ্য হায়, দুঃখ কব কায়,
তখনো দুধে গন্ধ গায়,
সবে দিছি চার বছরে পা।
(একদিন) এমন সময় বাবা,
কোত্থেকে বই এনে এক ছাপা,
বল্লেন, বস তো হেথা হাবা,
চিনে চিনে পড় এই স্বরে অ আর স্বরে আ॥
কোথায় গেল ধুলোখেলা,
ছুটোছুটি সারাবেলা,
সদাই কান ঝালাপালা
পড়, পড়, পড়।
ভুললে বানান 'রুক্মিণী',
কাঁদেন মা দুঃখিনী,
বাবা অগ্নি তক্ষুনি,
মারতেন চাপড়-চাপড়া—চড়্ চড়্॥
একদিন বানান কচ্চি 'উৎসুক',
বাবা আনলেন এক first book,
আমার শুকিয়ে গেল মুখ বুক,
দেখে A B C D-র কাঁদি।
পড়ার মাষ্টার কেদার
আমার বিদ্যে বাড়ে দেদার,
শিখলুম বাবা আর বাবা নয় father,
Dear মানে প্রাণের প্রিয় wifeএর উপাধি॥
ক্রমে উঠছি ক্লাসের উপর class,
শিখছি মাইনাস্ ইনটু প্লাস,
মন থেকে ঠাকুর দেবতা সব ফেলছি ধুয়ে।
হাসতে ভুলে গেছে ঠোঁট,
টিফিনে.........ঘেঁট,
দৈববাণী মানে ভোট,
লিডারদের সব উড়িয়ে দিছি ফুঁয়ে॥

নোট মুখস্থর শিখে ট্রিক,
ক্রমে পাস হলেম 'মেট্রিক',
'মিয়ারলি এ পিন প্রিক',
বিশ্ববিদ্যার মহাযুদ্ধ আরম্ভে।
বাবা বল্লেন ভ্যালা রে মোর বাপ,
বাকী কটা পাস ক'রে ফেল সাফ,
তেড়ে মেরে জোড়া জোড়া লাফ,
আড়ে আর লম্বে ॥
(আমি) চশমা তখন চড়িয়ে চোখে,
কুয়াশা মাখা আশার ঝোঁকে,
রোকে বেরুলুম বিদ্যেলাভের
বিষম মৃগয়ায়।
শুনি সিট নাই কোন কলেজে,
তেল গড়াচ্ছে কেরাণীর লেজে,
তবিতে মাত্র পারে ছাত্র
পূজা দিয়ে তাঁরই পায়।
যখন আমি পড়ছি বি, এ,
তখন আমার হলো বিয়ে,
দিয়ে আমাকে বৌ, বাবাকে টাকা,
কৃতার্থ হলেন শ্বশুর।
বাবার উপর বৌয়ের 'কাদার',
তাঁর তাড়া কিছু কড়া rather,
(আমার) কানে ঢোকাতে পাসের বাঁশ
কর্ত্তেন না কসুর।
যখন ডিগ্রী নিয়ে সেনেট হলে,
এলেম শ্বশুরের তেলের কলে,
(তিনি ঘানি তুলে মানি হয়েছেন
ইঞ্জিন এনে বসিয়ে।)
দেখে আমার গাউন-ক্যাপ-সনন্দ,
জানবো কি তাঁর আনন্দ.

বল্লেন, ও নন্দ আজ আর মন্দ সয়ে
দিস না রে ও কড়ায় সঙ্গে মিশিয়ে ॥
আজ সবাইকে তেল দিবি সাচ্চা,
কাউ দিবি এক এক কাচ্চা,
লোকসানটা পুষিয়ে নিস্
এর পর ওজনে কম দিয়ে।
'সাট্টিপিট্ট' দেছেন বড়লাট,
জামাই আমার তেঁতুল জাট,
আমার মেয়েকে করে বিয়ে,
তারি পয়ে পাস করেছে বি, এ ॥
আমায় বল্লেন, শোন বাপধন,
এইবার আইন পড়তে দাও মন,
বেলা গেল বাড়ী 'আগমন' কর
নিয়ে আশীর্ব্বাদ।
রোজগার চায় শীঘ্রগতি,
প্রভাবতী গর্ভবতী,
শুভদিনে তোমার কানে
দিলুম সুসংবাদ ॥
ক্রমে আমি পাস করলুম ল,
খুশী হলেন Father-in-law,
Mother-in-law
নিজের টাকায় কিনে দিলেন শামলা।
ঘুরলুম এ কোর্ট ও কোর্ট সাত কোর্ট,
বিডন বাগানে দেখালুম বক্তৃতার চোট,
কিন্তু এক Brother-in-lawও
আমার কাছে নিয়ে এল না মামলা ॥
হব রাসবিহারী কি স্যার আশু,
মন্মথ কি সান্ন্যাল দাদু,
আলিপুরের কৈলাস বাবু, কি হেম মিত্তির,
এমনি একটা আশা ছিল মনে

সব আশায় পড়েছে ভস্ম,
বেড়েছে বেজায় পোষ্য,
নষ্ট হয়ে উড়ে যায় বাবার মাইনে
দুধের দাদনে ॥
তার উপর my dear,
যাঁকে সবার চেয়ে করি fear,
যাঁর চোখে দেখলে tear,
প্রাণখানা হয় দু'চির হয়ে tear।
'প্রাইভেট টিউসানি' করে যা পাই,
মাকে লুকিয়ে তাঁকেই যোগাই,
তবু তাঁর মন পাই না
চোখে দেখি না cheer ॥
কলম নিয়েছি যেন বিষ তুলে,
বুক চিতনো গেছি ভুলে,
'থার্ড মাষ্টারি' নিউ স্কুলে,
মাইনে মাসে কুড়ি দুই।
শিখতুম যদি হাতের কাজ,
কে আমারে পেতো আজ,
দেড় টাকা রোজ পায় রাজ,
অমি বি, এ, ভুঁয়ে শুই ॥

গান

কে খুলেছে এ জাতুঘর বিশ্ববিদ্যালয়।
ছুটছে ছেলে পালে পালে,
(দেখছে) কপালে কি আছে পয় ॥
চাষ ছেড়ে চাষা ছোটে,
পাটা ফেলে ধোপা জোটে,
তাঁত ছেড়ে তাঁতি উঠে বই বগলে কলেজ বয় ॥

দাঁড় ছাড়ে দাঁড়ি মাল্লা,
ব্যাপারী তার দাঁড়িপাল্লা,
হল্লা করে দল বেঁধে সব হল-ঘরেতে হয় উদয় ।
সেথা জীবন দিয়ে জামিন,
পাস করে একজামিন,
‘ক্রমিন’ ঐ ‘লুমিং’ দূরে ডিগ্রী দেখে ভুলে রয় ॥”
হাজার বি, এল, কেনেন গাউন,
বেরয় দু-এক জনের ‘প্রপার নাউন’,
কেউ ‘রি-নাউন’ টাউন হলে,
হাকিম দেখা মুন্সীপালের মহোদয় ।
বাকী সবাই পড়েন ফাঁকি,
বুঝেন চাঁদির চাকি সস্তা নয় ॥

৫১

খোয়ারি

এক শো বছর সমান টানে,
মাতাল ছিলেন মদ্যপানে,
বিলিতী বোতলে পোরা,
গোবার চোলাই করা সে সুরা
নাম তার এডুকেসন্ ।
সঙ্গে সঙ্গে ছিল চাট,
পেন্ট, কোট, টাই, সার্ট,
উঠিয়ে দিয়ে পূজা-পাঠ,
ইংরিজী ঠাট, ইংরিজী নাট,
ইংরিজী ক্যালান্ ॥
ক্লাসের পর উঠতুম ক্লাস,
গ্লাসের পর চালাতুম গ্লাস,
মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক গ্লাস,
অভিলাষ একজামিনে ডিগ্রী পান ।

ডিগ্রি পেলে হতো ফুর্ত্তি,
রাঙ্গা হতো মেটে মূর্ত্তি,
থাকতো না জ্ঞান একরত্তি,
টোলতো পা দিবা-রাত্রি তখন বার মাস॥
সে মদের নেশার ঝোঁকে,
ধরা-সরা দেখতুম চোখে,
ভাবতেম যত ছোট লোকে
মরে বোকে পড়ে ড্যাম রামায়ণ।
সংস্কৃত পড়তেন ম্যাক্সমূলার,
নইলে কে এমন ফুল আর,
(যখন) ইংরেজ আমাদের রুলার,
তখন ভারনাকিউলার তো ভাদ্রবৌয়ের মতন॥
শুঁড়ীর দোকান কলেজে,
মাতাল হয়ে নলেজে,
ইংরিজী তেজে গরম মেজাজে,
মাথা যেত ঘুরে।
(ভাবতুম) আর সবাই চুনো-পুঁটি,
আমরা মুন্সেফ কি ডেপুটি,
কেউ উকিল সেজে আদালতে,
বাজায় ভেঁপুটি অহং রাগের সুরে॥
আমরা কেউ ডাক্তার, কেউ মোক্তার,
আবার কার এক্তার, ইংরিজী দোক্তার
দোকানে কলটেপা রাইটার।
কেউ মোহর করেন লেটার,
কেউ বা এডিটার,
কেউ ফাদার-ইন-ল'র ডেটার,
কেউ খাটান মিউনিসিপাল মেম্বার,
প্রলপেই তাঁর সবার চেয়ে রাইটার॥
(ভাবতেম) এ দেশের আর নাইকো আশা,
এরা সব তাঁতি চুতর কামার চাষা,

কারো বা মুদিখানায় বাসা,
সব ইল্লিটারেট ফুল।
এরা গাই দুইবে চিরকাল,
ছাইবে উলু খড়ের চাল,
নয় পুকুরে ফেলবে জাল
কি ভয়ঙ্কর ভুল॥
এরা না পড়েছে মিল, মেকলে,
না কাজ করেছে চটকলে,
বুনলে বার্কমায়ারের থলে,
কোন্ কালে কি হয়ে যেত
তা আর কব কি।
এরা কল্লে একটু ইংরিজী নেশা,
গোলদীঘিতে মেলামেশা,
চালাত কি আর জাতের পেশা,
খেলতো ফুটবল, ক্রিকেট, হকি॥
(ভাবতুম) এ কি কঠিনতা,
এদের মনে নাইকো স্বাধীনতা,
সেই পৈতৃক পেশার অধীনতা,
হায়! দেখলে এ দীনতা
দুখে চক্ষে বহে ধারা।
যদি সাহেবের দোরে দিয়ে ধন্নে,
কাঁদতো এরা দেশের জন্যে,
পেত অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যে,
আসতো সুখের বন্যে,
ভাসতো ভারত সারা॥
(আমাদের) অধীনতা আর হয় না বরদাস্ত,
যদনা সতত ধাস্ত সমস্ত,
হস্ত লিখিছে কেবল দরখাস্ত,
কাউকে কি আর রাখবো আস্ত,
ভারতে সূর্য্য না হতে অস্ত,

স্বাধীনতার 'হুকুম' বাহির করিব
মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে।
দেলা দে রাম বলে অবিরাম,
পায়েতে ফেলিব মাথার ঘাম,
ফতে কি না ফতে হয় দেখি কাম,
ঘুরি যদি এখানে সেখানে বিলাত জুড়ে॥
এবার নেশা আসছে কেটে,
সরাব আর ধরে না পেটে,
যাচ্ছে মাথা ব্যথায় ফেটে,
পা চেটে চেটে ধরেছে এবার খোয়ারি।
(এখন) বোতলের নামে উঠে হিক্কে,
অরুচি করেছে উচ্চ শিক্ষে,
পড়তে ডিগ্রী পুচ্ছ তুচ্ছ পরীক্ষে,
অধিকার কর্ত্তে ভিক্ষে নয়কো মন তৈয়ারী॥
(হায়) দু' দণ্ডের মদানন্দ,
ঝাল ঝাল চাটে পেঁজের গন্ধ,
কেন আমাদের করলে অন্ধ,
(এখন) ঘরের দরজা সকল বন্ধ,
সন্ধ করে মন্দ বলে বন্দনা যার করি।
কেন তখন হলেম রাজি,
শিখতে পোড়া এ ইংরাজি,
এখন ইংরাজ বলে 'বাবু ইংরাজি',
পাজির পা-ঝাড়া আমরা
তবু তারই চাকরির তরে পায়ে ধরি॥
কুইল কিনলুম পুড়িয়ে খাগড়া,
ক্লাব করলুম উড়িয়ে আখড়া,
ঝাড় ছাঁটলুম মুড়িয়ে ঝাঁকড়া,
এখন দু-দাঁড়ায় ধরেছে কাঁকড়া,
ছেড়ে দে বাপ কেঁদে বাঁচি।
ফিরিয়ে নে তোর পেন-পেনসিল,

কলেজগুলো কর কেনসিল,
চুকাতে মিউনিসিপাল ট্যাক্সের বিল,
আমাদের ঘর-দরজা হচ্ছে শীল,
অনেক দিনের সঙ্ক-কীল,
তাইতে বেঁচে আছি ॥

ছিল মজার নূতন কলেজ লাইফ,
মেট্রিক পাস, হিষ্টীক ওয়াইফ,
শ্বশুরের গলায় বসিয়ে নাইফ,
টানতুম সিগারেট, মেরশ্যাম পাইপ,
খেতুম ঘোলগোলা জল
চার আনা গেলাস।

চব্বিশ-মাসে প্রথম লম্ফ,
ফের দু-ভজনে বি, এ-র দম্ভ,
শেষে তিনটি বছর বিদ্যে পম্প,
কল্লে নূতন ল-ক্লাস ॥

পাসের নেশা কেটে দেখি,
বিদ্যে সাধ্যি সবই মেকি,
ঘরে ধান নেই শুধু ঢেঁকি,
গাউন-পরা ভেখই মাত্র সার।

কোর্টে বেরোয় দু' শো শামলা;
জন আটেক লুটেন মামলা,
আর সবার সামনে খালি গামলা,
সাক্ষী শিখিয়েও ভিক্ষে মেলা ভার।

ফুরোলো মদের রঙ্গ,
নেশার আসর ভঙ্গ,
ত্যজিয়ে মাতাল সঙ্গ,
বঙ্গের মাটিতে অঙ্গ আজ পড়ে চলে।

সাদা চোখে দেখি ভাই,
ভাণ্ডেতে পড়েছে ছাই,
দিন খুলে দুখ খাই,

কোমরে কাপড় নাই,
কিছু না দেখিতে পাই
আমার আপন বলে ॥
একি খেয়াল না মদাতঙ্ক ?
মা, কে বাজায় শুভশঙ্খ ?
মুছাতে মুখের পঙ্ক,
কে কোথা পাতিয়ে অঙ্ক,
ঝঙ্কারে আমারে ডাকে।
(বলে) আর কাঁদিসনে রে মদের ফন্দি,
নেশার পাশে হস্‌নে বন্দী,
শুঁড়ীর সঙ্গে কাজ কি সন্ধি,
সরবৎ দেব অতি সুগন্ধি,
যাতে ব্রাণ্ডির গন্ধ ঢাকে ॥
(ডাকে) আয় রে বাছা আয় রে দেশে,
আপন মাকে ভালবেসে,
জমি চ'ষে অন্ন খেসে,
পর পিত্তেসে নিজের দোষে
যাসনে ভেসে আর।
মিলে তোরা সব পুরুষে,
নারীর হাতে দেছ কুশে,
এসে তার মন ফিরুসে,
নিজের হাতে চরকা কেটে
চোখ খুলে দে তার ॥
মেষ হয়েছে মেসের বাসায়
ধর্ম্ম গেছে কর্ম্মনাশায়,
ভুলে আছ কাঁসায় কাঁসায়,
পিপাসায় জলছে দিবা-রাতি।
(তোমার) কাপড় বুনে লেঙ্কেসায়ার,
সুইজারল্যাণ্ড পাঠায় ফায়ার,
বেল্জিয়ের ছুরির ছুরি বায়ার,

পরের ভাষা কচ্ছো হায়ার,
মাথায় পরের ছাতি ॥
গয়ায় দিয়ে রায় বাহাদুর,
ঘরে ফিরে আয় বাহাদুর,
দেশ যে আজ চায় বাহাদুর,
দেশের জন্যে যে বাহাদুর
করবে রে সন্ন্যাস।
ওরে সত্য সত্য সত্য বলি,
দিতে হবে আত্মবলি,
(নইলে) খুল্লে থালি গলার নলি,
ভরলে নিজের থলি,
দেশউদ্ধার ভূতের উপন্যাস ॥
হায় হায় যিনি একদিন ছিলেন টাইট,
বলে রাইট রাইট রাইট,
কল্লেন যেথায় সেথায় ফাইট,
তিনি আজ নাইট হয়ে লাইট হারা
সাইট কেবল বেতনে।
যিনি ইন্দ্র দেবরাজ,
তিনি মর্ত্যভূমে পাত্র আজ,
যন্ত্রঅস্ত্র ছত্র ধরা কাজ,
শঙ্কাতে রণ লঙ্কা নিকেতনে ॥
তাঁর ধর্ম্মরক্ষী কর্ম্মরক্ষী,
ছেড়ে গেছেন ঘরের লক্ষ্মী,
তাই গরুড় পক্ষী হয়ে মক্ষী,
উড়ে বসেন গুড়ের কলসীর কানায়।
যাক্ তাঁকে বলবো নাকো কিছু আর,
সে এক রকমের পাওনাদার,
তাই আদায় করে নিচ্ছে ধার,
তিন কুড়ি চার—সালিয়ানার ॥
তোমাদের যৌবন উঠেছে উজলে,

চেৎলে পারো আজও চেৎলে,
(তোমাদের) শক্ত ভোলানো বুঝি বাতলে,
কি দাবিয়ে রাখা পায়ে খেঁতলে,
তোমরা তাতলে হাত পাতলে
স্বর্গ পাব আমি।
কি কাজ বাছা আর গণ্ডগোলে,
বসো শান্ত ছেলে মায়ের কোলে,
বিদ্যা শেখ নিজের টোলে,
গঙ্গা লিখতে জ্যানজেস্ বলে
করো না আর বেনামী॥
(দেখ) মাটি খুঁড়ে অন্ন আছে,
সব্জি বোনো ঘরের পাছে,
পুরিয়ে রাখ পুকুর মাছে,
তোমার ওষধি আছে গাঁয়ের গাছে
শিখে নাও চিনে নিতে তায়।
নাই বা তুমি হবে পাস,
বোনো না ক্ষেতে কাপাস,
(সেই) তুলোর চাষে টাকার রাশ,
অথচ নয় কারো দাস,
আর সাবাস সাবাস সাবাস
বলবে রে সবায়॥
তাঁত রাখ বস ঘরে ঘরে,
(তাতে) বৌকে বসিয়ে সমাদরে,
বাছার হাতের বুনা কাপড় পরে,
হাসি ফোটাও সুধা ধরে মা'র।
রান্নাঘরের সঙ্গে আড়ি,
মা-লক্ষ্মীদের বাড়ী বাড়ী,
ও মা তোমরা ধর হাঁড়ি,
ব্যগ্রতা করি খেয়ে বাঁচুক
পতি-পুত্র তো সবার॥

তোমরা যে মা অন্নপূর্ণ,
রাঁধতে কেবল হও ক্ষুণ্ণ,
ভাত বেড়ে দে' হও না ধন্য,
তার চেয়ে আর পুণ্য
কোথায় কিসে আছে।
ভাড়া করা পাচকের হাতে,
রুচি কি তোর হয় মা ভাতে,
কি বলে দিস বাছা তা স্বামীর পাতে,
তাই খেয়ে কি ছেলে বাঁচে॥
মা যদি তোমার থাকে চাড়,
ছেঁড়া কাপড়ের ছিঁড়ে পাড়,
বুনতে পার ফুলের ঝাড়,
হরগৌরী শিবের ষাঁড়,
নিজের সেলাই করা
কামদার কাঁথাতে।
পবিত্র সাবিত্রী সমা,
বঙ্গে ঘরে তুমি রমা,
কোথা মা তোর উপমা?
তবে কেন ঘাঁটিস্ ও মা
ক্রুশের কাঠি পুজোর হাতে॥
বল মা ডেকে তোর পতিকে,
উকিলী ছাড়ুক কোন গতিকে,
তুচ্ছ করে টাকার ক্ষতিকে,
তুষ্ট করুন ঘরের সতীকে,
কিনে ত্যাগী যোগী নাম।
তুইও বল মা তাকে ডেকে,
আর্জি যেন আর না লেখে,
দেখছে তো অম্বল চেখে,
কেবল পাওনাদার হবে হেঁকে,
পেট ভরে না কষিয়ে মাথার ঘাম॥

আজ চৈত্র মাসের শুভ সংক্রান্তি,
চুকিয়ে শুঁড়ীর দেনা কড়া-ক্রান্তি,
ঘুচিয়ে অনেক দিনের ভুল-ভ্রান্তি,
ঘরের কাজে মন দে সবাই
হয়ে শ্রান্তিহারা।
কাজ কি পতির রাজনীতিতে,
রাখুক সিন্দুর বজায় তোর সিঁথিতে
চলে সুচরিতে নিজের রীতিতে,
উড়বে নিশান এ ক্ষিতিতে,
উপর থেকে আশিস দিতে আসবেন হর-দারা॥

গান

(আর) ব'সবো না গো রাজার বাড়ী পাত পেতে।
ভোজের এ এঁটো খেতে গজিয়ে গেল কাঁটা গাছ
নিজের ক্ষেতে॥
পরতে দু-খান রং করা থান,
গিয়ে বিয়ে বাড়ী সাধবো না দান,
ভাল নিজের চরকায় তেল দেওয়া ভাই
বলে বলবে লোকে তেঁতে।
রাজার বাড়ী গাজন হয় মজাদার,
(কিন্তু) আমাদের ঐ বান ফোঁড়াই ভাই সার,
এবার গাঁয়ে গিয়ে করবো সন্ন্যাস,
কাজ কি বড়র চড়কে মেতে॥
আমরা 'তুলবো না জল, কাটবো না আর কাঠ',
রুইবো ধান ধুনবো তুলো, বুনবো উন পাট,
কেউ সেজে হাটের নেড়া খুঁজলে হুজুগ
ঠেলবো তারে জেতে,

ছাড়বো ঝগড়া ঝাঁটি খাটি টানা বাবুয়ানা
দোষ দেবে কে এতে ॥

৬১

ছড়া

গালপাট্টা গুম্ফ পুরু,
পাকা ভুরু লম্বা দাড়ি,
কোথায় গেলেন নেতারা সব
বক্তৃতারি মঞ্চ ছাড়ি ॥

(অংশ)

৬২

ছড়া

নিরাকারের চৌবাড়ীতে পুতুল পুজো হবে না।
শোন রে শোন হিঁদুর পোলা,
আমাদের এ ধর্ম্মগোলা,
সরস্বতী পুতুল নিয়ে খেলা,
হেথা চলবে না।
এবার পৌত্তলিকের মাথা খাব,
তাইরে না-রে-তা-না-না-না ॥

(অংশ)

৬৩

তোপ লোপ*

থেমে গেছে তোপ বাবা থেমে গেছে তোপ,
কেউ আর বলে না ত তোপ পড়বে তোপ,

* রচনা—সতীশচন্দ্র ঘটক। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘটক মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং তাঁর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

থেমে গেছে ঘড়ি খুলে
বসে থাকা কান তুলে
এক সঙ্গে একটায় দম দেওয়া লোপ,
'টাইমের' ঘাড়ে দেছে একনমি কোপ !

ঘড়িরা যা খুসী তাই করে গণ্ডগোল
পড়োরা যেমন হলে গুরুহীন টোল,
কে ফাষ্ট কে স্লো চলে
কার সাধ্য এঁচে বলে
সকলেই 'পাংচুয়াল' বাহবা কি 'ফন্',
এ কথাটী উঠে গেল 'টু টু দি গন্।'

আগে আগে তোপ ছিল দিনে রেতে তিন,
কমে কমে এক হল, তাও সে বিলীন,
বাহাদুর সরকার !
খরচের কি সুসার,
খাতিরের তোপগুলো হয় না ত ক্ষীণ,
বজ্র আঁট ফস্কা গেরো এই এক দিন।

কি শুনে কেরাণী ভোরে খেতে বসে ভাত ?
কি শুনে দুপুরে রাজমিস্ত্রী গুটোয় হাত ?
কি শুনে বা রাত্রিকালে
বাবুর গীত বাদ্যশালে
সহসা ইমন ধরে খাঁটি কালোয়াত ?
জ্যোতিষী গণনা আর মেলে না নির্ঘাৎ।

বিষম লেঠায় ঠেকে গেছে এ সহর,
মাপে ছোট বড় হয় ঘন্টা পহর ;
পাঁজি হাতে সূর্য্যোদয়
দেখা ত সহজ নয়
গড়ের মাঠে দাঁড়ালেও দৃষ্টি বেধে যায়,
মনুমেন্ট চড়া ছাড়া না দেখি উপায়।

৬৪

বর্ষ বিদায়*

ওই চলে যায় বিগত বরষ অশ্রুসজল চক্ষে,
বিদায় বেদনা কম্পন আজি হতেছে তাহার বক্ষে ;
তোমরা নূতন অতিথির তরে
প্রসারি দিয়াছ কর,
কাল ছিল যেই তোমাদেরি, আজ
করিয়াছ তারে পর,
তোমাদের চোখে ফুটিছে উজ্জল হাসি
নূতনের পথে ঢালিছে কুসুমরাশি,
হেরিছ নূতন আশার কিরণ
নব বরষের পক্ষে,
দেখ ফিরে সে যে চলে যায় ওই
অশ্রুসজল চক্ষে।
কিছু দেরী কর আর কিছু দিন তারে ভুলে যেতে দাও,
এখন বারেক তাহারি লাগিয়া বিদায়ের গীতি গাও,
তোমাদের প্রতি জীবনের কাজে
মিশিয়া যে রহিয়াছে
গৃহ প্রাঙ্গণে এখনো যাহার
পদরেখা লেখা আছে,
তার স্মৃতিটুকু এখনি করিবে দূর
এখনি ভুলিবে তার সে মধুর সুর,
সাদরে যাহারে ডেকেছিলে—
তারে এখনি ভুলিতে চাও ?
ভুলে যাও যেয়ো—কিছু দেরী কর
তারে ভুলে যেতে দাও।

* রচনা—সতীশচন্দ্র ঘটক। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘটক মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং তাঁর আবৃত্তি-স্মরণে লিখিত।

৬৫

হাটের কলা না আটের কলা

আজ শিবের গাজন শিবের ভজন
শিবের পূজন চড়ক-চৈত্র শেষে।

… … …

(তাই) আশুতোষ রেখে চিত্তে,
মেতে মহাদেবের গীতে,
শত্রুকেও আজ বলে মিতে
একত্রিশ তোরে বিদায় দিতে,
করছি আনন্দের আজ আয়োজন।

আমোদ আমোদ কিসের আমোদ
কিসের আয়োজন,
জানো না, বিনা উৎসবের কোলাহল,
পায় না প্রাণ শান্তিজল,
সংসার হয় হলাহল,
মাঝে মাঝে প্রমোদের
তাই অতি প্রয়োজন॥

মৎস্তে লক্ষ্য রেখে চক্ষে,*
বাবুদের সুখ ধরে বক্ষে,
আর মা-লক্ষ্মীদের এয়োত রক্ষে
ঝাল-ঝোলে অম্বলে ভাজায়।
বছরে একদিন মাত্র,
জল ছেড়ে মুছে গাত্র,
সাজি সঙ-এর সহযাত্র,
এই নগরের পাত্রী-পাত্রে জমাতে মজায়॥

* আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধানে শোকপ্রকাশ ও শ্রদ্ধা-নিবেদন উপলক্ষে বাংলা ১৩৩১ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন জেলেপাড়ার সঙের মুখ দিয়ে এই ছড়া কাটানো হয়েছিল। ছড়ার প্রথম অংশটি এই গ্রন্থের ৪৯ ও ৫০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

এর চেয়ে কি আছে মজা,
পেটে ভাত নেই খাজা গজা,
খড়ের চালে গড়ের ধ্বজা,
মড়ার সঙ্গে গোরার বাজা,
বাংলায় বিরাজে দেখি আজ।

কান্না স্বাধীনতার জন্য,
মুখে সব হা অন্ন! হা অন্ন!
সকল দিকেই দৈন্য,
কেবল প্রেমের পাথারে মগ্ন সমস্ত সমাজ॥

প্রেম সাহিত্যে, কবিত্বে,
প্রেম ঔষধ পথ্যে,
তেলে প্রেম থাকে ঝরতে,
প্রেমের তরে নীতি হত্যে কর্ত্তে অভিলাষ।

বাড়ছে যত আলস্য,
কর্ম্মশক্তি হচ্ছে ভস্ম,
মনুষ্য হচ্ছে কুপোষ্য,
মদনের ততই বশ্য হচ্ছি বঙ্গদাস॥

আগে ছিল প্রেমের সজ্জা,
দম্পতির ফুলশয্যা,
ভক্তি শ্রদ্ধা মাথা লজ্জা,
পতি পরিচর্য্যা,
ভার্য্যার মর্য্যাদার বিষয়।

জাগ্রত কি নিদ্রিত,
পত্নী যত্নে হতো আদৃত,
আলিঙ্গন বুকে, মুখে চুম্বন মুদ্রিত,
(কিন্তু) প্রকাশিত করা নয় ভদ্র পরিচয়॥

জুটিয়ে বেছে পাঁচ ইয়ার,
যার শখ হত কর্ত্তে চিয়ার,

সে বাজারে খুঁজতো মাইডিয়ার,
ওয়াইফের কাছে কর্ত্তো ফিয়ার,
নামতে তত ধাপ।
যে প্রেম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,
রতিপতি যার আচার্য্য,
হয়ে নির্লজ্জ পুত্রের প্রসূতির সঙ্গে
সে রঙ্গ মহাপাপ॥

ক্রমে আমরা যখন নব্য,
হয়ে দাঁড়ালুম একটু সভ্য,
বঙ্কিম-টঙ্কিম লিখলেন কাব্য
গব্য হবিতে একটুখানি মিশে গেল ভয়সা।
দেখলুম তখন নতুন স্বপন,
রইল না আর চুম্বন গোপন,
জ্যোৎস্নায় যামিনী যাপন,
আর ব্যঞ্জন ছেড়ে কেশরঞ্জনে
খরচ করলুম পয়সা॥

নারী এলিয়ে দিলেন মাথার চুল,
পাতা কেটে পরলেন ফুল,
উন্নুন ছেড়ে বুনলেন উল,
দেখে সাজের ঘটা, খাঁজের ছটা
মশগুল পুরুষ-প্রাণ।
লজ্জার খাতিরে লজ্জানাশ,
খোকা ছাড়লে দুধের আশ,
আমরা যত এম, এ, পাস,
হলেম গুণমুগ্ধ দাস,
পেতে দীর্ঘশ্বাসে ফাল্গুন মাসে পরিত্রাণ॥

ছিলাম 'ওগো' হলেম 'নাথ',
কুঁড়ের ঘরে রাঁধুনির ভাত

ইডেন গার্ডেন হলো ছাত,
সতীর জাতের সতীত্বের তবু
রইলো বেশী মান।

বঙ্কিম আদি মহাশয়,
সুপবিত্র পরিণয়
না করে কলঙ্কময়,
দাম্পত্য প্রেমের জয়,
করেছেন গান॥

এখন ম্লেচ্ছ পূজি, ম্লেচ্ছ ভজি,
বিদ্যে বেড়েছে দেড় গজি,
ধুয়ো ধরেছি সাইকোলজি,
উল্টে কুলের কুলজি,
করছি একাকার।

মুখে বলি 'কলা', 'কলা',
কলার খোলায় ধরা মলা,
পচা গলা, সবই কলা,
কলার তলায় দাঁড়াবার আগে
বালার ম্লেচ্ছাকার॥

বাংলার ঘাড়ে চাপলে সেন,
বাঙ্গালী একেবারে হয় অজ্ঞান,
জেতের ইজ্জত বলি দেন,
নতুন ধ্যানে বসে যান,
অগ্নি যে সবাই।

সাক্ষ্য তার বল্লাল সেন,
আর মহাত্মা কেশব সেন,
সঙ্গে সঙ্গে উইলসেনের
যায় পাখী জবাই॥

এখন বাংলা চষেন,
বাবু বিবি তোষেণ,
নারীর লজ্জা নাশেন,
সুইডেনের ইবসেন্
কুলের কথা ছাপিয়ে।
পশ্চিমের আর্ট এলো পুবে,
(গেল) বুদ্ধির ডোবায় শুদ্ধি ডুবে,
নিষ্ঠার তেষ্টা গেল উবে,
ডুবে জল খাওয়া আর্ট
উঠলো হার্ট ছাপিয়ে॥

ঢাকাই বোনা গুলবাহার,
কোরায় করে ব্যবহার,
ঘুরিয়ে আনলে ধোপার দ্বার,
মাড় থাকে না তার আর,
ধোপ-দোস্ত দিস্তে সরে
জমি হয় থাপ।
পরলে পরে আড়ং ধোপে,
খইয়ের মাড় আর নীলের ছোপে,
মিস্তিরির ইস্তিরির চাপে,
ধপধপে হয়ে শাড়ি দাঁড়ায়
বেশ সাফ্॥

তাই সাহিত্যে নতুন রীতি,
পাস করেছে সভা সমিতি,
সৌন্দর্য্যে নাই ধর্ম্মনীতি,
টেঁকের তরে ফটক খুলতে
ক্ষতি কিবা আর।
হোক বা না হোক পুষ্টি,
লাগুক ভাইনের দৃষ্টি,
মুখে একটু লাগলে মিষ্টি,

ছিষ্টি ছাড়া হলেও খাস্ত

কর্ত্তে হয় আহার ॥

নারীর সৌন্দর্য্য হলে নগ্ন,

মর্য্যাদা তার হয় না ভগ্ন,

সুরসিক রসে মগ্ন,

আর প্রেম রোগে রুগ্ন যত জন ।

কি কাহিনী মনোহর,

নিবেদিত সুধাকর,

আলো করে কুঞ্জ ঘর,

করে তব আদরিণী মন ॥

এ নব মানব মানবী,

গন্থে পন্থে লেখে কবি,

চিত্রকর আঁকে ছবি,

দেখে চন্দ্র দেখে রবি,

খেউড়ে তেউড়ে ঝোলে

কাঁদি কাঁদি কলা ।

রসিক মাসিকপত্রে,

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত চিত্রে,

যুবক যুবতী নেত্রে,

ঝলসে কলার চিত্র

মোহিনী সরলা ॥

ভুলে গেছি ধর্ম্মতত্ত্ব,

শুচি রুচি নীতি সত্য,

কি সুন্দর কি অকথ্য

মত্ত মোরা 'কলা' 'কলা' করে ॥

এল বঙ্গে নানা রঙ্গে,

ঊর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা

আদরিণী কলার আদরে ॥

৬৬

গান

বিবাহে বরণডালা সাজাইতে বল কলা কোথা পাই,
দিতে পূজার নৈবেদ্যে কিম্বা আদ্য শ্রাদ্ধে,
বিশুদ্ধ কলা তো কোথাও নাই,
দেখি না বাজারে ব্যাপারী বর্ত্তমান,
বেচে চাটিম, চাঁপা, কাঁটালী, মর্তমান।
কি কানাইবাঁশি, রামপালবাসী,
খাস দিশি কলা কোথা গেল ছাই।
রেঙ্গুনে রাঙ্গানো, মান্দ্রাজী দাগী,
সিঙ্গাপুরে ঢেঙ্গা হয়েছে সোহাগী,
বিলিতী বেনানা জেনানা মহলে
সহলে সহলে ঢুকেছে তাই।
অভক্ষ্য ভক্ষণে বঙ্গের সাহিত্য
সেবা রোগে পড়ায়েছে পিত্ত,
প্রখর আদিত্যে চিত্ত বিকারে
ঢেঁকুরে পেঁজের আমেজ ভাই॥

৬৭

গান

হক্ কথাটি বলছি তোরা মানুষ হ রে ভাই।
মানুষ হলে সবই পাবি, মানুষের যা চাই॥
শক্তি পাবি, ঋদ্ধি পাবি, পাবি পরম শান্তি,
দূর হবে তোর রেষারেষি দূর হবে তোর ভ্রান্তি,
সরল মধুর আনন্দময় দেখবি জগৎটাই॥
বাইরে সবাই দেখতে মানুষ মিথ্যা সেটা নয়,
ভিতরখানা দেখলে পরে আঁৎকে পাবি ভয়।
কেউ বাঘ, কেউ সিংহ, কেউ বা দুধওলা গাই॥

৬৮

সোনার বাংলা

অহো—সোনার বাংলা, সোনার বাংলা, সোনার বাংলা আলবত্,
শেষে—বাহির হইতে গুম্মেরা আসি বৃদ্ধি পেতেছে শালবৎ,
আর—সড়ক ছাড়িয়া ধরিতেছে সবে অলিগলি আর আল্-পথ !

হেথা—আম্র ক্রমেই হতেছে কদলী, কচু হইতেছে রম্ভা,
হেথা—মহিষ শৃঙ্গে বসিয়া ভৃঙ্গ ভাবে গেল তার দম বা,
আর—তিন কোণ ক্রমে হয়ে যায় গোল, চ্যাপ্টা হতেছে লম্বা।

হেথা—কবে নাকি কোন বিজয়সিংহ জয় করে এল লঙ্কা,
মোরা—তাই নিয়ে আজও দিচ্ছি লম্ফ পিটিয়ে উদর ডঙ্কা,
আজও—লঙ্কার ঝালে চক্ষু ভাসায়ে দেখাই সবারে শঙ্কা।

আর—কবে কেটা গিয়ে শাসন করিল মালয়ের দ্বীপপুঞ্জ,
দেখ—"লেজার" টুকিতে টুকিতে লাফায় আনিতে কুঞ্জ,
কবে—বাপ পিতামহ খেয়েছে পোলাও খালিপেটে স্মৃতি ভুঞ্জ।

কবে—বিবেকানন্দ চিকাগোয় গেল নিখিল ধর্ম্ম সঙ্ঘে,
তাঁর—বক্তৃতার চোটে 'থ' বনিয়া সবে সেলাম করিল বঙ্গে,
এল—বাঙ্গালীর ছেলে সদর্পে ফিরে রণজয় করে রঙ্গে।

কবে—পিঠ আমাদের চাপড়িয়ে গেল দাদাভাই আর গোখ্‌লে,
ওই—বোম্বে, মারাঠা, চলতেছে পথ শুধু আমাদের নকলে,
তাই—ফোঁস করে ফুলে ওঠে লেজখানা অকর্ম্মা বলে বক্‌লে।

কবে—লাটগিরি ছেড়ে দেশের জন্য কয়েদ খাটিল বন্দ্যো,
আর—পাল মহাশয় সাগর পারেতে দরজা করিল বন্ধ,
আর—বসু ও ঘোষেতে অবাক করিল আছে ইথে কিবা সন্দ ?

কবে—বারীন গেছলো আন্দামানেতে, কানাই ফাঁসির কাঠে,
আজও—সেই অজুহাতে চাই গুরুপদ সমাজে এবং রাষ্ট্রে,
দেখ—অন্ধ হয়েও রাজ্যের ভার নিয়েছিল ধৃতরাষ্ট্র।

মোরা—ভাবি নিশিদিন মোদের অতীত কীর্ত্তি কথার জন্তে,
এই—সকল দুনিয়া আছে ওৎ পেতে যেন সায়েবের হস্তে,
আর—এদিকে মোদের ঘর জুড়ে গেল যত বিদেশের পণ্যে।

মোরা—তুড়ি মেরে গায়ে ফুঁ দিয়ে চলিব সেটা বরাবর লক্ষ্য,
আর—শাস্ত্রও নাকি লিখেছে জীবের একগতি শুধু মোক্ষ,
বল—কি করিব পায়ে বাঁধা যে শিকলি খসে গেছে দুই পক্ষ।

হেথা—অবাক হইবে দেখ যদি যত স্যুট মেকীদের কাণ্ড,
করে—বুজরুকি আর চালাকিতে এরা নস্যাৎ ব্রহ্মাণ্ড,
ঠিক—যেমন মদ্য হেথাকার লোক তাহার যোগ্য ভাণ্ড।

হেথা—চোরে নিয়ে গেল কান দুটো কারো গণকে দেখায় কুষ্ঠী,
আর—স্বাধীন হবার প্রথম সোপান প্রভাতে ভিক্ষা মুষ্টি,
কহে—লাথি ও চাবুক মারে যারা শুধু তুলি তাহাদের গুষ্টি।

গাই—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জননী বাংলা ধন্য,
করি—আপিলে আপিসে অন্ন ভিক্ষা দুর্ভিক্ষেরই জন্য,
আর—কৃষ্ণ সাজিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে বাজাই পাঞ্চজন্য।

যারা—শামুক দেখিয়া ভয় পায় হেথা তারা বাজাইছে শঙ্খ,
যারা—কড়া ও গণ্ডা শেখেনি তারাই কষিছে জাতির অঙ্ক,
আর—পদ্ম তুলেছি বলিয়া লাফায় মুঠি ভরে নিয়ে পঙ্ক।

হেথা—বিলাতী খেতাব ছেড়ে দেওয়াটাই সবচেয়ে বীর ধর্ম্ম,
এরা—নারীর আঁচল আশ্রয় করি পালে রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম,
হেথা—সেই বড় নেতা পাতলা যাহার কান আর পুরু চর্ম্ম।

হেথা—যে বা যত ভুল ইংরাজী লেখে সেই তত বড় পণ্ডিত,
আর—সে তত সেয়ানা কাঁদিয়া যে করে পরের যুক্তি খণ্ডিত,
হেথা—মৃত নেতাদের নামগান গুণে চট করে হয় রণজিৎ।

হেথা—জাতীয় সমরে যুবা সৈনিক যেন পারাবত লক্কা,
কারো—ভাঙ্গা শিরদাঁড়া সম্বল কারো ঘুণ ধরা বুক যক্ষ্মা,
যারা—বাঁচিয়া বাঁচিবে জননী বঙ্গে তাহারা লভিছে অক্কা।

অহো—সোনার বাংলা, সোনার বাংলা জয় মা হলুদ বর্ণে,
তবে—এ যে জণ্ডীস্ হলুদ জননী নহ হরিদ্রা স্বর্ণে,
আর—সবাই হেথায় গুরু কে বা কার মন্ত্র লইবে কর্ণে॥

৬৯

সামাল দে বাঙ্গালী

সামাল সামাল ও বাঙ্গালী
সামাল দে তোর ঘর,
কেন বাসভবনে পরকে এনে
নিজের ঘরে হচ্ছিস্ পর।
তোর লক্ষ্মীর কৌটা যাচ্ছে চুরি,
তুই হুঁস করলি কই,
নিজের ধন তোর আপনার নয়
নেপোয় মারে দই।
এবার ঝট্কা হাওয়ায় খড়ের মট্কা
উড়বে রে তোর—উপায় কর,
চোরে লুটছে রে তোর ধানের গোলা,
পুকুর ভরা মাছ,
শাক-সবজি-ভরা বাগান,
ফলে ভরা গাছ।
তার শাঁস যত সব খাচ্ছে পরে,
তুই আঁঠি চুষে চুষে মর।
এমন করে চক্ষু বুজে থেকে উদাসীন,
বাঁচবি রে তুই ক'দিন গুনি,
হয়ে হীনের হীন।
তুই দাঁড়া এবার খাড়া হয়ে,
নিজের পায়ে দিয়ে ভর,
বুঝে পর কখনো হয় না আপন,
পর যে চিরদিন পর॥

৭০

শিক্ষার গলদ

আমরা সবাই বি, এ, এম, এ,
দিব্য পরিপাটী,
সভায় এবং কাগজ-পত্রে
চোস্ত বুলি কাটি।
কিন্তু মোরা ফোঁপরা যেমন
গজভুক্ত বেল,
বুলিয়ে দাগা হারিয়ে গেছে
নিজস্ব আক্কেল।
কোথায় গেল সৃষ্টিশক্তি
কোথায় স্বাধীন চিন্তা,
হারিয়েও না বুঝতে পারি
মোদের দৃষ্টিহীনতা।
বুক ধড়ফড় মাথা ঘোরা
সকল কাজেই ভয়,
মুখ চলে তো হাত চলে না
ধন্য বিদ্যালয়।
ধন্য সাহেব গুরুর দত্ত
বিলাতী বীজমন্ত্র,
মানুষ থেকে যাচ্ছি হয়ে
পুতুল কিম্বা যন্ত্র।
কেন এমন জড়ভরত
জবুথবুর দল,
হচ্ছি মোরা ভাবতে গেলেও
চক্ষে আসে জল।
জাতীয়তার বনেদ যদি
উপড়ে ফেলে দাও,

টিকবে কেন শিক্ষা-বাড়ী
যতই গেঁথে যাও।
সংস্কার যা হিন্দু জাতির
আদর্শ যা আছে,
তাই ভাসিয়ে জ্ঞানের ঝুলি
পাচ্ছি ওদের কাছে।
ওদের দেশের শিক্ষা সে তো
ওদের দেশেই ভালো,
ত্যাগের দীপে জ্বলবে কেন
ভোগের তেলের আলো।
মোদের ছিল আত্মা বড়
ওদের বড় জড়,
ওদের বিদ্যা মোদের ঘাড়ে
কালবৈশাখী ঝড়।
খাইয়ে অতিথ পিঁপড়ে কাকে
খেতাম মোরা অন্ন,
পেটপূজা না সারলে ভোরে
ওদের মতিচ্ছন্ন।
শিব সাক্ষাৎ মোদের স্বামী
ওদের বন্ধু ইয়ার,
পত্নী মোদের শক্তিদেবী
ওদের শুধুই ডিয়ার।
কিন্তু এসব মোদের ধাতে
বসবে কেমন ঠিক,
দো-টানার দুই পাকে পড়ে
না-এদিক, না-ওদিক।
ঘরোয়া ধন খুইয়ে যারা
পরোয়া ধন চায়,
কাঙ্গাল থেকেই যায় গো তারা
একটাও না পায়।

দেশের ভাবে ভাবতে হবে
দেশের ভাষা দিয়ে,
দেশের বাণী গড়তে হবে
দেশের মাটি নিয়ে।
মাই-দুধ যার সয় না পেটে
গাই-দুধ কি সয়,
পরের ভাষা পরের ভাবে
বস্তু দূরে রয়।
বস্তুমূলক জ্ঞান হয়ে যায়
শুধুই ফাঁকা ধোঁয়া,
না যায় নেওয়া না যায় দেওয়া
না যায় ধরা ছোঁয়া।
বাপ-পিতেম'র নাম জানে না
ছাত্র আছে ঢের,
(কিন্তু) ঠোঁটের আগে চোদ্দ-পুরুষ
আলেকজাণ্ডারের।
দেশের মানুষ, পাহাড়, নদী,
করছে নাকো খেয়াল,
এস্কিমো, আল্প, রাইন হাঁকে
এডুকেটেড শেয়াল।
এই তো গেল পুরুষ শিক্ষা
ছোকরারা যা পায়,
নারীর শিক্ষা হচ্ছে আরো
উৎকট বেজায়।
বীর রমণী হও না কিন্তু
রমণীত্ব চাই,
শ্লীলতা আর কোমলত্ব
দাও কেন জবাই।
রক্ত মাংস, যৌবন তার
নাই কি নিজের ধর্ম্ম,

কলেজ শিক্ষা পড়ায় না কেউ
শেখায় অপকর্ম্ম।
উল্টে আরো মনকে করে
ভোগ বিলাসের দাস,
হিন্দু নারীর ত্যাগ সংযম
গেলেই সর্ব্বনাশ।
পতিত দেশের তারাই ছিল
পতিব্রতার খনি,
অনাচারী পুরুষ সাপের
মাথার উজ্জ্বল মণি।
তারাও যদি গন্ধ মাল্য
পোশাক নিয়ে মাতে,
নির্ম্মূল হবে সকল আশা
রাখবে কে এ জগতে।
পুণ্যি পুকুর, গোলোক ব্রত
রামায়ণ আর গীতা,
কোথায় গেল? আর কি পাব
সাবিত্রী আর সীতা।
গৃহধর্ম্মের শিক্ষা কোথায়
কোথায় শিল্পকলা,
রন্ধন এবং পুত্রপালন
এখন সাবেক মলা।
আত্মবিসর্জ্জনের মাঝেই
আত্মা পাওয়া যায়,
ন্যায্য দাবী আদায় করে
আত্মরক্ষা দায়।
নাস্তিকতার ছাপ পড়েছে
তাঁদের মনের পাতে,
কর্ম্মনাশায় বান ডেকেছে
গঙ্গানদীর খাতে।

পাশ্চাত্যের ভোগের নেশা
দেহের সুখান্বেষণ,
কলেজ শিক্ষা দু-হাত দিয়ে
করছে পরিবেশন।
পিতার ঘরে হয় যা সুরু,
পতির ঘরে পূর্ণ,
করছে আধুনিক শিক্ষা
সেই শিক্ষার চূর্ণ।
মেয়ের উচ্চ পাসের মোহে
একেই মোরা অন্ধ,
তার উপরে মনসাদেবীর
কাছেই ধুনার গন্ধ।
সংসারই যে নারীর চরম
ধরম-করম ক্ষেত্র,
তার ভিতরই ফুটবে নারীর
পরম জ্ঞানের নেত্র।
এই কথাটা ভোলেন যদি
নারীর অভিভাবক,
নারীর আলো উঠবে হয়ে
পুড়িয়ে দেবার পাবক।
সেই পাবকে জ্বলবে গৃহ
জ্বলবে সমাজ দেশ,
নারীর অকল্যাণেই হবে
পুরুষ ভস্মশেষ।
অপশিক্ষা ভারতেরে
দেয় রসাতল,
অশিক্ষার চেয়ে যার
ভীষণ কুফল।
শরীর নীরক্তা
চুল অকারণে ধবল,

যে শিক্ষা ভুলায় দেশ
রাখে না চরিত্র লেশ
মানুষে বানায় মেষ
হীন দুর্বল।
স্বধর্ম্ম নিধন করে
মিথ্যা গরিমায় ভরে,
চিত্ত মাঝে আত্মদম্ভ
জাগায় কেবল,
গড়ে যা ঘৃণিত দাসে
ঈশ্বরে বিশ্বাস নাশে,
সে শিক্ষার নাগপাশে
শুধু হলাহল ॥

৭১

গান

নিজের হাতেই নিতে হবে নিজের শিক্ষার ভার।
পরের দেওয়া শিক্ষা সে তো বিড়ম্বনা সার ॥
নিজের দেশের জ্ঞানের আলো,
নিজের শক্তি দিয়ে জ্বালো।
নিজের সাধনাতেই ঘোচাও নিজের অন্ধকার ॥

ঐ যে চাষা ঐ যে নারী,
চাইছে শীতল জ্ঞানের বারি,
তাদের মুখে তাদের বুকে ছিটাও বারিধার।
নিজের ভাঁড়ে ভরতে হবে
সকল দেশের জল,
দেশজোড়া ঐ তৃষ্ণার মাঠে ঢালতে অবিরল।
সুমঙ্গলের শস্য তবেই ফলবে চারিধার ॥

৭২

গৌর বনাম কৃষ্ণ

গৌর : আস্পর্ধা তো কম নাকো
তোরা হলি সবাই কি ?
ভারতবাসী ও স্বদেশী
বলি যুগ পালটাবি না কি ?
কলি উল্টোবি নাকি ?
ওরে গোলাম কি জাত,
খালি খেয়ে খেয়ে লাথ্,
পড়ে থাকবি এই বুটের তলায়
তোরা কুলি-মজুর,
কেবল বলবি 'হুজুর',
মোদের দেখলেই করবি সেলাম,
শিকলি বেঁধে গলায়।
সব 'কালা আদমী' তোরা।
ধবলাঙ্গ মোরা,
কালায়-ধলায় আসমান জমিন তফাত।
আমরা ডাকবো যখন 'ঘেউ ঘেউ',
তোরা ভয়ে করবি 'কেঁউ কেঁউ',
আমরা মারবার কর্তা,
তোদের মার খাবার ধাত্ ॥
আমরা যখন বলবো যা,
তোরা তখনি করবি তা,
কাজের ভাল মন্দ না করে বিচার।
আমরা যা দেব হাতে তুলে,
তাই শিরোধার্য্য বলে,
হাসিমুখে নিয়ে করবি জয় জয়কার ॥
(এই) বিদেশী বঁধুর পায়
তোদের যা আছে যেথায়,
বাপের সুপুত্তুর হয়ে করবি সমর্পণ।

আমরা গোগ্রাসে সব গিলবো,
বাকী, পোঁটলা বেঁধে নেবো,
তোরা ঘাস-জল খেয়ে
করবি জীবন ধারণ ॥

তোরা দিয়ে সোনাদানা,
নিবি রংয়ের খেলনা,
তোদের কলসী ফুটো করে
মোরা খাব মধু।
মোদের রাঙ্গাচুষি কাঠি
দেখতে পরিপাটি,
তোরা টাকা দিয়ে কিনে
চুষবি বসে শুধু ॥

ওরে তোদের ভালোর জন্যে
এসেছি সব হন্যে,
(এই) ভারত অরণ্যের শিকার
ছেড়ে কোথা যাই ?
(তোদের) খাচ্ছি হাড়-মাস,
দে রে সব শাঁস,
(কালো) চামড়াটাও নিয়ে
ডুগডুগি বাজাই ॥

ওরে কত সুখে ছিলি
সব কি ভুলে গেলি ?
এই বিদেশীর আওতায়
কত সুখ শান্তি।
তোদের চাপলো ঘাড়ে কি ভূত ?
এই সব কচ্ছিস্ কি বেইজ্জত !
এতে লাভ নেইকো মূলে
এক কড়া-ক্রান্তি ।

কৃষ্ণ : থামো থামো ও বাপ ধিঙ্গি,
(আর) ভাব পেড়ে কাজ নাই।
বানিয়ে বোকা খাইয়ে ধোঁকা
(খুব) করেছ আশনাই॥

ছুঁচ হয়ে তো ঢুকলে যাদু,
এখন বেরুচ্ছ 'ফাল' হয়ে,
কতকাল আর ও ফাঁকা চাল
থাকবো কত সয়ে?
হাড়ীর হাল তো করেছ বাপ,
সব নিয়েছ লুটে।
(এ) স্বদেশের আর রেখেছ কি
বিদেশী ক'জন জুটে?

দিয়ে এক হাত পায়ে,
এক হাত গলায়,
করলে স্ব-কাজ সিদ্ধি।
আগে জানিয়ে কত ভালবাসা
দেচ্ছ কত আশা,
তখন তো ছাই বুঝিনি এ
মিয়ার মুরগি পোষা।
(মোদের) বস্ত্রহরণ যে দুঃশাসন
(সে তো) তোদের কারিকুরি,
আর নেব কি আর, আর আছে কি?
(দেহের) শুক্‌নো হাড় ক-খানা?
তাও দিয়েছ ফোঁপরা করে
প্রাণ যে আর বাঁচে না।

তোদের জারিজুরি ভারিভুরি
চলবে না তো এখন আর,
চোখ ফুটেছে চারিধারে
ঘুম ভেঙেছে সবাকার।

ঐ টলছে বিধির আসন,
এবার কলির দফা শেষ।
দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে
কর্ত্তে হবে হিসেব নিকেশ ॥

৭৩

গান

(বুঝি) বিদেশীর দফা গয়া স্বদেশীর হাওয়ায়,
কি থেকে যে কি হবে, তা কে বা জানে হায়!
দিয়ে কানে তুলো, পিঠে বেঁধে কুলো,
চুলোয় পড়ে ছিল কি সুখের আশায় ॥

৭৪

অসাধারণ সিভিল সার্জন

অল সিটিং মাইডিয়ার সারস্,
ইউ আর ভেরি সমঝদার।
শুনুন আমার পূর্ব্ব ইতিহাস,
শুনলে আমার গ্রহের কথা,
হৃদয়েতে পাবেন ব্যথা,
বরাত আমার শুনুন কেমন হায়।
ডাক্তারিতে গেলুম পেকে,
তবু তো স্যার আমায় ডাকে না লোকে,
দুঃখের কথা বলবো কাকে,
বুক ফেটে যায়।
আমার গ্র্যাণ্ডফাদার (অর্থাৎ আমার দাদামশায়)
ছিলেন অতি মহৎ মহাশয়।
এক বিলাসিনীর প্রেমে মজে,

একান্ত তাহারে ভজে,

বাস্তুভিটে দিয়ে গেলেন তায় ॥

আমার বাবা বেটা,

বেনামী করে দিয়ে পাটা,

পাওনাদারকে ফাঁকি দিলে নিলে ইন্‌সল্‌ভেন্ট।

চিরতরে ডুবিয়ে গেল

ঘরে আর পরে,

ফেমিলিতে যত্ন করে,

করে ব্লাক্ পেণ্ট ॥

এখন বুঝুন কত মহৎ বংশ,

আমি তার মধ্যে রাজহংস,

কত কষ্টে বিলাতে গিয়ে,

Five years practice করে,

স্বদেশে ফিরে এলাম মস্ত বড় title নিয়ে।

দেখি যত লাইসেন্‌সিয়েট ম্যান স্টারার,

অর্থাৎ L. M. S. উপাধি যার,

তারা দেখি motor-এতে চড়ে।

(আর) আমি পেয়ে R. S. V. P.

অর্থাৎ রয়েল সারজেণ্ট ভেটারনারী প্রিভী,

দুঃখের মধ্যে একটাও রুগী আসে নাকো ঘরে ॥

দেখে আসা বন্ধ, সব surgical যন্ত্র,

আমি স্বদেশী অস্ত্র শস্ত্রে দেখুন করেছি কেমন কাজ।

আমি সুন্দর dressing জানি,

Lint-এর বদলে দিই gunny,

সময় বুঝে ডাক্তারীর বদলেছি সাজ ॥

কোথায় লাগে কেদার, শশী,

কিম্বা মিস বিপুলা দাসী,

আমি যদি ধরি এই সাঁড়াশি,

একবার পেটের ভিতর দিই ভরে।

বগলেতে দিয়ে ঘুঁটে,
(দেখি) জ্বরের কত তাপ উঠে,
(কারণ) উত্তাপেতে ঘুঁটে যাবে ধরে।
ভীষণ যুদ্ধের তরে,
Thermometer আর নাই বাজারে,
আমি মাথা ঘামিয়ে আবিষ্কার করেছি এরে।
(এই Thermometer ঘুঁটে)
... ...
এতেও লোকে হয় না তুষ্ট,
এমনি আমার দুরদৃষ্ট,
আমায় লোকে দেয় না বলিহারি.
অপারেশনের এই ছুরি,
আমি যদি একবার ধরি,
অপারেশনে successful
হব আমি ঠিক।
আর যদি patient মরে হার্টফেল করে,
জানবেন সে নেহাত বেল্লিক।
এই যে দেখছেন আমার শাণিত বঁটি,
এর কাজ অতি পরিপাটি,
গলগণ্ড, গোদ, গণ্ডমালা হলে,
আমি একেবারে দিই চেঁচে,
তাতে যদি patient না বাঁচে,
আমাকে হাতুড়ে লোকে বলে।
New Science মতে,
ঔষধ ভরি এই পিচকারিতে,
একবার Injection করে দিলে
ম্যালেরিয়ায় ভোগা রোগী
যতদিনের হোক না ধাগী,
At once পেটের ভিতর
শুকিয়ে যাবে পিলে।

করলে বুকের ভিতর palpitation,
আমার এই Stethoscope মুশকিল আসান,
ধরলে চেপে বুকের ভিতর ভাই।
কাঁপুনি টাপুনি সব থেমে গিয়ে,
রোগী ঘুমিয়ে পড়বে আরাম পেয়ে,
আমার মত সার্জন All Indiaতে নাই।

করি যত রকম amputation,
আর কি না dissection এই কুড়ুলের জোরে।
যতই মোটা হোক না হাড়,
আমি এক চোটেতে করি সাবাড়,
একটি ঘা জোরে মেরে॥

শতকরা ৯৯টি লোক,
আমার কৃপায় যায় পরলোক,
এর চেয়ে সৌভাগ্য কি আর আছে।
আমার পসার দেখে যত ডাক্তার দলে,
(আমায়) কোণ-ঠাসা করে দিলে,
এখন আমি একঘরে হয়েছি তাদের কাছে।

বিলাতে এক ধোপানীর মেয়ে,
আমার গুণে মুগ্ধ হয়ে,
Civil marriage করেছিল মোরে।
যত আমাদের জাতির ভয়ে,
এলুম নাকো তারে নিয়ে,
তবু আমায় রেখেছে গো কোণ-ঠাসা করে।

(আছে) দরজায় আমার টাইটেল লেখা,
খুঁজলে আমার পাবেন দেখা,
দিগ্‌বিজয়ী আমি সার্জন।
(এখন) আমার ঘুরতে হবে অনেক ঘরে,
চলুম Sir এ বছরে,
আসছে বছরে, আবার হয়তো পাবেন দর্শন॥

৭৫

গান

দেখা দেছে দেশে সব নূতন অবতার।
এঁদের নূতন শিক্ষা নূতন ব্যাখ্যা নূতন ব্যবহার॥
এঁরা ভালবাসেন চাচার রসুই,
ধরতে গেলে সকল পশুই।
রাজী গোঁসাইবাড়ী প্রসাদ পেতে,
হলে ফাউল-কারির ফুল-ফলার॥
শ্রাদ্ধে এঁদের শ্রদ্ধা আছে,
মাল্কা* যদি পল্কা† নাচে,
অংলা বরে কন্যাদান, বাংলা মতে স্ত্রী-আচার॥
ভার্য্যার শিরে ছিঁদুর সিঁদুর,
শয্যাঘরে টপ্পা নিধুর,
বালাই নিয়ে এ সব যাদুর মরতে ইচ্ছে হয় আমার।
এঁরা জাত ছেড়ে সব বেরিয়ে গেলে,
হত না ঘরে এত অত্যাচার॥

৭৬

ছড়া

বিগত বত্রিশ সন
পাননি সঙ-এর দর্শন,
তার কারণ, পুলিশের বারণ—
ক্ষমা ভিক্ষা তাই করছি নিবেদন।
গত চৈত্রে মৈত্রী খসিয়ে,
ভারতপুত্তুর শত্তুর হাসিয়ে,

* মালকাজান ছিলেন সেকালের একজন নাম-করা বাইজী
† হালকা [illegible]

ভাই হয়ে ভাইকে শাসিয়ে,
শহর ভাসিয়ে,
রেষারেষির বন্যা করেছিল আনয়ন ॥
আইনে বন্ধ বাণ-ফোঁড়া (কিন্তু),
চলেছিল ইঁট ছোঁড়া আর চোরাই ছোরা,
থানার হল্লা, কেল্লার গোরা,
নেতাদের কেতাদোরস্ত মোটরে ঘোরা,
ঠাণ্ডা করতে ডাণ্ডার খেলা মেনেছিল হার।
ভাগো ছিল বাংলার ছাত্র,
ভগ্নঅস্ত্র নগ্নগাত্র,
ত্যাগের বলে বলী মাত্র,
সেইসব স্নেহের পাত্রদের জোরে
সে যাত্রা পারা গেছে পার ॥
এখন জ্বরের নাইকো সাইন,
টেম্পারেচার নাইনটি নাইন,
আইন কিম্বা কুইনাইন করেছে অবস্থা নর্ম্যাল।
কমিশনার স্যার টেগার্ট,
(যাঁর) মাথায় আছে পার্ট,
আর বুকের ভিতর হার্ট,
এই দিশি আর্টটা রাখতে বজায়
অর্ডার দেছেন ফর্ম্যাল ॥

৭৭

অমৃত স্মরণে

এ বছরে কপাল পোড়া,
ভেঙ্গে গেল রসের ঘড়া,
তাইতে এবার সঙের ছড়া,
হয়নি তেমন মিঠে-কড়া,
তেমন সরস সংযত।

হায় রে এবার গতাসু,
নাট্যাকাশের সুধাংশু,
শিরে বৃদ্ধ বুকে শিশু,
বসু-বংশের মহাবসু,
সার্থক-নামা অমৃত ॥
গাইব কি আর শিবের গান,
উঠছে কেঁদে মোদের প্রাণ,
ভেঙ্গে যাচ্ছে বুকখান,
চোখের জলে ছুটছে বাণ,
তাঁরই কথা স্মরণে।
বিনা সেই রসরাজ,
রসহীন এ সমাজ,
কে এ শুষ্ক প্রাণের মাঝ,
রস বৃষ্টি করবে আজ,
জাদুমন্ত্র উচ্চারণে ॥
স্বর্গত সে মহাপ্রাণ,
আমাদের এ অনুষ্ঠান,
দেশের কৃষ্টি করে জ্ঞান,
হতেন মোদের মাঝে অধিষ্ঠান,
ক্ষতি করে নিজের কার্য্য।
তাঁর মত হায় আর বা কে যে,
জেলের সঙ্গে জেলে সেজে,
জেলের সঙ ঘষে' মেজে,
রসে, শিষ্টাচারে, এবে তেজে,
করবে সুধীসমাজ গ্রাহ্য ॥
(তবে) আছে আমাদের এ ভরসা,
তাঁর সে স্নেহ ভালবাসা,
কমেনি এক রতি মাষা,
পুরাতে দেশবাসীর আশা,
করবেন তিনি অবশ্য এক যুক্তিতে।

(তাই) উদ্দেশে তাঁরে প্রণাম করে,
তাঁর আশীর্ব্বাদ শিরে ধরে,
সেই মূর্ত্তি রেখে অন্তরে,
সঙের সাজ-সজ্জা প'রে,
বেরিয়েছি এই ফুর্ত্তিতে ॥
হাসির সুরে হৃদয়-তার,
সদা বাঁধা ছিল তাঁর,
তিনি ছিলেন হাস্য অবতার,
তাই তর্পণ কর্ত্তে সেই মহাত্মার,
হাসি আর ফুর্ত্তি মোদের তিল, গঙ্গাজল।
তাই চোখের জল চেপে চোখে,
মুখের হাসি রেখে মুখে,
বুকের ব্যথা লুকিয়ে বুকে,
হাসতে হাসি মহাদুঃখে,
বেরিয়েছি এই নিয়ে দলবল ॥

৭৮

বর্ষ বিদায়

তের শ' ছত্রিশ সাল, শেষ করি কার্যাকাল,
নববর্ষে চার্জ দিয়া বলে—
আজি চৈত্র-সংক্রান্তি, বুঝে লও কড়া-ক্রান্তি
কল্য প্রাতে আমি যাব চলে।
রেখে গেনু যে সেরেস্তা, এ দেশের দুরবস্থা,
ঘটাইতে রাখি নাই বাকী,
আছে যাহা অবশেষ, সেটুকু করিতে শেষ,
মহাশয়, পারিবেন না কি ?
জেলেদের ছেলেগুলি, শুনাতো যাহার বুলি,
নাই আজ সেই অমৃতলাল।
অমৃত কি মর্ত্ত্যে থাকে ? স্বর্গে নিয়ে গেছে তাকে,
নাট্যজগতের দিক্‌পাল।

ধরি যিনি দেব-দেহ, ভুলেনি এঁদের স্নেহ,
এরাও তো ভুলেনি তাঁহায়,
তাঁহার চরণ স্মরি, উদ্দেশে প্রণাম করি,
আশিস মাগিছে দুটি পায়।
অমৃত কি মরে কভু, যা দান দিয়েছ প্রভু
অফুরন্ত, মহান বিরাট,
তোমার যাত্রার পরে, ভারতের ঘরে ঘরে
লেগে গেছে বিবাহ-বিভ্রাট।
আমি যে ছত্রিশ সাল, এসেছিনু হয়ে কাল,
এ উৎসব করিতে সংহার,
কি করিব তার ক্ষতি, কীর্তি যস্য স জীবতি,
অমৃতের জয়—মোর হার।
আর যাহা করিয়াছি, বলিতেছি বাছি বাছি,
শুনিয়া করহ অবধান,
আমার সংহার নীতি, দেখায়েছি নিতি নিতি,
এবে মোর কার্য্য অবসান।
যবে লই কার্য্যভার, সংহার সংহার,
মূলমন্ত্র হয়েছিল মোর,
বিধবার এক বেটা, আগেই নিয়েছি সেটা,
শূন্য করে অভাগীর ক্রোড়।
পতি-পত্নী দুয়ে মিলে, নিয়ে কটি মেয়ে-ছেলে,
মহাসুখে কাটাইছে দিন,
শূন্য করি পতি হিয়া, হরে নিনু প্রাণপ্রিয়া,
শিশুগুলি হলো মাতৃহীন।
রাখিতে নূতন কীর্তি, পতি-হৃদে কু-প্রবৃত্তি,
হঠাৎ দিলাম জাগাইয়া,
স্ত্রী হতে দু-মাস পার, পত্নীশোক গেল তার,
উলু উলু দিনু লাগাইয়া।
কিন্তু বলি বার বার, মানিয়া নিয়েছি হার,
দীনা ছিনু বিধবা নিকটে,

শত সুখ প্রলোভন, তাঁর কাছে অকারণ,
মাতৃস্নেহ অকৃত্রিম বটে।
ধন্য গো জননী মম, এ জগতে তব সম,
বাবার বাবাও কিছু নন,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখ, সহিয়া শতেক দুঃখ,
বাছাদের করিছ পালন।
তার এক স্থানে হায়, খুব হয়েছে আমায়,
করেছিল অনশন পণ,
সে একা বাঙ্গালী বাচ্চা, ভিতর বাহির সাচ্চা,
কে জান ?—যতীন্দ্রনারায়ণ।
বলিহারি দিলখানা, তুচ্ছ তার জেলখানা,
দেহখানা নাশি তিলে তিলে,
অদ্ভুত এ সমর, মরিয়া হলো অমর,
হেন বীর কয়জন মিলে ?
এ বছর কংগ্রেস, ত্যাগ করিতে আদেশ,
দিয়াছে যতেক কাউন্সিলে।
কংগ্রেসীর পরিত্যক্ত, অনেকে লভিল তক্ত,
জনম সার্থক করে নিলে।
বাহবা মেদিনীপুর ! জঞ্জাল করিতে দূর,
ঝাড়ু দিয়ে মলা মাটি ধুতে,
বাংলার দরবার, করিবারে পরিষ্কার,
পাঠাইলে হোসেনী রাউতে।
ছোট হলে কিবা হয়, মন তার ছোট নয়,
পা-চাটার মত কোনদিন,
শিক্ষিত নহেক তবু, দেশের বিপক্ষ কভু
ভোট দিয়া হন নাই হীন।
বাঙ্গালার কংগ্রেসে, নারদ ঢুকিল এসে,
নেতার বিরুদ্ধে নেতা সাজে,
কেহ বলে শ্যাম বড়, কেহ বলে হাম বড়,
দেখে মোরা ম'রে যাই লাজে।

সুভাষাদি নেতাগণে, পড়ে এক সিডিশনে,
আছে এবে কারাগারে ঢুকে,
যতীন্দ্রমোহন সেন, তিনিও থেকে এলেন,
কারাগারে মগের মুলুকে।
পণ্ডিত মালব্য তেজী, এলেন এসেম্বলি ত্যজি,
বিষ্ণুনাম করিয়া স্মরণ,
করে ত্রিবেণীতে স্নান, দেখ কোন দিকে যান,
কোন্ পথে করেন গমন।
লবণ আইন আজি, ভাঙ্গি গান্ধী মহাত্মাজী,
এখনো হলো না গ্রেপ্তার,
ছোট বড় বহুজন, করি এই আয়োজন,
প্রবেশ করেছে কারাগার।
এ পর্য্যন্ত কয়ে আমি, নিজস্থানে গমিষ্যামি,
অদৃশ্য হইব কাল ভোরে,
দিন যাবে কথা রবে, স্মরণে রাখিও সবে,
খুঁজে কিন্তু পাবে নাকো মোরে।

৭১

দেশের দুর্দ্দশা—বাঙ্গালী কোথায়?

(হায়) হাসব হাসি আর বা কিসে,
দেখে শুনে লাগে দিশে,
কোন দেবতার দৃষ্টি বিষে,
বাংলার সুখ গেছে মিশে
শূন্যে—মহা শূন্যে।
দেশজোড়া হাহাকার,
নিরন্নের চিৎকার,
ঘরে ঘরে ভরা বেকার,
কে বা চায় মুখ কার,
কে বাঁচে কার পুণ্যে।

এমন যে এই কলকাতা,
এর কথাতে ঘুরে মাথা,
বিদেশী কেউ এলে হেথা,
ভাববে আমি এলুম কোথা,
          এটা কি বাংলা দেশ ?
হেথা বাঙ্গালীর নাই তো কিছু,
(এরা) পড়ে আছে সবার পিছু,
হয়ে অতি নীচের নীচু,
মাথা বুক করে উঁচু
          তবু বলে আছি বেশ।
একে লণ্ডন আর বার্লিন,
জাপান ও মার্কিন,
ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিন,
হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, মিশর, চীন,
          শাঁস নিয়ে দিচ্ছে এদের ছোবড়া।
তার উপরে প্রতিবাসী,
ভারতের ভিন্ প্রদেশবাসী,
সবে ভাই ভাই বলে আসি,
পরিয়ে সখ্যের ঐক্যের ফাঁসি,
          ভেতরটাকে করে দিচ্ছে ফোঁপরা।
(হেথা) ড্যালহৌসী টু চৌরঙ্গী,
দখল করেছে ফিরিঙ্গী,
বড়বাজার বড় ধিঙ্গী,
মাড়োয়ারী জবর জঙ্গী,
আর্মানীর হয়ে সঙ্গী,
          কলুটোলা, মুর্গিহাটা জয় করেছে নাখোদা।
এক্সচেঞ্জ কি সেয়ার মার্কেট,
সেথা বাঙ্গালীর বন্ধ যে গেট,
জমিদারী কি হাউস 'টু-লেট',
ক্রমে ভরাচ্ছে বিদেশীর পেট,

বুক জ্বালিয়ে নাশের গেট,
শুধু হে হরি! অঃ হাঃ খোদা!'
মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, মাদ্রাজী, চেটিয়া,
কত পার্শি, ভুটিয়া, নিচ্ছে সবাই লুটিয়া,
মুখের গ্রাস বাঙ্গালীর।
বেহার তো বেহারীর, মাদ্রাজ সে মাদ্রাজীর,
পাঞ্জাবও পাঞ্জাবীর (কিন্তু),
বিলিয়ে নিজের ভাঁড়ের ক্ষীর,
বাঙ্গালা সামিল হচ্ছে কাঙ্গালীর॥
বাঙ্গালার ছুতোর, রাজ কি কামার,
নাপিত, ধোপা, মালি, চামার,
শুনা যায় না তাদের নাম আর,
বেহারী চাষী, বাংলার খামার,
করছে ক্রমে গ্রাস।
বাগ্‌দী, পাইক, বরকন্দাজ,
পায় না এখন খুঁজে কাজ,
তার বদলে করে বিরাজ,
শিখ, গুর্খা, নেপালী আজ,
জন্মাতে লোকের ত্রাস॥
'এলুমুনিয়াম বর্তন' হলো যেই প্রবর্তন,
করে কাঁসারীর হাত কর্তন,
ভাটিয়া, পার্শি নর্তন,
সুরু করলো সজোরে।
গয়লা দিদির দুধের কেঁড়ে,
আহীর এসে নিলে কেড়ে,
বাংলার মাঝি নৌকা ছেড়ে,
কোথায় আছে ঘাপটি মেরে,
পড়ে না আর নজরে॥
রাস্তায় তো দোকান আছে দু' সারি,
বাঙ্গালীর তার শ'য়ের মধ্যে দু'চারি,

ফেরি করে ফিরি হাজার পসারি,
দেখি না তো তাদের মাঝে বাঙ্গালীর পসারই,
টায়ে টায়ে কোনমতে
তারা দিন কাটায়।
বামুন ঠাকরুণ কি গিরীশ পাচক,
বুঝি রাঁধতে পারে না মুখরোচক!
ভাজলে গজা তিন্তু মোদক,
থাকে না তার কিছু মোচক,
তাই ভরেছে আটার রুটি,
শিখের পরটায়॥
হেথায় বাঙ্গালীর পোলা,*
আছে ক'জন রিক্‌শাওয়ালা,
গাড়োয়ান কি মোটরওয়ালা,
মুটে, ভারি জল-তোলা?
হেথা কাবলীরও ব্যাঙ্ক খোলা,
চক্ষু বুজে করে তারা
সুদ আদায়।

* অন্যান্য বছরের মতো ১৩৩৬ সালেও চৈত্র সংক্রান্তির কয়েক দিন আগে থেকেই জেলেপাড়ার সঙের মহলা চলেছিল। তখনকার বিশিষ্ট সংবাদপত্র 'বঙ্গবাণী'র একজন প্রতিনিধি প্রতিদিন মহলার সময়ে সঙের গান ও ছড়া শুনতে আসতেন এবং ওই সময় তিনি কোন-কোন গান ও ছড়া পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে লিখে নিতেন। ওই বছর ৩০ চৈত্র 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় তিনি জেলেপাড়ার সঙের কয়েকটি ছড়া ও গান ছাপিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলিতে কিছু ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়েছিল। শোনা যায়, 'বঙ্গবাণী'র প্রতিনিধি নাকি তাঁর ইচ্ছামতো দু-এক লাইন অথবা কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়ে এবং কোথাও বা নিজের লেখা যোগ করে সেগুলি ছাপিয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই জেলেপাড়ার সঙ এজন্য প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং পরে 'বঙ্গবাণী'র সেই প্রতিনিধি তৎকালীন জেলেপাড়ার সঙের কর্মকর্তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। লোকান্তরিত জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট থেকে আমরা সংশ্লিষ্ট যে-সব তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলাম তা এখানে উল্লেখ করা হল।

'সঙের ছড়া ও গান' অংশের ৬৮ থেকে ৭৩ এবং ৭৭ থেকে ৭৯ সংখ্যক গান ও ছড়াগুলি সম্পর্কে, বিশেষ করে "সাবাস রে বাঙ্গালী", "দেশের দুর্দশা—বাঙ্গালী কোথায়?" ছড়া দুটি প্রসঙ্গে

(আমরা) ঘরে একপাল কাঙ্গালী জিইয়ে,
(তবু) বছরে দেড়টা বিইয়ে,
চেষ্টা ছেড়ে কপাল ধিইয়ে,
যাচ্ছি কেবল মিইয়ে,
গুণ টেনে কাদায় ॥

(এম্নি ধারা) অসাড় হলে কাজের হাত,
ধরিয়ে তাতে পক্ষাঘাত,
সেজে ঠুঁটো জগন্নাথ,
খেয়ে চাকরীর ভিক্ষের ভাত,
ক'দিন বা বাঁচবে জাত,
দেখুন একবার খতিয়ে।

(যেথায়) মা, বাপ, ভাই, পিসী, মাসী,
মাগ-ছেলেরা উপবাসী,
সেথায় কি আর ফুটে হাসি,
বল বুদ্ধি যায় যে ভাসি,
ভাবনা ভয়ে থতিয়ে ॥

জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় বলেছিলেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সমগ্র ভারতবাসীর, বিশেষ করে বাঙ্গালীর, উন্নতিকল্পে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বাঙ্গালীর সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য যা কিছু ন্যায্য করণীয় মনে করতেন তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বক্তৃতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ইত্যাদির দ্বারা বহুভাবে তিনি বাঙ্গালীকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, উক্ত ছড়া দুটিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রভাব কম ছিল না।

"অন্ন সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার" গ্রন্থের (চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা—গ), অবতরণিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন :

"বাংলার আর্থিক দুর্গতির আর একটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। আমি যখন বোম্বাই, লাহোর, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ ও দিল্লী অঞ্চলে যাই তখন একটি বিষয় সর্ব্বাগ্রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সকল সহরে ও প্রদেশে সমস্ত শ্রমজীবী ও চাষী তত্তৎপ্রদেশবাসী, অর্থাৎ সেখানকার যাবতীয় মুটে, মজুর, পাহারাওয়ালা প্রভৃতি সেই দেশের লোক। লাহোরে কেবল মুটে মজুর নহে, যত বড় বড় ব্যবসাদার সবই পাঞ্জাবী। আমাদের কলিকাতার যেমন চৌরঙ্গী, সেখানেও সেইরূপ সুবৃহৎ সৌধমালা খচিত মাল (Mall)। ইহাই হইল সেখানকার ব্যবসাকেন্দ্র। কিন্তু চৌরঙ্গীর সহিত তফাৎ এই যে, সেখানে কচিৎ এক আধজন

তাই করজোড়ে কাতরে,
বলছি সব ভ্রাত রে,
একটি বার চেতরে,
রাখ বঙ্গমাতরে,
তোর ভারতে কাজ নাই।
সম্বল যার ভিক্ষের টুকনী,
মাথার উপর উড়ছে শুক্‌নী,
সে পান্তা ভাতে খেয়ে ঘুঘনী,
লম্বা লম্বা ঝাড়লে বুকনী,
শুনবে না কেউ হাসবে রে সবাই॥

ইউরোপীয় বা ভিন্ন দেশীয় লোকের সাক্ষাৎ মিলে। লাহোরের 'আনারকলি' কলিকাতার বড়বাজারের তুল্য, কিন্তু সেখানে মাড়োয়ারী বা ভাটিয়ার স্থান নাই, সমস্ত ব্যবসাই পাঞ্জাবীর অধিকৃত। বোম্বাইতেও এই প্রকার। মাদ্রাজের অবস্থা অনেকটা বাংলার অনুরূপ অর্থাৎ যাবতীয় ব্যবসাবাণিজ্য ইউরোপীয়, মাড়োয়ারী, কাচ্চি প্রভৃতির করতলগত। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে, সেখানে প্রবলপ্রতাপ চেট্টি বা শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় ব্যাঙ্কিং-এর কাজে পুরুষানুক্রমে সিদ্ধহস্ত; বাংলায় সে শ্রেণীর লোকের একান্ত অভাব। এতদ্ভিন্ন মুটে, মজুর ও সকলপ্রকার শ্রমজীবী সেই প্রদেশস্থ।"

উক্ত ছড়া প্রসঙ্গে জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এ-কথাও বলেছিলেন, বর্তমানে নানা বিষয় চিন্তা করে এই কথাই বলতে হবে যে, দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রদেশ নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের সামনে অমঙ্গল দেখা দেবে। দেশবাসীর শ্রী ও সমৃদ্ধির জন্য, বিশেষ করে দেশরক্ষার জন্য, সমগ্র দেশের মানুষের একতা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে চিন্তা করা সংকীর্ণতার পরিচায়ক, কিন্তু অন্য প্রদেশের মানুষ যারা উদর-জ্বালা নিবারণ করতে বাংলায় এসেছিলেন তাদের কথাও ব্যঙ্গ করে সঙের মাধ্যমে দশ জনকে সত্যি একদিন আমরা শুনিয়েছিলাম। এ-কথা অস্বীকার করা অথবা গোপন করা ন্যায়সংগত হবে না। সঙের মাধ্যমে বহু শ্লীল ও অশ্লীল কথাও বলা হয়েছে। রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে সঙ সেদিনের বহু প্রগতিশীল মানুষকেও কটূক্তি করেছিল। এ সব কথা বাদ দিয়ে যদি কিছু লেখা হয়, তাহ'লে গল্প লেখা হবে, এবং তা সঙের ইতিহাস হবে না। জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সেই কথা স্মরণ করে যেখানে যা পেয়েছি তা যথাসাধ্য উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। —গ্রন্থকার

বীরভূম

৮০

গান

ওহে ঠাকুর—ঠাকুর গোঁসাই,
সবার পেথম পেনাম জানাই।
কিন্তু দাদা কি কর ছাই,
হল কি রোগ আগুন জ্বালাই!
মানুষ হয়ে অগ্নিদেব,
অগ্নিলীলা করো না ঠাকুর।
নইলে শেষে ভীষণ কুঠে,
সারাজীবন বিষাদ ঘুঁটে,
জ্বল জ্বল করে জগাতঙ্কে,
হবে মরে ধুঁকো কুকুর।
দিয়াশালাই জ্বালা ছাড়ো
কর ভাল যা করতে পারো।
এখনও সময় আছে,
সুমতি এ হউক ঠাকুর।
মরবে কেন গলিত কুঠে?
হবে কেন ধুঁকো কুকুর!

৮১

ছড়া

খুড়োমশায় শুনেছো ওগো,
খবর জবর ভারি,
মজা কি শুনো তারি।
আশীর কোঠায় ঠাকুরজামাই,
করেন শুনি কি মজাটাই।

ষোড়শী এনে বাজান সানাই,
হাউইবাজী রং রোশনাই,
ফুটিয়ে ক'দিন কি ধুম চালাই।
এরও আগে তিন কুমারী,
এনেছিলেন রংবাহারী,
তারা শুনি সবাই বাঁজা?
চতুর্থ এ বর তাই এ সাজা,
সাজেন তিনি লুটবিহারী।
বুড়ো হয়েও মদ্দ সেজে,
সিং ভেঙ্গে হন বাছুর রাজা,
ঠাকুরজামাই কি বউরা বাঁজা॥

৮২

ছড়া

ওহে ঠাকুর গোঁসাই প্রবর,
ওহে এঁড়ে চোর,
এঁড়ে চুরি করে চাষ
করেছ বিস্তর!
ধরাও যদি পড় নাই,
জেনেছে স্বরূপ সকলে ভাই।
ঠাকুর হয়ে একি রঙ্গ,
করলে কি অসৎ সঙ্গ।
এবার ফের ধরতে যদি পারি,
মজুমদার আর সিংজী বাবুর
হুকুম নিয়ে মারব জুতোর বাড়ি,
মারব জুতোর বাড়ি।
এবার ফের ধরতে যদি পারি।

৮৩

গান

হালে হালে দেখব কত হাল
হবো আর কত নাজেহাল ॥
নইলে ভাই,
গো রক্তে হয় চিনি সাফাই,
নইলে হয় না মোটা দানাই।
ইংরেজ আজ কি চাল চালাই,
রাখবে না আর জাতের বালাই।
কোথায় মোদের গাজীপুরী,
হলই বা লাল লালচে ভূরি।
ব্রিটিশ প্রভুর কৃপায় উধাও সব,
ছিষ্টি ছাড়া দেখব কত সব।
হলেও চিনি ধবধবে এ,
দেবতা ঠাঁয়ে কে দেবে এ,
কি দিয়ে আজ আমায় সাজাই ?
এ হাল বল আজ কারে জানাই।

শিবপুর

৮৪

গান

কেমন করে খোলা ঘাটে,
নাইবো বলো না ॥
শতেক ছোঁড়া ঘাটে আছে,
হটুতে বলো না ॥
এদিক ওদিক থেকে থেকে,
হাঁ করে সব তাকিয়ে দেখে,

ভাবভঙ্গি কত রঙ্গের,
কত নানান ছলনা।
কেমন করে খোলা ঘাটে
নাইবো বলো না ॥

৮৫

জুয়াড়ী

ঢোল ভেঙ্গেছে, খোল ভেঙ্গেছে,
নোটের তাড়া তাও নিয়েছে,
ঘোড়ার চালে, চাল চুলো সব,
বিকিয়ে ফিরি বাড়ী,
কানা কড়ি, নেই পকেটে,
কেমনে চড়বো আমি গাড়ী ॥

৮৬

চাঁদা আদায়কারী দল

চারিদিকে দেখি শুধু একি,
নেই খাঁটি দেখি সব মেকী।
বাবু সব রংদার সং,
মুখে ঝুটা বাত্‌ কত ঢং।
নেতা সেজে নাচে ধেই ধেই,
কোঁচা বড় ট্যাঁকে কিছু নেই।
জলে ভাসে গ্রাম চার মাস,
এরা তোলে চাঁদা বারো মাস।
তুলে চাঁদা দেয় পেটে সব,
এরা জানে শুধু কলরব ॥

যুক্ত

৮৭

সাপুড়ের গান

আই মা বিষ হরি জানাই বেদনে।
সাপিনী বিষে বঙ্গ মরে পরানে॥
বান্ধি গলে ভুজঙ্গিনী দ্বি-ভুজ বন্ধনে।
দিনরাত দিচ্ছে মোচড় ফোঁস ফোঁস গর্জনে॥
রক্ষ মা দয়াময়ী সাপিনী দংশনে।
বান্দর খেলা দেখাব, আজ দয়া কর দীনে॥

৮৮

ঘটকীর গান

গড় করি মা তোমার পায় ছাড়ান দাও আমায়।
তোমার ছেলের জুড়ি মেলা হবে মহা দায়॥
নাইকো ছেলের গুণের সীমে বিদ্যে জ্ঞানও তাই।
আছে শুধু ছেলের মায়ের মস্ত বড় খাঁই॥
(ওগো) বিয়ে নয় এ ছাগল জবাই,
করছে কসাই প্রায়॥

৮৯

সিঁদুরওয়ালা

মেটে সিঁদুর বেটে বেটে
আমার হাত গেছে যে ফুলে।
এখন টায়রা দিয়ে সিঁথি ঢাকে,
বধূরা সিঁদুর ছোঁয় না চুলে॥

৯০

গান

বিভেদ জ্ঞান ভুলে রে ভাই, আয় না সবাই সে গান গাই।
যে গানে প্রাণ মাতোয়ারা, বসুন্ধরা কাঁপে ভাই॥
এক মায়ের সন্তান মোরা, পর তো কভু নই রে ভাই।
ভালবাসা দূরে ফেলে দলাদলি কেন ভাই॥
দুনিয়ার জাতি যত ভাই,
জাতীয় বলে বলী সবাই।
আমরাই শুধু বিভাগ করে হীন হয়ে আছি ভাই॥
বলশালীর পালো ধর্ম্ম, দুর্ব্বলে কোল দে না ভাই।
মা যে তবে হবেন তুষ্ট, মনোকষ্ট ঘুচবে ভাই॥
তাই বলি ভাই আপন ভায়ে আপন করে নে না ভাই।
ছুত্‌মার্গটা থাকলে দেশে জাত উন্নত হয় না ভাই॥
সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সবাই মন্দির দুয়ার খোল না ভাই।
মাতৃ আশীর্ব্বাদ লয়ে শিরে দেশের কাজে লাগ না ভাই॥

৯১

সাপুড়ের গান

এই লাগ লাগ, বাস্তুর খেল, লাগ ফণা ধরে।
লাগ লাগ লাগ, লাগ রে লাগ, লাগ শীগ্‌গির করে॥
এই আইল মা মালসামুখী, খই ছাড়া বয়ানে।
নাকে নথ সিঁথির সিঁদুর, লাল শাড়ী পরনে॥
ওগো এনার বড়ই রাগ, কাটলে বাঁচা দায়।
ধুনোর গন্ধে নেচে ওঠে মা, চক্কর ধরে ঠায়॥
ভিটেয় উঠতে দেয় না মোটে, যা নন্দ দেবরে॥
ওগো দুধ-কলা দিয়ে কালসাপিনী পোষ ঘরে ঘরে॥
যাও মা কালনাগিনী যাও মা বিবরে।
আত্মীয় স্বজনে খেদাও মা ফণা উঁচু করে॥

৯২

গান

বন্দিলাম যাগে-যোগে আগে ভাগে জননী চরণে,
গরুড়বাহনে বন্দি দেব নারায়ণে,
বন্দিলাম গণপতি, আদ্যাশক্তি তারা ত্রিনয়নী,
লক্ষ্মী, সরস্বতী বন্দি, বন্দি শূলপানি।
একটি একটি সব কটি বন্দি দেবগণে,
গাইব তরজা সভার মাঝে দয়া কর দীনে।
এই পর্য্যন্ত বন্দনা ক্ষান্ত, ঢুলি বাজাও ঢোল,
সবাই মিলে বলো একবার হরি হরি বোল॥

৯৩

গান

জয় শ্রীমাধব যাদব নন্দন
জয় শ্রীরাধা জয় শ্রীবৃন্দাবন।
জয় গোপাল গোবিন্দ চরণার বৃন্দ,
আনন্দে বল মন॥
লয়ে রাই কিশোরী কাল শশী,
হোলিতে মত্ত আজি ব্রজবাসী,
মারিছে কুমকুম ফুলবাশি,
হাসিয়া গোপিনীগণ॥
লালে লাল তমাল তল,
লাল যমুনার কাল জল,
আবীর ছটায় হয়েছে লাল
সুনীল গগন॥
হেরিলে দোল লীলায়,
রাই কিশোরী শ্যামরায়,
মহাপাপী তরে যায়,
রয় না ভব-বন্ধন॥

১৪

গান

হে বঙ্গ কর্ম্মবীর, উন্নতশির দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত[১]
রাজনীতি গগন মাঝে, এখনও বিরাজে তব স্বর প্রদীপ্ত।
হয়ে দেশবন্ধুর শিষ্য, ত্যজি আলস্য করিতে ব্রত পালন,
উপেক্ষি বন্ধু আত্মীয় স্বজন, তুমি করেছিলে কারাবরণ।
দেশের সেবায় ও দশের সেবায়, করি হায় আত্ম-নিবেদন,
মাত্র অষ্টম বর্ষে, আবদ্ধ বন্দী বেশে করিলে ব্রত উদ্‌যাপন।
জনম লভি অভাগা দেশে, নিজেকে যে করে গেছ দান,
বঙ্গ-জননীর সুযোগ্য সন্তান, কোন মহাদেশে করিলে প্রয়াণ?
হে চিত্তজয়ী জনগণ নায়ক হানিলে সায়ক বক্ষে সবার,
আকস্মিক তিরোধানে, বুঝি বিধি বিড়ম্বনে দুর্ভাগ্য বাংলার।
ফিরে এস ফিরে এস ওগো দেশপ্রিয় মহামহিম গরীয়ান,
তোমারে হয়ে হারা, কেঁদে কেঁদে সারা ভারতসন্তান।
আজি হীনতায় দীনতায় ফেলি দূরে আদর্শ স্বার্থত্যাগী বীরে,
ভক্তি অর্ঘ্যে অশ্রু ভরিয়া, শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া পূজা করি নত শিরে॥

১৫

গান

তোল তোল তোল তান, মিলিত কণ্ঠে গান।
বল জয় বল জয় জয় জয় দেশপ্রাণ॥[২]
আকাশ বাতাস করিয়া মুখর, এখনও ধ্বনিত যার কম্বু স্বর,
সে যে নাহি আর গিয়াছে মিলায়ে, দীর্ণ করিয়া হৃদয় কন্দর।
সে বীণা-ঝঙ্কার শুনিব না আর, চিরতরে হয়েছে নির্বাণ,
গুণমুগ্ধ মোরা হায় তোমা হারা, মরমে মরিয়া কাঁদি শতধারে,
এস এস ফিরে বাংলার ঘরে।
এস পুনঃ দেশপ্রাণ॥

১ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুতে খুরুটের সঙের শ্রদ্ধা-নিবেদন
২ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মৃত্যুতে খুরুটের সঙের শ্রদ্ধা-নিবেদন

২৬

গান

ভুলি দুঃখ-শোক দেশবাসীগণ,
মিলিত কণ্ঠে মুক্তির মন্ত্রে পূজ ও চরণ।
বাজাও শঙ্খ, বাজাও বিষাণ, মহাপ্রাণ মায়ের সন্তান,
জ্বালায়ে গিয়াছে যে দীপ, জ্বলুক হৃদে সর্ব্বক্ষণ।
মরদেহের বিনাশনে,
মরে নাই কর্ম্মবীর, বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে,
লভিতে সিদ্ধি, বাড়াতে ঋদ্ধি,
নীরবে মায়ের করিতে সাধন॥

২৭

চশমাওয়ালার ছড়া

প্রত্যেকজনা এক একখানা নিন চশমা।
নিশানা এটি সভ্যদের, পেয়াদাদের যেমন তকমা॥
সরু বা মোটা, পছন্দ যেটা, নিন্ 'টেরাই' করে।
চক্ষু জুড়ান, চক্ষে দিয়ে, কিনে নিয়ে সস্তা দরে॥

২৮

চশমাওয়ালার গান

চশমা তোর ধন্য রে জন্ম।
যে ভাবে যে চায় তারে দাও সেই কর্ম্ম॥
রকমারি গুণের কথা, কহিতে না পারি।
চশমা না থাকিলে, হাত্ড়ে মরি বাড়ী॥
অন্ধের নয়ন মণি, কুটো, মাটি, ধুলোর শনি॥
সাগরতলে নভোমণ্ডলে রাখ নিজ ধর্ম্ম॥

কাসুন্দিয়া

৯৯

গান

এমন করে বল না ওরে চলবে কটা দিন,
দশের কাছে পড়লে ধরা হবি রে মলিন।
ভণ্ডামি আর করবি কত এখন হও কর্ম্মে রত,
মনে রেখ স্বদেশব্রত কর্ম্মী হবে কর্ম্মে লীন॥

১০০

গান

নাও না কিনে নকলদানা ছেড়েছি সস্তায়।
মিটবে আশা ঘুচবে ব্যথা একটি পয়সায়॥
নামটি বটে নকলদানা,—নকল কিন্তু নয় এর দানা।
যেমন দেখি নকলিয়ানা—ঢুকেছে বাংলায়॥

১০১

গান

বলিহারি দুনিয়াদারি বাবুগিরি কি মজার।
ঘটলো লেঠা কেবা কেটা বাপের ব্যাটা চেনা ভার॥
বাপ কারো নগদা মুটে মা বেটী বেচে ঘুঁটে।
ছেলে তাদের 'রিষ্ট' এঁটে দেয় গো বাহার॥

১০২

গান

এস গো মা বীণাপাণি শ্বেত অব্জ নিবাসিনী,
মম কণ্ঠে বসো ও মা কবিকণ্ঠ বিহারিণী।
বাসনা করেছি আজি নানা রঙ্গে সঙ সাজি,
শুনাব দশের কাছে দেশের দুঃখ কাহিনী॥

১০৩

গান

সভ্যতার নিদর্শন চশমা আমার,
চোখের মাথা খেতে এর জোড়া মেলা ভার।
এ যুগের বাবুয়ানা হয় না এর কৃপা বিনা,
তাই তো ওদেশ থেকে আনা হয়েছে এবার॥

১০৪

গান

লেখাপড়া বিষম ফাঁড়া হলো একি দায়,
পড়ে পড়ে হাত পা ভাঙ্গে তবু পড়া না ফুরায়।
আট্‌টার সময় বিছানা ছাড়ি, চায়ের দোকানে আড্ডা মারি,
চুরুট ফুঁকে ধোঁয়া ছাড়ি, কারেও করি নাকো ভয়॥

১০৫

গান

বঙ্গনারী মিনতি করি ভাব গো একবার।
কি ছিলে কি হলে, তোমরা কি হবে আবার॥
কোথা গার্গী, লীলাবতী, কোথায় রাণী দুর্গাবতী,
কোথায় সীতা, কোথায় সতী আদর্শ তোমার॥

১০৬

গান

এনেছি মজাদার সাড়ে চার ভাজা,
ঠক্‌বে নাকো খেয়ে দেখ বাসী নয় তাজা।
বহু মসলা আছে এতে, গুণ কত কব মুখেতে,
যে খেয়েছে সেই বুঝেছে এর মজা॥

খিদিরপুর (পদ্মপুকুর)

১০৭

ছড়া

বছরের প্রথম দিনটা,
থাকিস্‌নি হয়ে ক্ষীণটা।
ভগবানের এ চিড়িয়াখানা,
ছুটো ডিগবাজি খা না।
তুই কুকুর, আমি বাঁদর,
পরে জামা ধুতি চাদর,
মানুষ সেজে নানা প্রকার,
করি কৃষ্ণের গোষ্ঠে বিহার।
ওরে সঙ ঢাক্ রে নকল,
খুলে মুখোশ দেখা আসল।
তবেই পাবি চরণ তাঁরি,
শরণ দিবেন গোষ্ঠবিহারী॥

১০৮

ময়ূরপঙ্খীর গান

জীবন-তরী ভাসিয়েছি কালো যমুনায়,
ভবপারে যাবি কে কে ত্বরা করে আয়।
(আরে ও) তুফান দেখে ভয় পেয়ো না, চড়ো এসে নৌকায়,
অকূলের কাণ্ডারী তুলে দিবেন কিনারায়।
(আরে ও) প্রতিকূল বহিছে বায়ু, কালবৈশাখী প্রায়,
ভয় পেয়ো না ব্রজাঙ্গনা হরি তরী বায়।
(আরে ও) নামের ঝোলা জপের মালা, সঙ্গে লয়ে আয়,
ব্রজবালা চিকন কালা পারে লয়ে যায়।
(আরে ও) বিনামূল্যে পার করিতে এলেন রসরায়,
শুধু 'পার কর' বলে ডাকলে পরে অমনি তরায়।

(আরে ও) ভবের হাটে হাট করে পাপ বোঝানে মাথায়,
এখন বোঝা ফেলে হরি বলে ডাক রে পুনরায় ॥

১০৯

কলির গুরু

কলির রাজধানী কলিকাতা,
অবতারে অবতারে ছেয়ে গেল, খেতে ধর্ম্ম জেতের মাথা।
কেউ ঠাকুর কেউ হচ্ছেন স্বামী, রিপুর বশ আর অর্থকামী,
হরে, নরে, রামী, বামী, সবাই মুক্ত হেথা।
জুটলে পরে ধনী চেলা, সামলানো ভার গুরুর ঠেলা,
খেলেন পঞ্চ মকার খেলা, ঘুরিয়ে দেয় সবার মাথা।
কোথায় আছ ভগবান, অনাচারে যায় যে প্রাণ,
কর ত্বরা পরিত্রাণ, ঘুচাও ধাঁধা প্রাণের ব্যথা ॥

১১০

দেশহিতৈষী।

এত দিনে কবিতীর্থ হবে গো উদ্ধার।
ধন্য ধন্য হল পূর্ণ দেড়টি ডজন থিয়েটার ॥
দু-এক তলা কিম্বা কুঁড়ে, খোলার ঘরে আঁস্তাকুড়ে,
রাজা সেজে হাত-পা নেড়ে একটিংয়ের সে কি বাহার ?
বৈঠকী গান গাইবার কথা, কহিতে চুলকাবে মাথা,
বাইরে থেকে গাইয়ে এসে কানমলা দেয় সবাকার।
পয়সার অভাব নাইকো হেথা, ঘুরে বেড়ায় চাঁদার খাতা,
রং মেখে সঙ দেখাতে, টাকা যোগায়, গৌরী সেন পোদ্দার ॥
তোড়া, মালা, থিয়েটারে, কেউ দেখে না অনাহারে,
দীন দুঃখীরা হায় হায় করে, ওঠে দরিদ্র ভাণ্ডার।
কংগ্রেসের চারটি আনা, কিম্বা ইস্কুল বাড়ীর দেনা,
কপর্দ্দক তার জোটে না—কারণ যে হয় এয়েচার।

দেশের সেবায় যাচ্ছে জেলে, তারা সব মূর্খ ছেলে,
এঁরা সব চালাক বলে মাড়ায় নাকো সে সব ধার।
দেশের উন্নতি নূতন ছাঁদে, করেন যত সোনার চাঁদে,
পরকাল হয় ঝরঝরে দুঃখিনী ভারত মাতার॥

১১১

ছড়া

এবার হাত পড়েছে পকেটে।
ও তাই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে
সিঁধেল বোম্বেটে॥
বিদেশী মাল হলো পয়মাল, বিকায় না প্রায় আর হাটে।
বিদেশী নুন, চিনি, বসন, দূর কর ঝাঁটার চোটে॥
গোরার পায়ে তেল না দিয়ে, আপন বশে খাও খেটে।
হিঁদু-মুসলমান সব মিলে কোমরটা ভাই বাঁধো এঁটে॥
দেশের মাতৃসেবক যারা, মোদের জন্যে জেল খাটে।
এবার মরণ কামড় দিয়ে সবাই
চেপে ধর বয়কটে*॥
বিদেশী নুন, চিনি, শোর-গো-হাড়ে হয় বটে।
এ সব জেনে শুনে কেনে যত গণ্ডমূর্খ বিদকুটে॥
তোদের পায়ে ধরি বিনয় করি,
দিস্ নে মুখ আর সিগ্রেটে।
এমন করে যাবে না দিন, ফিরিঙ্গীদের ফ্যান চেটে॥
এ জীবন তো ক্ষণস্থায়ী, কখন তুই উঠবি খাটে।
একটা কিছু করে যা ভাই, যাবার আগে এই চোটে॥

* বয়কট—বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন। ["বয়কট নামক জনৈক আইরিসম্যানের নাম হইতে 'বয়কট' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে"—'বঙ্গে জাগরণ ও স্বদেশের নানা কথা', উমাকান্ত হাজারী, পৃষ্ঠা ৫০]

১১২

ঘোড়দৌড়

স্ত্রীর উক্তি

যাবে যদি যাও প্রাণনাথ, ঘোড়দৌড়ে যাও।
রাঁধতে দেরি, না সহিতে পার,
না হয় দুটি পান্তা খাও॥
বাড়ী থেকে ছুটে ছুটে, মাঝের রাস্তায় ট্রামে উঠে,
বাজি ছাড়বার আগে মাঠে গিয়ে দেখা দাও।
বেচে ফেলে গয়না-গাঁটি, বাঁধা তো দিয়েছ বাটী,
(এবার) বাসন, বসন, ঘটি, বাটি, বাঁধা দিয়ে যাও॥
বলো মনে আর কি আছে, ধন ঐশ্বর্য সব গিয়েছে,
না হয় তুমি কারো কাছে
আমায় বাঁধা দাও॥

১১৩

গ্রাজুয়েট ছেলের উক্তি

যেমন দেবা তেমনি দেবী জুড়ি মিলেছি।
কলেজ থেকে পাস করা ভাই ওয়াইফ্ এনেছি॥
দেখিয়ে বাবার কোঠাবাড়ী, পেয়েছি মোটর গাড়ী,
পর্দা পার্কে হাওয়া খেয়ে পোষ্টে এসেছি॥
কারে কি বলবো দাদা, কাদার আমার আসল গাধ
পাঁঠার মতো বেচলে আমায় ছি! ছি! ছি!
কাজ কর্মে নয়তো দড়, মাথাতে আধ হাত বড়,
চেক করতে হাতে measure গজটি এনেছি॥
Society ফেরতা ইনি, আগে কি আমি জানি,
চয়েস্ করে আনলে বাবা ঘোটকী ফাকি।
....
১৪ হাজার টাকায় চাপা, ছি! ছি! ছি!॥

১১৪

কন্যাদায়

কোটী নমস্কার করি এই পাসের পায়,
পাসের দায়ে পাশ ফেরা দায়,
(এই) কালের পাসকে আন্‌লে ধরায় ?
একটা পাসের পাশে গেলে, ভিটেমাটি যায় যে জলে,
ঘুষের রসে দুটো হলে, কার বাপে তার কাছে যায় ?
মেয়েগুলো জন্মেছিল কেন যে তা' জানি না,
পশুর সেবা না হয়ে, তাদের মরণ কেন হল না ?
ভালো রকম বুঝত তখন কি ঝকমারি পণ প্রথায় ॥
করব যেমন করবে তেমন এই যদি রীতি,
মেয়ে হলে তখন চাঁদের থাকবে না যে গতি,
বাধ্য হয়ে পাসের দায়ে ভুলে সম্বন্ধ নীতি,
ননদ হবে ভাজের সতীন না পেয়ে উপায় ॥
চাকর হবে ঘরের কর্তা দিদিবাবুর জোরে,
নিত্য নূতন লক্কা জামাই ঘুরবে প্রাচীর ধারে,
(হবে) সাত ছেলে এক মেয়ের সমান,
ধন্যসুখের কন্যাদায় ॥

১১৫

গুরুমাহাত্ম্য

আমি গুরু ভবকর্ণধার।
কলির জীব তরাতে এই ভারতে উদয় কল্কি অবতার ॥
আমার কুঁড়োজালি, নামাবলী, মালা-শিখার কি বাহার,
(আমার 'কৃষ্ণ' বলতে বুক ভেসে যায়,
আমি বৈষ্ণবের শিরোমণি),
আবার কারণ, কারণ নাইক বারণ, করি সাধন পঞ্চ মকার ॥
আমি অপরূপ পরম হংস, নতুন অবতার, প্রেমাধার,

(আমি লীলার লাগি এসেছি রে, আমায় তোরা চিনলি না রে)।
যত মুক্তিকামী রামী, বামীর, সোহংস্বামী আমি যে সবার।
ঘুচাই ব্যাধি, ফাঁড়া, শনির তাড়া, করি স্বাস্থ্যরক্ষা সবাকার,
(আমি তন্ত্র-মন্ত্র কতই জানি, আমার আশীর্ব্বাদেই সর্ব্বসিদ্ধি),
আমি বন্ধ্যা নারীর দুঃখ হারী, কোলে ছেলে দিই গো তার।
কত বুড়ো-বুড়ী, ছোঁড়া-ছুঁড়ি শিষ্য আসে অনিবার,
এমন গুরু পাবে না কোথাও, গুরু ব্রহ্ম স্বয়ং আমি।,
দেখাই জ্ঞান…………অখণ্ড মণ্ডলাকার॥

কত কমল এনে চরণ পূজে, গলায় দেয় গো ফুলের হার,
('ঐ চরণে দাসী' বলে, 'গুরু দীক্ষা দাও গো' বলে),
তাদের চিবুক ধরি আশিস করি কাণে ফুঁ দি নির্ব্বিকার॥
আমার প্রেম বিলাতে পাড়ায় পাড়ায় চড়ায় তারা মোটরকার,
(আমার প্রাণের প্রিয় শিষ্য যারা, আমি কিন্তু অনাসক্ত),
শিখাই অধিকারী শিষ্যা পেলে রাসলীলা সে লীলাসার॥

১১৬

দেশের নেতা

ওগো ভারতমাতা, তোমার জন্য পণ করেছি প্রাণ,
দিব লেক্‌চার, যত দরকার গাইবো শত গান।
নিত্য প্রাতে 'সারভেন্ট' কিম্বা 'অমৃতবাজার' পড়ি,
আস্ফালন করি এবং দন্ত কড়মড়ি,
বলব, সাবাস গান্ধী, ডি ভ্যালেরা, লেনিন, কামালপাশা,
পরে গম্ভীরভাবে খেলতে বসবো তাস, দাবা, কি পাশা।
মুহুর্মুহুঃ নস্য লব, করিব চা পান,
কারণ, ভারতমাতা তোমার জন্যেই করেছি পণ প্রাণ।
তোমার জন্য আরও কত করবো স্বার্থ ত্যাগ,
তিলক ফণ্ডের চাঁদা তুলে ভরিয়ে ফেলবো 'ব্যাগ',
কংগ্রেসে জমা দিলে পরে, পাছে বাজে খরচ করে,

তুলে রাখবো যত্নে আমার বাক্সে কিম্বা ট্রাঙ্কে,
ন্যাশন্যাল ফণ্ড স্বরূপ আমার সেই ফ্যামিলী ব্যাঙ্কে।
তোমার তরে সভায় পরবো খদ্দর এবং খাদি,
গিন্নীর কাছে যদিও তাতে হবো অপরাধী,
খেপিয়ে দেবো ছোকরার পাল, করতে বেজায় হরতাল,
এই ভাবেতে জেগেছে চীন, ইজিপ্ট্ ও জাপান।
তোমার তরেও তেমনি করতে পণ করেছি প্রাণ॥

১১৭

গোষ্ঠবিহার

রাখাল বালকগণ :

উঠ উঠ ও নিপট কপট ও কালো কানাই,
গোকুল আকুল বড় ব্যাকুল হয়েছি তাই।
পরো পরো মোহন চূড়া পীতধড়া অঙ্গে,
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে, চলো নব রঙ্গে,
তরঙ্গ ভঙ্গে এস বেণু সঙ্গে, ধর ধর পাঁচালি মজাইতে যাই।
ধর হল, হল ধর, চলো চলো সত্বর,
হের ঐ দিবাকর, ক্রমেতে হতেছে ঘোর,
গোষ্ঠে আর যাইবার বুঝি হায়! বেলা নাই॥

কানাই ও বলাই :

এই আমরা এসেছি ভাই,
গোষ্ঠে যেতে তোদের সাথে, এই আমরা এসেছি ভাই,
কায়া ছেড়ে রয় না ছায়া, গোলোক ছেড়ে এসেছি ভাই।
প্রাণ ছাড়া প্রাণী রয় না কভু, ভূলোকেতে এসেছি ভাই।

কানাই :

কোথায় গোধন কানুর জীবন?

বলাই :

চলো ভাই যাই চারণ কারণ,

রাখাল বালকগণ :

যমুনার কূলে কদম্বের তলে,
হাম্বা হাম্বা রবে ঐ গাভীদলে,
ডাকে কুতুহলে, তৃণ অবহেলে,
কোথায় কানাই কোথায় বলাই।

কানাই ও বলাই :

আর কেঁদ না, আর ডেকো না,
মরমে আর বাজ হেনো না,
প্রাণে ব্যথা আর দিয়ো না,
নিজগুণে করবে ক্ষমা।

রাখাল বালকগণ :

তোদের ছেড়ে আর যাব না,
যদিও স্বর্গ পাই॥

বেনেপুকুর

১১৮

ছড়া

লীলাবতীর হবে বিয়ে আনতে যাবি জল।
ওগো সাধের 'মকর গঙ্গাজল'॥
উলু উলু শাঁখ বাজায়ে,
বরণডালা মাথায় লয়ে,
জলের ঝারি নিয়ে করে, ঝম্‌ঝমিয়ে চল্।
পাড়ার সব রাণী-পিসী,
আয় গো সবে হলুদ পিষি।
বরের নাম শূলপাণি,
কনের নাম ত্রিনয়নী,
ভোলা বুড়ো জামাই,
নিজে করে কত জনাই।

তোরা কে আনতে যাবি জল,
লীলাবতীর হবে বিয়ে
তোরা কে আনতে যাবি চল্ ॥

জনাই-বেগমপুর

১১৯

ছড়া

বলি ওহে হনুমান হইলে এত বিদ্বান্,
কেবা দিলে শিক্ষাদান, তাই বলো না –
পবন-পুত্র হনুমান সকলেই জানে,
কিশোরী তোমার পিতা প্রকাশ পুরাণে,
অঞ্জনা তোমার মাতা,
পবন তোমার জন্মদাতা,
কিশোরী বৈমাত্র পিতা শোন শ্রবণে ॥

১২০

গান

তাঁতীর নিন্দে করলি ওরে যাদুধন,
তাঁতী না থাকিলে তোর হত না বসন।
চাষা চাষা করে রে ভাই ঘৃণা কোরো না,
চাষা না থাকিলে বাবুর ভুঁড়িটি হত না ॥

১২১

গান

শাস্ত্র শাস্ত্র মিছে বলো, শাস্ত্র জান না,
মনে হয় কোনকালে শাস্ত্র দেখ না।

সিদ্ধি গুলে খেতে হয়, তবে সিদ্ধি মিঠে হয়,
সিদ্ধি সিদ্ধি বললে মুখে, নেশা হয় না ॥

১২২

গান

ধন্য জনাই গ্রাম—চিরানন্দ ধাম
তোমারই সুনাম—গাহি অবিরাম।
মনোহরা মিষ্টি—মিষ্টান্ন সেরা,
আর রসকরা—পূর্ণ রসে ভরা।
জনাইয়ের হইল—কুম্ভকারের খোলা,
(কত) উপকারে আসে, যায় না মুখে বলা।
তব গৃহে গৃহে—বিরাজ করে কমলা,
ধন্য জনাই গ্রাম—চিরানন্দ ধাম,
ভক্তি করি লও গো প্রণাম ॥

১২৩

ছড়া

চৈত্র মাসের সঙ লাগলো রমা-রম,
দেশের ইজ্জত আজি পণ—
খিস্তি-খেউড়, গালি-গালাজ,
দাও বিসর্জ্জন।
সাদা প্রাণে খোলা কথা,
মিষ্টি কথায় মালা গাঁথা,
ভুলিয়ে দিতে সকল ব্যথা,
সেজেছি আজ সঙ।
সরল মনের স্নিগ্ধ হাসি,
হেসেই বলো ভালোবাসি,
সারা গাঁয়ে বাজলো বাঁশি,
সেই তো মজার রং ॥

১২৪

গান

দুঃখের কথা কইবো কারে,
আমার আফসোসে প্রাণ আঁতকে ওঠে,
মুখে কথা না সরে।
নব্য যুগে সভ্য হলো, বাপ-দাদারে ভুলে গেল,
হাসতে গিয়ে ভেংচে বসে, পদ্মলোচন ট্যারারে।
গ্রামের দুঃখ বুঝত যারা, গাঁ ছেড়ে চলেছে তারা,
ছুঁচোর নৃত্য দিন-দুপুরে, কিচির-মিচির গান ধরে।
জোরু চুরি, গরু চুরি, টাকা, গয়না, বিত্ত চুরি,
জুয়াচুরি, পুকুরচুরি, পগার চুরির পাল্লা রে॥

১২৫

গান

ভাই ভাই মোরা এই দুটি গ্রামেতে,
যাতায়াত করি প্রতি বৎসরেতে,
রহে যেন ইহা ঠিক এই মতে,
দুয়ের মধ্যেতে স্নেহের বন্ধন।
বন্ধ ছিল ইহা কতিপয় দিন,
তাহে কেঁদেছিল অনেকেরি প্রাণ,
তার মধ্য হতে মিলি দু-চার জন,
করিলা স্থাপন এ আনন্দ পুনঃ।
প্রবোধকুমার, গোপাল, যতীন,
গঙ্গাধর, আর মদনমোহন,
জানি এই সব ভদ্রজনগণ,
করেন পরিশ্রম সঙ্ঘ-এর কারণ।
অনুরোধ করি আরও ভদ্রগণে,
আসুন সকলে আনন্দিত মনে,

বড় করে তুলি কায়মনোপ্রাণে,
এই ক্ষুদ্র সঙ-এ করিয়া যতন ॥

১২৬

গান

ঘরে কি নাইকো নবনী,
কেন অমন করে পরের ঘরে
চুরি করিস নীলমণি ?
তোর খিদে যদি পায়,
মা বলে ডাকবে আমায়,
সহিবে কেন পরে,
কত কথা বলে যায় ॥

১২৭

গান

মিছে তোরা লোক হাসালি,
খাঁটি সুরে দিলি কালি।
গানের তোরা গ জানিস্ না,
তানসেন বলে দিলি গালি ॥

১২৮

গান

গাইতে গেলি জনারেতে, গেয়ে এলি কাওয়াল তাতে,
চুটকি গানের সুরে মেতে, খাঁটি সুর ভুলে গেলি,
সঙ-এর সুরে জর্জরিত, অন্য সুর নাহি আয়ত্ত,
ঘোমটা গান গেয়ে তোরা নিজেরা কত আনন্দিত।
প্রতি ঘরে গানের চর্চা, শেখার গেলি বাড়তে ঝোঁক,
তোদের এত বুদ্ধি কাঁচা, ভুলেও তোরা না ভাবলি ॥

১২৯

গান

ভদ্র সাজার মাপকাঠিতে—ধুতি, চাদর, সার্ট,
মিষ্টি কথায় মন ভোলানো মিথ্যা রাজ্যপাট।
মনের ভিতর গরব যখন,
গুমরে ওঠে বেজায় তখন,
লেজ নেড়ে সে চতুষ্পদে দেখায়
ভদ্র আনার ঠাট॥
যদি ধার করা হয় দুটো টাকা,
যায় না তাহার গরম রাখা,
চোখ রাঙায়ে দেখায় তাদের
নবাবীয়ানার পাট।
কোন যুগে সে খেয়েছে ঘি,
এখন তার গন্ধ নাই কি!
ও সে মান্য করে দেয় না সেলাম
উল্টে মারে চাট॥

১৩০

ছড়া

উপকারী তোমার মতো বলো কেবা আছে আর,
ভোট তোমায় নিশ্চয়ই দেব কোন চিন্তা নাই তোমার।
এত বড় পরিকল্পনা, ভাবতে পারে বলো কয় জনা,
হয় না যে তোমার তুলনা, তোমার জুড়ি মেলা ভার॥
লেজটি বজায় থাকে যাতে, চেষ্টা করো সাধ্য মতে,
কাঁদতে হবে দিনে-রাতে, বলবে না কেউ মেম্বার।
ধন্য ব্রিটিশ বলিহারী করেছ কি চেয়ার তৈরি,
বসে যে জন তায় উপরি মনুষ্যত্ব থাকে না তার॥

১৩১

থিয়েটারের শ্রাদ্ধ

ভেঙি : আমি একজন মস্ত বড় 'এক্টর',
বিদেশ জোড়া নামটি আমার
তোমরা জানো না মোর 'ফ্যাক্টর'।
থিয়েটারে চাকর সাজি,
যাত্রায় সাজি মন্ত্রী,
নামলে পরেই 'কেলাপ' পাই,
হাতের মুঠোয় যে সব যন্ত্রী।
অনেক ভেবে খুললাম শেষে
হাফ্-আখড়াই দল,
দেশের ছেলের ভাগ্যে শেষে
জুটলো মাকাল ফল।
লখনউ থেকে 'পিলেয়ার' এসে
করলে যাত্রা 'কুলপি বরফ',
চাকর আমি সেজেই মরলাম,
বলতে পারি করে হলফ।
অনেক দিনের সাধ যে আমার,
সাজতে হবে রাজা,
বরাত ঠুকে নামলাম শেষে
খেয়ে দু-টান গাঁজা।
বরাত আমার বড়ই মন্দ,
গাইলাম গান ভালো,
প্যালা দেবার লোক জোটে না,
সবই কি জাহান্নমে গেল ?

মজাদার : দুঃখ কোরো না বন্ধু
তব গুণ মোরা জানি,
জোঁক সম পড়িয়া আছি,
খেয়ে বর্ষার পানি।

করলে যে পিলে,
ঘুঘুড়িতে গিয়ে—
তাহার তুলনা নাই,
এ-গ্রামে কেবল স্থান নাই তব,
মূর্খেরা জানে কই ?
ছুঁচোর মাতনে পতন ঘটালে,
মুর্গির ডিমে এঁচড় বানালে,
পবিত্রতায় মেডেল যে নিলে—
তাহার তুলনা নাই.
তাহার তুলনা নাই।

তেবি : বন্ধু, তুমি যে রতন,
তাই রতনে চিনেছ,
দেশ চিনেছ কি ?
থিয়েটার ছেড়ে গাইলাম গান,
তবুও যে বলে ছি –
ভেঁপু, ঢোল, আর সারঙ্গী লয়ে
বাহির হলাম পথে,
বাহবা যা দিল বাহির কবিকে,
কাঁঠাল ভাঙ্গিল মাথে।
তাও বলি কি, চেংড়া ছোঁড়ারা,
করিল বেজায় সঙ,
তারই গুঁতোয় বেশ বলে সবে,
মোরা সব গর্ত্তের ব্যাঙ।
শুন মজাদার, থাব দানাদার,
আমার পালা যে শেষ,
দেশের লোক তো চিনলো না মোরে,
কভু বলিল না বেশ।

মজাদার : সত্য বলেছ বন্ধু আমার,
ছাড়িব না তব করি অঙ্গীকার,

তব পদরজঃ শিরে মাখি লয়ে
তব প্রিয় নাম দিব যে ছড়ায়ে।
আশীর্ব্বাদ বন্ধু আমায়,
যেন চরণের রেণু পাই অনিবার।
চিৎকার আর হুঙ্কার রবে
জুতাটি ছুঁড়িয়া গালি দিই যবে,
এ হেন সময়ে গলাটি শুখালে
দিয়ো চরণামৃত ঢালি।
আমি সাজাব বন্ধু, সাজাব তোমারে
ফুল বাগানের মালী॥

খিদিরপুর (মনসাতলা-নারকেল বাগান)

১৩২

রাম পাঁঠা

সুখ দুঃখে কাটালেম দিন
দীনের দীনবন্ধু,
মানভঞ্জন করছি আমি
দেখুন ভাই বন্ধু।
বনেদী ঘরের ছেলে আমি
পড়েছি বিষম ফেরে,
জ্বালিয়ে মারলে আমায় মশাই
গয়না গয়না করে।
ঘর ছেড়েছি, সব ছেড়েছি
শুধু প্রেমের দায়,
টাকা দিয়েছি, মন দিয়েছি
ওর ছুটি পায়।

তার বদলে মিলছে আমার
শুধু লাথি ঝাঁটা,
এখন আমি বুঝতে পেলাম
আমি রাম পাঁঠা॥

১৩৩

ছড়া

আমরা নব্য যুগের সভ্য, সমাজের সাধু ভব্য,
আমরা করি যা কিছু গোপা, স্বদেশী মোদের লভ্য।
সভাতে যাই খদ্দর ঢাকি, চট সম ধুতি পরে,
দু-চোখে বয় সাঁতার পানি, ভারতমাতার তরে।
মঞ্চে মঞ্চে হাঁকিয়া কহি, করো না মদ্য পান,
ঘরে ঢুকে করি ডাকাডাকি, একটা বোতল আন।
চিনলে না মোদের, মোরা আমড়া কাঠের ঢেঁকি,
কলিকাতায় নৃত্য করে, রঙ্গিলা ন্যাকা-নেকী॥

১৩৪

ছড়া

আমি নতুন অবতার, আমি নতুন অবতার,
মেসের মাসীর হাতে পড়ে হয়েছি নচ্ছার।
রিষ্টওয়াচ আর ছড়ি হাতে, টেরির কি বাহার,
দেশের নেতা, দশের মাথা, স্বরাজ করেছি সার।
আর সবাই মিলে তবিল ভেঙ্গে হলো কেলেঙ্কার,
আমি নতুন অবতার, আমি নতুন অবতার॥
আমায় তোমরা টাকা দাও, বলছি বার বার।
সুযোগ বুঝে হবো আমি সত্যি পগার পার॥

১৩৫

গান

মান ভাঙ্গো, মান ভাঙ্গো ওগো মানিনী,
আমি কিছুই জানিনি।
অফিস থেকে আসছি আমি,
কথা কও ওগো ধনী,
কথা কও, মুখ তুলে চাও,
সহে নাকো আর মুখ ঘুরনি॥

খিদিরপুর (ভূকৈলাস)

১৩৬

নিবৃত্তি

(১)

উথলে উঠ্‌ল স্বদেশ-ভক্তি— 'বন্দেমাতরম্'
বলেই আমি করে ফেল্লাম প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
ছোঁব না আর বিলাতী চিজ—যতদূর যা' পারি—
সেইটাও শেষ করে দিলাম—বড়ই তাড়াতাড়ি।

(২)

এক দমেতে ত্যাগ কল্লেম মুখের বার্ডসাই ;
(তোর বিরহে, প্রাণটা বটে কচ্ছে আইঢাই।)
দেশের লোকে ধরলে সামনে এনে দেশী বিড়ি,
ধুমপান কি ছাড়া যায়?—পেলাম স্বর্গের সিঁড়ি।

(৩)

বিশেষ মায়ের স্নেহের সে দান— দিলাম সুখে টান,
হোক্‌গে তিক্ত— বাঁচে যদি স্বদেশ-ভক্ত প্রাণ।
মুখে আগুন সারই হ'ল— প্রাণ গেল কি করি,
এমন সময় উঠ্‌ল দেশে 'সিগার' মরি মরি।

(৪)

টান্‌লেম এনে দেশী সিগার—বেশ বিদেশী গন্ধ ;
বিশ্লেষণে কাজ কি ? টানচি ক'রে চক্ষু বন্ধ।
ভাবছ কি ভাই ? বাক্সে দেখ এই স্বদেশী ছাপ ;
ত্যাগের চেয়ে টানাই ভালো—বাঁচা গেল বাপ।

(৫)

প্রতিজ্ঞাটা সহজ বটে—পালনের নাই শক্তি ,
বিলাসিতায় মগ্ন থেকে দেখাই স্বদেশ-ভক্তি।
'যতদূর পারি' এই একটা কথার জোরে
চলছে সবই—ভেদটা কিছুই নাইকো পূর্ব্ব-পরে।

(৬)

তারি জোরে হুইস্কি ঢালি, চালাই মটরকার—
দেশের টাকা যাচ্চে উড়ে ?—অভাব কারখানার।
কুহক-বলে লাগিয়ে চমক, বাহির ক'রে পৈতে—
বক্তৃতা দিই শাস্ত্র-মতে—নৈলে কি আর সৈতে ?

(৭)

ভিক্ষুকেরও ভিক্ষা নিয়ে, ভরাই টাকার থলে ;
দেশের কাজ এ, মায়ের কাজ যে—উচ্চ গলায় ব'লে।
সোজা বাঙ্গালায় লেকচার দিচ্ছি, সাহেবী বেশ খুলে ;
কালী-গঙ্গায় মান্‌চি এখন, সাহেব-দেবতা ভুলে।

(৮)

অসুর-মায়ায় পড়র হলে, ধরি আশুগতি,
ব্রিটিশ-দ্রব্য বয়কট ক'রে—সেজেছি আজ সতী।
স্বার্থপর, তাই প্রবৃত্তির দাস—নিবৃত্তিটা ভান ;
মূলে কিন্তু—গোরার প্রতি গাঢ় অভিমান।

১৩৭

বর্ষ-বর্ত্তন

(১)

সন তের শ' উনত্রিশ সাল, কাল-সাগরে-ডোবে,
পেলাম আমরা হাতে কি যে, হিসাব ক'রে দেখি তবে।
বিশ্ব-বিদ্যার সরস্বতী,—দিলেন এতই বিদ্যা-ভার,
মেধা, বিষম ধাঁধায় প'ড়ে, চশমা চোখে অস্থিসার।

(২)

নীতির এখন পথে, ঘাটে, দেখছি নিত্য অপমান ;
জাল-জচ্চুরি-জুয়ার স্রোতে ভাস্‌ছেন সাধু মতিমান্‌।
প্রতিভার সে সিংহ মূর্ত্তি—কোথায় তেজের পরিচয় ?
ফিরছে মাথায় ফেরুর ফন্দী, ভুলে গেছে আত্মজয়।

(৩)

দেখছি বটে 'স্যার আশুতোষ,' রাজশার্দ্দূল বাঙ্গালার,
দেখালেন, ত্যাগ-পত্রের তেজে, শক্তি-আত্মমর্য্যাদার।
হিন্দুহিন্দুর স্বদেশ-প্রীতির খুলে গেল আবরণ ;
পাস হ'ল না তাই তো আইন, গোকুল-বিনাশ-নিবারণ।

(৪)

অসহযোগ করবে কি আর ? পক্ষাঘাতে পঙ্গু সব ;
গৌরের বিল—সহযোগের তুললে ধ্বজা অভিনব।
নিমকহারাম্‌ নইকো মোরা, গরীবের যে সম্বল নুন ;
মান্‌লে না তা' লাটের কলম—সদস্যদের মুখটি চুন।

(৫)

ধনীর গরম যাচ্ছে কেটে, শ্রমীর এখন পৌষ মাস ;
মাঝে আছেন মধ্যবিত্ত—শিয়রে তাঁর সর্ব্বনাশ।
দেশের বুকে রেলের বাঁধন, সুখের বাহার অন্নাহারে ;
বাড়ছে মারী—বন্যার স্রোতে বঙ্গ ভাসে হাহাকারে।

(৬)

দেখছি তা'তেই ফল্‌ছে সুফল, ব্যথায় ব্যথী দেশের ছেলে,
আতুর সেবায় উঠ্‌ছে জেগে, আচার-জীর্ণ ধর্ম্ম ফেলে।

হাল ধরেছেন 'স্যার প্রফুল্ল'—প্রফুল্ল তাই ছাত্রগণ ;
ত্যাগীর শক্তি নিত্যজয়ী—'দেশবন্ধু' তার নিদর্শন।

(৭)

চব্‌কা ঘোরে নিত্য বটে—চড়কের পাক্ বরষ-শেষে,
দে পাক্—দে পাক্, হাসাও সবায়, হেসেও নাও ভুলে ক্লেশ।
ভালো-মন্দ কাজ কি বিচার ? কাজ ক'রে যাও হাসিমুখে,
স্বাগত হে নববর্ষ—হর্ষভরা আশা বুকে ॥

১৩৮

মাতালের গান

অনুরক্ত আমরা ভক্ত, তোমায় সেবা করি ;
কৃপা করি' কৃপা কর, দেবী, সুরেশ্বরী।
ভাস্‌ব সবাই সুখের কূলে, সকল দুঃখ জ্বালা ভুলে,
ভক্তদলে লও গো তুলে, ভ'রে পাপের তরী।
চষক ভ'রে করব পান, ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ,
গাইব তোমার যশোগান, আকাশ পাতাল ভরি'।
রেখ ক'রে চিরদাস, নানান্ রোগে বার মাস,
জীবন যত পাবে হ্রাস, রাখবে তুমি ধরি।
থাকৃব তোমার ঝোঁকে সুখে, তোমার স্তুতি ছুটবে মুখে,
পড়ব লুটে ধরার বুকে—দিয়ে গড়াগড়ি ;
যাক্‌গে পুত্র-পরিবার—অনাহারে মরি' ॥

মেদিনীপুর (অমৃতবেড়িয়া গ্রাম)

১৩৯

গান

মা শীতলা, মা শীতলা,
বিরাটের হাটে বেচায় মটর, ছোলা।

বিরাটের ছেলের খেয়ে হ'ল জ্বর,
ছেলেরা যাচ্ছে যমের ঘর।
বিরাট করলো অন্ধকার,
সারারাজ্য হাহাকার।
জরাপাত্র বলে দেখ মা শীতলা,
মা শীতলা, মা শীতলা॥

মেদিনীপুর (তমলুক)

১৪০

ছড়া

হায় মরি, হায় মরি,
শোনেনি চোদ্দপুরুষ যা,
এবার দেখতে পাবে তা,
একটি বোনের বাবার হবে
দশটি জামাতা।
বিধবার সিঁথায় সিন্দুর,
পরনে ঢাকাই শাড়ী,
হায় মরি, ওগো হায় মরি,
বাহার দেখে হায় মরি।
নাত্‌জামাই, আমি কারে দেখিয়ে দেব,
ঘোমটা করে আমার এই নেংটি গো,
নিজের বউয়ের নোয়া খোয়াতে,
খাব আফিম-বড়ি,
হায় মরি, ওগো হায় মরি॥

বাসুবাটী

১৪১

ছড়া

…   …   .

চাষের গরু করলাম
এক জোড়া,
একটা বড় থরথরা,
আর একটা বোকড়া,
ক্ষেতের গোড়া দিলে তাড়া
পায়ে না ঘুরিতে,
গেছলাম আমি মাঠে
..   …   …   .
হেমন্ত জমি চষিতে ॥

১৪২

ছড়া

দুটি গরু আনছিলাম ধরে,
একটি তার দড়ি ফসকে
পালিয়েছে ঘরে।
পাছে রাস্তার মধ্যে লড়াই করে,
এই ভাবনা ছিল মনেতে,
গেছলাম মাঠে জমি চষিতে ॥

১৪৩

ছড়া

…   …   …   …
…   …   …

বাবার সঙ্গে করে রাগারাগি,
দেশ ছেড়ে বিদেশে গেলাম হয়ে বিবাগী।
আপন মনে কাঁদাকাটি সদাই চিন্তা মনেতে,
হায় বিদেশেতে গেছলাম চাকরি করিতে।

১৪৪

ছড়া

সেই জমিতে ছিল জলভাসা,
আল কাটিয়ে বসিয়ে ঘুনি,
মাছ ধরিবার আশা।
যত লাফিয়ে পালায় পুঁটি-ল্যাঠা,
ঢোকে না কেউ ঘুনিতে,
সেই জমিতে ছিল জলভাসা॥

১৪৫

গান

... ...

গরমেন্ট করলো আইন,
আগু পিছু দাও না লাইন।
ভাই নজর রেখ দোকান পানে,
দোকানী সব জাদু জানে।
নেইকো কাপড় বলবে হেসে,
কাঁদাকাটি করবি ভাই দাঁড়িয়ে শেষে।
গরমেন্ট করলো আইন,
আগু পিছু দাও না লাইন॥

১৪৬

ফেরিওয়ালার গান

(১)

... ...

করেছি এই দিশি ঘড়ি,
দেশ বিদেশে করি ফেরি,
দরকার হয়তো কিনে নিন্,
দেওয়ালেতে ঝুলিয়ে দিন,
টিক্ টিক্ তা' দিন দিন,

চলবে ঘড়ি ঘোড়ার মতো,
থামবে না কোনদিন।

(২)

... ...

আপনাদের এ পাড়াতে এসেছি ভাই কয়েকজন,
ডাক দিয়ে হায় করবো কি ফেরি,
আপনারা বলুন এখন।
আমার এই কার-ফিতে,
চিরুনি নাও কাটবে সিঁথে।
আয়না নাও দিচ্ছি যেচে,
ঘরে গিয়ে দেখবে বদন,
আপনাদের এ পাড়াতে
এসেছি ভাই কয়েক জন।

(৩)

ডাক দিয়ে হায় করবো কি ফেরি,
আপনারা বলুন এখন,
আমার এ ব্যবসা কেবল,
শুন বলি ও ভাই সকল,
নকল নয় হয়কো আসল,
দেশের দিশি দাঁতের মাজন।

(৪)

আমি এক বড় মিস্ত্রী,
ভাঙ্গা ফুটো ঝুড়ি সারি,
গাড়ি-ঘোড়া হাঁড়ি সারি,
নাম আমার মথুরমোহন,
এ পাড়াতে এসেছি ক'জন,
ডাক দিয়ে হায় করবো ফেরি,
আপনারা কি বলুন এখন॥

১৪৭

গান

(১)

স্ত্রীর গান :

... ...

উঠেছি কোন সকালা, ধরিয়েছি খুলি-খোলা,
তায় আবার কাঠের জ্বালা, করেছি কুমড়ো চচ্চড়ি।
খাও না ওগো মূড়ি, তোমার চরণে গড় করি॥
তোমরা সব আসছো চোষে,
আমি কি আর ছিলাম বসে ?
আমার এই ভাগ্য দোষে,
দু-বেলায় ধরতে হয় হাঁড়ি।
আমার প্রাণ তোমার তরে,
সদাই যেন ধড়ফড় করে।
সেইজন্য আছি ঘরে,
যাই না কভু বাপের বাড়ী॥

(২)

দেবরের গান :

বউদিদি, যেও না বাপের ঘর
তোমার চরণে করি গড়।

... ...

পথে ঘাটে শিয়াল-কুকুর
যেন কেঁদে বেড়াবে ;
তুমি বাপের ঘর কেন যাবে।
গাই দোয়াবার সময় হলে,
কেমন করে বলে দেবে,
তুমি কারে বলবে বাছুর ধর,
বউদিদি, যেও না বাপের ঘর॥

রাধাপুর গ্রাম (হাওড়া)*

১৪৮

গান

মন-দুঃখে মরি দীনবন্ধু হরি,
পড়ে গেছি ঘোর বিপদে, রক্ষা কর হে মুরারী।
যত দেখ দেশের ছেলে,
কোঁচা দুলিয়ে রাস্তায় চলে,
নাকের ওপর চশমা তুলে,
টানছে মুখে সিগারেট-বিড়ি॥
ডাল-কলাইয়ে লাগলো আগুন,
মাছের দর হলো দ্বিগুণ,
পয়সায় হলো একটি বেগুন,
কিসে জীবন রক্ষা করি।
ঘরে গিন্নীর কথা শুনে,
প্রাণে বুঝি আর বাঁচিনে,
বলে আমায় দাও না কিনে,
শীঘ্র ক'রে ঝরনা শাড়ী।
সায়া-ব্লাউজ তার সঙ্গে চাই,
নইলে ঘরে আর রব নাই,
তোর মুখেতে দিয়ে ছাই,
চলে যাব ছেড়ে বাড়ী॥

১৪৯

ছড়া

গৌর ঠক্ ঠক্, গৌর ঠক্ ঠক্ মালা ঘুরিয়েছি,
নামের ঝোলাকে ঠক্-ঠকিয়েছি।
দিনকে রাত, রাতকে দিন, বিরাম নাহি দিয়েছি,

* রাধাপুর গ্রামের গান ও ছড়া ডক্টর অমূল্যকুমার বাগ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বড়ই মজা কাঁকড়ার ঐ দাঁড়ে,
জিভ দিয়ে লাল বেয়ে পড়ে, রসনা বাড়ে,
(আবার) কাঁকড়ার ঘিয়ে বড় মিঠে,
ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছি।
আমার এই সাধনার চোটে, দশ বিশ গণ্ডা
মুরগি আণ্ডা পেটে পুরেছি,
(আবার) সেবাদাসীর শ্রীপাদপদ্মে মনপ্রাণ সঁপেছি ॥

১৫০

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী

বৈষ্ণবী— ছি ছি আর ভালো লাগে না আমার
তিলক মালাতে।
বৈষ্ণব— আমি মন সঁপেছি, প্রাণ সঁপেছি,
তোমার পায়েতে।
বৈষ্ণবী— শুন বলি বৈরাগীধারী, আমায় দিতে হবে ঝরনা শাড়ী।
না হলে যাব বাপের বাড়ী, পরশু দিনেতে।
বৈষ্ণব— বৈষ্ণবী তুই বল্লি কি রে, আমি কেমন করে ভুলবো তোরে,
মন যাবে না ঠাকুরঘরে ঠাকুর পুজোতে।
বৈষ্ণবী— সরে যা আঁটকুড়ীর বেটা, ঠিক যেন মা কালীর পাঁঠা,
মারবো এবার মুড়ো ঝাঁটা, উঠিতে বসিতে।
বৈষ্ণব— তুমি আমার তিলক মালা, তুমি আমার নামের ঝোলা,
তুমি আমার ভোগের থালা, প্রসাদ খাই তাতে।
বৈষ্ণবী— দূর হয়ে যা পোড়ার মুখো, ঠিক যেন সেই মড়ার হুঁকো,
গায়ের গন্ধে ভূত পালিয়ে যায়, পারি না টিকৃতে।
বৈষ্ণব— বৈষ্ণবী মোর এতই ভালো, রূপে যেন জগৎ আলো,
গায়ের ওপর ঠ্যাং তুলে দেয়, দেয় না মোরে ঘুমাতে।
বৈষ্ণবী— গুণের কথা ও মুখপোড়া, বলবো এবার লক্ষীছাড়া,
খেয়েছিলি কাঁকড়া পোড়া, জল দেওয়া ভাতে।
বৈষ্ণব— ও বৈষ্ণবী তুই বল্লি কি রে, আমি মুখ দেখাব কেমন করে,

মরবো গিয়ে দিয়ে গলায় দড়ি
ঐ বেগুন গাছেতে।

বৈষ্ণবী— তোর পায়ে ধরি, আমি করেছি বিষম ঝকমারি,
কাটবো তিলক দু-বেলা তোর পায়ের ধুলোতে।

বৈষ্ণব— এবার বল্লে আমার কথা, চলে যাব ইচ্ছা যেথা,
রাম-নারায়ণ সাক্ষী হেথা, হল আজ হতে॥

১৫১

টাকার গান

টাকা তোমার মান্য ত্রিসংসারে,

... ...

কলিকাতায় তোমার জন্ম হয় শুনি,
কত কি দেশ-বিদেশ হতে আমদানি।
আধুলি, সিকি, দুআনি আর আনি,
এই সব সঙ্গিনী তোমার সঙ্গে ফিরে।

রূপে গুণে তোমার নাহিকো তুলনা,
মহিমা তোমার সবার আছে জানা,
ষ্টীমার, রেলগাড়ী হতেছে চালনা,
যত কলকারখানা চলে তোমার জোরে।

তোমার জোরে লোকে তোলে পাকাবাড়ী,
তোমার জোরে লোকে চালায় মোটরগাড়ী,
ভালো তো লাগে না গুড় গরম মুড়ি,
থাকো যার বাড়ী সপরিবারে।

ব্যাপারী চাকুরে যদি টাকা পায়,
ফিরায়ে বদন পথে চলে যায়।
গরীব দুঃখী জনে করে হায় হায়,
গড়াগড়ি খায় তাদের পায়ে ধরে।

সদাই করে যারা টাকা নাড়ানাড়ি,
কানে কালা তারা, মোটা তাদের ভুঁড়ি,
অতিথি ভিখারী গেলে তাদের বাড়ী,
বলে তাড়াতাড়ি যা বেটা যা সরে।

কর্ত্তার বাক্সে কিছু টাকা থাকে যদি,
পিছু পিছু ঘুরে গিন্নী নিরবধি,
মাঝে মাঝে গিন্নীর কি যে হলো ব্যাধি,
শুইলে ফুটে গদি, খেতে নাহি পারে।

গিন্নীর কাছে টাকা থাকিলে বিশটি,
যারে তারে বলে আঁটকুড়ীর বেটী, ...
কোমরে ঝুলায়ে পাঁচটি চাবিকাঠি,
করে ছুটাছুটি খিড়কি সদরে।

রোজকার করে আনে যদি ছেলে,
খেতে শুতে তারে কত আদর করে,
বৌ ডেকে নিয়ে কপাটের আড়ালে,
জামা খুলে দিয়ে পকেটে দেয় হাত পুরে।

বৌ তখন বলে তাহার পাশে বসে,
আড়চোখে চেয়ে মুচকি হেসে,
বাপের বাড়ী যাব আমি এই মাসে,
গোটা দশেক টাকা দিতে হবে মোরে।

কথা শুনে বলে বৌকে তাড়াতাড়ি,
তুমি গেলে বৌ তোমার বাপের বাড়ী,
বাবা আর মা দুই বুড়োবুড়ী,
সংসার আমার দিবে ছারখারে।

গোটা পাঁচেক টাকা বৌ যদি পায়,
বিছানায় শুয়ে বৌ ডিগবাজি খায়,

হাত নেড়ে সে যে পথে চলে যায়,
ধান ভানতে হলে যাই রে বাবা রে।

ষষ্ঠীর সময় জামাই শ্বশুরবাড়ী গেলে,
জামাইবাবুর কাছে টাকা না থাকিলে,
জলখাবার না মিলে, শাশুড়ী ভাত দিলে,
পুঁই-থাড়া চচ্চড়ি শেষকালে দেয় তারে।

শ্বশুর বলে জামাই কখন বাড়ী যাবে,
শালা-শালী কেহ কথা না বলিবে,
লজ্জায় জামাই ঘরে পালাইবে,
চুপে চাপে যাবে থালের ধার ধরে।

এ সংসারে কারো টাকা যদি থাকে,
আত্মীয় স্বজন ভালোবাসে তারে,
সকল কথা তার মাথায় করে রাখে,
দেখা হলে ডাকে কতই আদরে।

শুভ্র উজ্জ্বল টাকা দেখিতে হয় গোল,
যেখানে টাকা সেইখানে গোল,
যার নাই টাকা নাই তার গণ্ডগোল,
বলে হরিবোল, দিন দিনান্তরে।

কহে রামনারায়ণ, ওহে নারায়ণ
টাকা টাকা করে নাহি যায় জী
ও রাঙ্গা চরণে এই নিবেদন,
মরণ হয় যেন তোমার নাম ক

নিশ্চিন্তপুর (২৪ পরগনা)

১৫২

রাই কানাই-এর বিবাদ*

কানাই—কে গো তুমি একাকিনী এমন সন্ধ্যাকালে,
তুমি যাচ্ছো একা জলে, ও সুন্দরী লো,
কে তোমারে একাকিনী পাঠাইলো জলে।

(শুনিয়া শ্রীমতী তখন বলেন ধীরে ধীরে)

রাই— কোন পথের মাঝারে, ও পথিক গো,
কে বা তুমি, কোথায় বাড়ী, বলো না শীঘ্র করে।

কানাই—ব্রজকুলে বাড়ী আমার, থাকি নন্দের ঘরে,
জন্ম দৈবকীউদরে, ও সুন্দরী লো,
বাসুদেব পিতা মোর জানে ত্রিসংসারে॥

রাই— তবে তোমায় বলে কেন নন্দের নন্দন,
বলো তাহার কারণ, ও পথিক লো,
মাতা তব যশোমতী, বলো কি কারণ।

কানাই—করলে প্রতিপালন, সেই সে কারণ,
সেই কারণ জানে সকলেতে, আমি তাই তো ওদের ছেলে,
ও সুন্দরী লো, বনমালী নাম মোর, সকলেতে বলে॥

রাই— ব্রজকুলে বধূ আমি, আয়ান-বনিতা,
আমি বলছি সত্য কথা, বনমালি হে,
শ্রীমতী আমার নাম বৃষভানু-সুতা॥

১৫৩

গান

বলো শিব বলরাম,
হরগৌরী শিবের নাম,

*১৫২ সংখ্যক গানটি শ্রীমতী কমলা মাইতির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শিব যায় রঙ্গে,
প্রজাপতি সঙ্গে।
শিব যায় শিবানী যায়,
আমার ঠাকুর ঐ যায়,
ঐ যায় রে ঐ যায়,
হরি বলে নেচে যায়।
ফুল ফুটেছে রাঙ্গা পায়,
ফুল ফুল কাঞ্চন ফুল,
শিবের ঘর কতদূর,
কাঞ্চন ফুল তুলিব,
শিব পুজো করিব।
কাশী বিশ্বনাথ মুনি মহাদেব,
হর হর বিশ্বেশ্বর ব্যোম্ মহাদেব।
তারকেশ্বরের চরণে সেবা রেখে,
বিশ্বনাথের চরণে সেবা রেখে,
দক্ষিণেশ্বরের চরণে সেবা রেখে,
মহাদেব মহাদেব ॥*

১৫৪

শিব মেনকার ঝগড়া

শিব— সাপের এক পৈতা গলায়,
মেনকা কয় লাজে মরে যাই।
মেনকা— তুই নাকি হবি রে বাপ,
গুণের জামাই ॥
শিব— কে আছ মা গিরিপুরে, ভিক্ষা দাও আমারে।
মেনকা— কি সে ভিক্ষা চাও গো বাছা,
বলো না সত্য করে ॥

* শ্রীমতী পুষ্পরাণী মল্লিক ১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যক গান দুটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

শিব— আমারে বিদায় কর মা দিয়ে উমাশশী।
মেনকা— আমার উমার কি কাজ হয়েছে সন্ন্যাসী॥
শিব— সাপের পৈতা গলায় লয়েছি,
কর্ণে ধুতুরার ফুল।
মেনকা— তাই অঙ্গ ঢাকা ভস্ম মাখা,
আঁখি ঢুল ঢুল॥
শিব— খাচ্ছি গাঁজা, নিচ্ছি মজা, নন্দী দিচ্ছে সেজে।
মেনকা— তাই বুঝি রে দক্ষরাজার হাড় ভেঙ্গেছে খুঁজে॥
শিব— দক্ষরাজার কথা মানো, আর আমায় বল না।
মেনকা— হাতী-ঘোষ থাকতে বাহন ষাঁড় কেন বল না॥

ঢাকা (ইসলামপুর)

১৫৫

গান

চলে যায় দিন ভেবে দেখ,
... ...
মোরা যদি স্বরাজ পাই,
প্রাণ দিতে ক্ষতি কি ভাই।
স্বরাজ সাধন কাম,
অগতির গতি নাম,
দেশের জন্য করো উপায়,
সাধের বেড়ি পরবো পায়।
প্রাণ দিতে ক্ষতি কি ভাই,
মোরা যদি স্বরাজ পাই।
সোনার বাংলা,
ঘেরছে জংলা,
অমৃত ফল বাঁদরে খায়,
এমন দিন আর পাব কোথায়।

এবার দেশে হবে সুকাল,
ধর ধর চাপিয়ে নৌকার হাল।
পার হইতে যদি হয় সকাল,
এবার ভাব অন্তরে অন্তিম কাল,
আকাল ছাড়িয়ে হইবে না সুকাল,
হাল ছেড়ে হয়ো না বে-হাল।

এবার দেশে হবে সুকাল,
ধর ধর চাপিয়ে নৌকার হাল,
ঘুম ভাঙ্গ ভারতবাসী,
মিলিয়া নয়ন মেলে দেখ চাহিয়া,
দেহ হতে প্রাণধন নিয়ে যায় কাড়িয়া।
হিন্দু-মুসলমান জাগ রে সমান,
প্রাণে প্রাণে বেঁধে রাখ কষিয়া,
ঘুম ভাঙ্গ দেশবাসী মিলিয়া,
দেখ দেশের ধন কাহারা যাইতেছে লুটিয়া।
স্বরাজের নিশান উড়ায়ে,
স্বরাজের বিজয় গুণ গাও রে মাতিয়া,
গাও বন্দেমাতরম্,
জয় জয় জয় বলো রে মাতিয়া।
প্রেম চরকা সঙ্গে লইয়া,
প্রাণে প্রাণ বেঁধে এক হইয়া,
বলো এমন দিন আর পাব কোথায়,
যাব সাধের জেলখানায়॥

১৫৬

গান

মা তোমার কি অপার লীলা,
ঢাকায় বসন্তের খেলা।

বুড়িগঙ্গার চরে নিলা,
হাসপাতালের ঘর।
বসন্ত আর ঝিন-ঝি বাতে,
লোক মরেছে শতে শতে,
লালবাগ আর শ্যামপুরেতে,
চিতার নাই অবসর॥
কেহ যায় স্নান করিতে,
কেহ যায় মা বাজারেতে,
ঝিন-ঝি বাত পড়ে বসে
তাহাদের উপর॥

১৫৭

গান

আগে জানলে বৈরাগী হত কোন্ শালা।
ও মালা জপতে হবে,
ও মালা ঠেলতে হবে তিন বেলা,
আগে জানলে বৈরাগী হত কোন্ শালা।
হায় রে বৈরাগী হওয়া,
উঠে গেছে ভিক্ষে দেওয়া,
বোষ্টুমী পানের সঙ্গে খাইয়া ফেলায়,
সব সুপারি তিন ছালা,
আগে জানলে বৈরাগী হত কোন্ শালা॥

১৫৮

শাশুড়ী বউ-এর ঝগড়া

শাশুড়ী : মোদের দিকে চাহিয়া তোমরা দেখ বাবু ভাইয়া,
শাশুড়ী-বউ ঝগড়া করে, পুতের মাথা খাইয়া।
তুই কি লো খোয়ারি, তোরে দেব ঝাঁটার বাড়ি,
মুখে দেব পোড়া চেলা, যা তুই বাপের বাড়ী।

মোদের দিকে চাহিয়া তোমরা দেখ বাবু ভাইয়া,
শাশুড়ী বউ ঝগড়া করে, পুতের মাথা খাইয়া।

বউ : ব্যাঙের মত ফাল ফাঁড়াস না, চুপ করে থাক বইয়া,
বেশী চেঁচালে পরে, সাপ যাবে খাইয়া।
মোদের দিকে চাহিয়া দেখ বাবু ভাইয়া
শাশুড়ী বউ ঝগড়া করে, পুতের মাথা খাইয়া॥

১৫৯

ছড়া

চাষ করে চাষার পুতে, যদুরে ধরলো ভূতে,
আবার নবাবপুরের ঘরে ঘরে,
তারা সব করলো নতুন আইন,জারি,
ডেকে আন সেই শশীরে, ভূতের ঝাড়া ঝাড়তে পারে,
থাকবি কাপ্তানবাজার তে-রাস্তার মোড়ে,
সেখানে জংলী ভূতের ঘরবাড়ী।
শোন রে কাপ্তানরা সকল,
আমাদের মান্দ্রাজের দল,
বাঁদরামি ভারী॥

১৬০

গান

খাব খাব করছে আমার পাগলা মন,
জায়গাখান হাত বুলিয়ে, জল ছিটিয়ে,
পেতে দিল কুশাসন,
খাব খাব করছে আমার পাগলা মন,
দই-চিঁড়াতে মন মজে না, কর লুচির আয়োজন।
তাতে সন্দেশগুলো ছোট ছোট,
রসগোল্লায় ডুবছে মন,
খাব খাব করছে আমার পাগলা মন॥

১৬১

ছড়া

হায় রে কি ডাকাতী হইল ঢাকায়,
লুটে নিল ময়দার বস্তা,
চুপে-চাপে বেচে সস্তা,
শহর হল নাদার খাস্তা,
রাস্তাঘাটে লোক না যায়,
হায় রে কি ডাকাতী হইল ঢাকায়।
যা করেছে কয়েদটুলি,
লোকেদের সব কাঁধে ঝুলি,
কত মড়ার পঁচা গন্ধ
স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।
হায় রে কি ডাকাতী হইল ঢাকায়॥

১৬২

ছড়া

ঢাকাতে ঢাকেশ্বরী তুই রইলি,
রায়ট কেন বাধালি,
সংকাবাড়ির চত্রিতে,
তিন তারিখের রাত্রিতে,
কত গোল পড়লো ঢাকাতে,
রায়সাহেবের বাজার কিছু নাই,
চকবাজারে উড়লো ছাই,
শ্যামবাজারে কত লোকের ঠাঁই,
মদন পালের বাগিচায়,
নতুন করে বাজার বসালি,
ঢাকাতে ঢাকেশ্বরী তুই রইলি॥

১৬৩

ছড়া

আমার এই কি ছিল কপালে,
বউয়ের বাস্ত হইলাম শেষকালে।
একটা বিয়া করলাম যাট টাকা দিয়া,
আর একটা ঘরজামাই হইয়া।
গিন্নী তুটি অতি চমৎকার,
একটা যেন মালের বোট,
আর একটা ইষ্টিমার।
আমার আর হলো না ঘর করা,
আমি মনের তুঃখে যাই খালে,
বউয়ের বাস্ত হইলাম শেষকালে।
বাম পাশ হইয়া শুইয়া থাকি দণ্ড তুই,
বলে কই গেলি রে তুই ?
ডান পাশে শুইলে, পিছন থেকে
খোঁচা মারে রে।
আমার শীতের কাঁথা নেয় গো কেড়ে,
আমি শীতে মরি শীতকালে,
আমি বউয়ের বাস্ত হইলাম শেষকালে॥

১৬৪

গান

হরি হে কত কষ্ট দিলে জীবকে,
যুগেরই শেষেতে, এই সকল তোমার খেলা,
তোমার লীলা, বুঝেছে সব লোকেতে,
কত কষ্ট দিলে জীবকে যুগেরই শেষেতে।
হরি হে কি করিলে কন্ট্রোল,
ভারতে উঠলো মহারোল,

পায় না চিনি, পায় না লবণ,
কিসে বলবে হরিবোল।
আবার পায়নি চিনি অভাবেতে,
চায়ে চিটে খেয়েছে,
হরি হে কত কষ্ট দিলে জীবকে,
যুগেরই শেষেতে।

যত সব বালক বালিকে,
তারা খিদের জ্বালাতে,
খেতে দে মা, খেতে দে মা ব'লে
সদা কেঁদেছে,
আবার পারে নাই সইতে,
বাপ-মায়েতে ধরায় ধারা বয়েছে।
হরি হে কত কষ্ট দিলে জীবকে,
যুগেরই শেষেতে।

একটি কাঙ্গালের মেয়ে,
একদিন মসলা পিষিয়ে,
পেটের দায়ে খেল রুটি,
প্রতিবেশী দেখলো আসিয়ে,
মসলা কি সে, কি সে হয়,
একবার দাও আমায় বলে,
ও যে মসুরি, ভুট্টা কলাই,
চাউলের গুঁড়াও দেয়,
তাতে গরম জল দিয়ে,
নিবি ময়দা মিশিয়ে,
নরম নরম হবে রুটি
খাবি গোবিন্দ বলে।
আবার ঠেসে ঠেসে খাস না রুটি,
মরবি পেটের জ্বালাতে,
কত কষ্ট দিলে জীবকে, যুগেরই শেষেতে,

হরি হে কাতরে জানাই,
কাপড়ের অভাব গেল নাই,
রেশন কার্ডে দিচ্ছে লিখে,
বলে দোকানে খাও ভাই।
মোটা স্থতার কাপড়গুলি,
গরীবকে দিচ্ছে,
ভালো কাপড় তারাই নিচ্ছে,
এ সকল যুদ্ধ কাণ্ড নয়,
বলি ওহে দয়াময়,
তুমি যুগে যুগে লীলা কর,
তুমি দয়াময়।
এখন এই মিনতি করি তোমাকে,
দিয়ো মোরে চরণ হরি,
শেষে ফেল না বিপাকে॥

১৮৫

গান

এসেছি মোরা পাহাড়ীগণ,
যাব মোরা জিলা করাচী,
নাচিব গাহিব,
স্থরা, মধু খাইব,
বহু শিকার পাইব,
খাব খাসি,
এসেছি মোরা পাহাড়ীগণ,
যাব মোরা করাচী।
গিয়েছি ত্রিপুরা,
দার্জিলিংয়ে বহু দূরা,
শিলং হাপলং ভূরা,
বহু জায়গা ঘুরেছি।

কত শত জানোয়ার,
হাতী, ঘোড়া, মেরেছি,
ময়নামতী, চিটাগং,
ভুলে ঢাকা পৌঁছিয়েছি।
ধর ধর ধর জানোয়ার,
জন্তাপুরী, নানতাবাড়ী,
আগরতলা পাহাড়ে,
বাঁকা তলোয়ার,
ত্রিকণ্ঠধার,
মার হাতী, ডাঙ্গাকাটি,
চল রাজাকে দরবারমে,
এসেছি মোরা পাহাড়ীগণ,
যাব মোরা জিলা করাচী ॥

১৬৬

গান

নাচাও ভাইয়া জানী,
নাচাও ভাইয়া জানী।

… … …

কেতনা শহর ঘুমকে আয়া,
কোই জাগাহা মে নেহি পাই,
দিন-রাত ভূখা রাহা ম্যায়,
নেহি পিয়া হ্যায় পানি,
থোড়া নেহি পিয়া হ্যায় পানি।
নাচাও ভাইয়া জানী,
নাচাও ভাইয়া জানী।
যেতনে হোলি খেলনে আয়া,
সব কোইকো কর দেঙ্গে পাহারাওয়ালা,

ম্যায় হোবে রাজা,
তুমকো কর দেঙ্গে ম্যায় রাণী।
নাচাও ভাইয়া জানী,
নাচাও ভাইয়া জানী।
বাজিবা সারা রা রা,
আরে ভীম তু পবন কি বেটা,
মেথর তুমারা বাপ,
হরদম লগায়া ঝাড়ু,
রাবণকা দরবার,
আরে কমবক্ত কমীন,
তেরা সঙ্গমে যো আযা,
চোরা গোবিন্দ,
ডরকে মারে কহে, পিছু ঠারা,
বাজিবা সারা রা র ॥

পরিশিষ্ট

প রি শি ষ্ট

সাহিত্য বিশারদ মুনশী আবদুল করিম সাহেব সংকলিত, ১৩২১ সালে প্রকাশিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" (প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১ হইতে ৪৩৩ সংখ্যক পুথির বিবরণ) গ্রন্থে সঙের পুথির উল্লেখ আছে, এখানে তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল :

"[পৃষ্ঠা ২২৭] ৩৭০। ভদী বিদ্যানিধির সং।

"ইহা একখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন ;—ভণ্ডামির মস্তক-চর্ব্বণার্থ লিখিত। প্রণেতা সেই ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। কবিরাজ মহাশয় এক অসাধারণ লোক ছিলেন, তাহা নানা কার্য্যেই পরিস্ফুট হইতেছে।

"আরম্ভ :— ভদী বিদ্যানিধির সঙ্‌।

"চাউল কাচ কলা থোর কচু পেয়ারা ইত্যাদি দ্রব্য এক বোতল কিত্রিম সরাব একত্রে এক গাঠুরিতে বান্ধিয়া কান্ধে করো (প্রবৃভু হরি কিঁষ্ণ ২ মোরে খিচে টেনে নেও ২ আমার তানির* সঙ্গি কর ২ পেটটা, পরাণটা পুরুছে হে ২ হায় এতখানি মিষ্টি সামিগ্রি জজমান বাড়িতে ছরাদ্ধ (শ্রাদ্ধ) করাইয়ে পেয়েছি খালি ঘড়ে (ঘরে) কোথায় নেব হায় কারে খাবাব দুরুজা হাটে নিয়ে বেচে ফেলি কিছু জমা হলে পরে তীরিথ করব পর্‌থম্‌ (প্রথম) গয়ায় গিয়ে আমার তানির পিণ্ড দিয়ে মুকৃথ (মুক্ত) কর্ব এ বলিতে ২ ভোমন-চন্দ্রবিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য আসিন্‌ (আসীন)। (পরৃভু হরি কিষ্ণ ২) বল্‌তে ২ সভায় আইসা। মোরে খেচে টেনে নেও ইত্যাদি সভায় বলা।

"ভদ্রাবতী, প্রকাশ ভদী বামুনী

"বড় ভাঙ্গর বাঁশের ঠাঠে কাগজ কাপর জরাইয়া কিত্রিম পেট কর্য়ো কাপর দিয়ে বেন্ধে বাঁশে লট্‌কাইয়ে ধনা মনা দুজন প্রেতাকার সাজ—নফরের কান্ধে বাঁশ উঠাইয়া দিয়া পেট টানিয়ে আস্তে ব্যস্তে উচ শব্দ কর্য়ো। চল্‌ ২ আরে ধনা মনা সিগ্‌গির চল। ধনা মনা ভারেতে (হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ) করে নানা ভঙ্গি-ভাবে চল্যো বিদ্যানিধি সমিপে সভায় আসীন।

"বিদ্যানিধি।

* তানি— স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। তানি= তিনি।

"ভদীর পেট এবং ধনা মনার রূপভঙ্গি ইত্যাদি দেখে ভয়েতে। ওমা একি একি ২ এলো কয়্যে জরসর হইয়া পলাইবার উদ্যোগ। ইত্যাদি।

"শেষ :—গান—তাল খেম্‌টা।

"ক্যা খুশি ক্যা মজা, উরল পিরিতের ধ্বজা।
হায় ২ গজা খাজা ছানাবড়া, হায় হায় তাজা
লাড়ু রসকড়া, হায় ২ খারে প্রাণ সরভাজা॥ ৩॥

"(গান কর্ত্তে ২ নাচতে ২ হটাৎ বিদ্যানিধি বসিয়া গেলেক ভদী তক্ষনেই লাফ (দিয়ে) বিদ্যার কান্ধে চড়িয়া বসিলেক বিদ্যা ভদীর দু পা বুকে জড়াইয়া ঠেশে ধরে যথা সাধ্য দৌড় দিয়া চলিয়া গেলেক॥)

"ভদী বিদ্যানিধির সঙ্গ সাঙ্গ ইতি।

"৮ পৃষ্ঠা মাত্র। তারিখ নাই। সম্ভবতঃ রচয়িতার স্বহস্ত-লিখিত। নিতান্ত অশ্লীল, ভদ্রলোকের পাঠযোগ্য নহে।

"[পৃষ্ঠা ২২৮]

৩৭১। সখাদাসী সখীদাস বৈষ্ণবের সং॥

"ইহাও উক্ত মহাত্মা ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়ের রচিত একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন বিশেষ। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৪। তারিখ নাই। বোধ হয়, তাঁহার নিজ হস্তের লেখা। ভণ্ড বৈষ্ণবের নিন্দা ইহার উদ্দেশ্য। আরম্ভ— সখাদাসী সখীদাস বৈষ্ণবের সঙ্গ।

"কপাল যোরা তিলক এবং হাতে মালার ঝুণ্টা কয়্যে সখাদাসী বৈষ্ণবী গান গাইতে ২ সভায় আইসা :—

গান।

"ব্রেজের প্রেম ভাজা, খেতে বড় মজা,
যা খেয়ে শ্রীকৃষ্ণ হল পিরিতের রাজা।
গিয়ে বৃন্দাবন, নিধুবন নিকুঞ্জ বন,
ঘুরে ২ শিখে আছি এ এলেম তাঁজা॥
যে খাবে এস, প্রাণ খুলে বৈস,
আখেরেতে নেবে যাদু পিরিতের বোঝা।
নদে নিবাসি, নাম সখাদাসী,
জগত বিখ্যাত আমি বৈষ্ণবী মজা॥ ১॥

"শেষ :— বিঠ্ঠল দাস (সখীদাসের প্রতি)

"আস্তানটা আর সখাদাসী তোমা হতে বজায় থাকিল, বংশটা রক্ষা হল, বর খুশি হলেম।......আয় ভাই আলিঙ্গন দিয়ে প্রাণটা জুরাই (এ বলে দুইজনে জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, ধরাধরি, খেছাখেছি চিচ্‌কার একি কালে মহাপ্রলয় কচ্ছে´)।

"সখীদাস—

"হাঁ প্রাণ বৈষ্ণবী চল।

"সখাদাসী—

"বিঠ্ঠলের হাত ধর্য্যে, চল বর্থাস্থি ভাতার, চল জামাই, চল ভাশুর, চল চল কর্য্যে। আগে সখাদাসী, পরে দুই জন বেগে চলিয়া গেল।

"সখীদাস সখাদাসীর সঙ্গ্ সাঙ্গ।

"অশ্লীলতার চূড়ান্ত, কোন ভদ্রলোকের পাঠযোগ্য নহে।"

চন্দননগরের বাদাই উৎসব

একদা চন্দননগরে জন্মাষ্টমীর দিন সঙ বের হত। হরিহর শেঠ মহাশয়ের একটি রচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল। রচনাটি ভারতবর্ষ, ভাদ্র-১৩৩২ সাল, ৪৭৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল। শেঠ মহাশয় চন্দননগরের আনন্দ-উৎসব প্রসঙ্গে আলোচনা-কালে সঙের কথাও বলেছেন :

"বাদাই বস্তুটি কি ছিল—আজকালের যুবকগণ অনেকে বুঝিতেই পারিবেন না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চন্দননগরের ইহা একটি বাৎসরিক বিশেষ আমোদ উৎসব ছিল। নন্দোৎসবের অঙ্গস্বরূপ এই উৎসব জন্মাষ্টমীর দিন বহু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পালিত হইত। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল, সাজসজ্জা করিয়া বিবিধ প্রকার সংএর দল বাহির করিয়া রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করা। ইহা এক কথায় ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল বা কলিকাতার চৈত্র সংক্রান্তির জেলেপাড়ার সংয়ের ছোট সংস্করণ মাত্র বলা যাইতে পারে।

"চন্দননগরে এই উৎসবের আরম্ভ কবে হইয়াছিল, বা ইহা বহু পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে বাদাই হইত, তাহাতে সাজ-সজ্জার বাহুল্য ছিল না ; কেবল নন্দ, যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ মাত্র সাজাইয়া একটি দল প্রস্তুত হইত। ক্রমে উহার সহিত হিজড়া,

অতিরিক্ত ধোপা ইত্যাদি দুই একটি সং সংযোজিত হয়। তখন এই গীতটা সাধারণতঃ গীত হইত ;—

"নন্দের আজ আনন্দ অন্তর
নন্দের কাদা মাখা কলেবর ॥
হংস পৃষ্ঠে ব্রহ্মা এল, ঐরাবতে পুরন্দর,
গালে বাজায়ে এল হর ॥
(বো বো বোম গালে বাজায়ে এল হর) ॥

"ক্রমে দেশে যাত্রার অভিনবত্বে ও থিয়েটারের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির সহিত লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তখন পুরাতন একঘেয়ে ধরণের সং আর লোকের ভাল লাগিল না। ইংরাজি ১৮৮২ সাল হইতে ইহা নূতন ভাবে এবং সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে ঠাকুর দেবতার পালার সহিত "ভাগের মা গঙ্গা পায় না", "যমপুরি", "চার-ইয়ার", "শাশুড়ি বোয়ের দ্বন্দ্ব" প্রভৃতি পালা এবং লহর টপ্পা, ময়ূরপঙ্খী, মাঝি, তুলা ধোনা প্রভৃতির সং কলিকাতা হইতে ভাল ভাল পরিচ্ছদ আনাইয়া সজ্জিত হইয়া বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় গানের সহিত বক্তৃতা, কবির গান, নহবৎ, তক্কানামা প্রভৃতি থাকিত। কোন কোন পালার ভিতর দিয়া লোকশিক্ষার উপযোগী ছড়া ও সঙ্গীত গীত হইত। সময় সময় ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপও গানের মধ্যে থাকিত।

"১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঁচ-ছয় বৎসর বৈষ্ণপাড়া, গোয়াবাগান, ভাকুণ্ডা ও তুপ্লেক্স্ পটি এই কয় স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়া মহাসমারোহের সহিত বাদাই হইত। প্রত্যেক সম্প্রদায় ৫।৭ দলে বিভক্ত হইয়া বাহির হইত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে ব্রতানুষ্ঠান হিসাবেই বাদাইয়ের প্রথম উৎপত্তি হইলেও, ক্রমে বিভিন্ন পল্লী হইতে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়া জেদাজেদি ও রেষারেষিতে ভিন্নাকার ধারণ করিল। এবং কবি হাফ আখড়াইয়ের দলের ন্যায় এক পাড়ার সহিত অপর পাড়ার উত্তর প্রত্যুত্তর সুরু হইয়া শেষে কুৎসা প্রচার আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত শ্লেষ ও সামাজিক কুপ্রথা লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় অনেক গীত রচিত হইত। সমাজের দুর্নীতি সংস্কার ও বিশিষ্ট লোকেদের বা সাধারণের চরিত্র সংশোধনের জন্য পাড়ার মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত বৎসর একখানি পল্লীর লোকের সব বিশেষ বিশেষ দোষ লিখিয়া রাখিত। গান

বাঁধিয়া পরে ঐ সম্বন্ধে বৎসরান্তে বাদাইয়ের সংয়ের সহিত তাহা গীত হইত। শুনা যায়, এই ব্যাপার শেষে আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল।

"ইহার পর সামান্য ভাবে কয়েক বৎসর উৎসব হইয়াছিল। ২০।২৫ বৎসর হইতে এখানে বাদাই আর হয় না। যাঁহাদের উদ্যোগে এই সকল দল সৃষ্ট হইত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মৃত্যুর সহিত ইহা বিলুপ্ত হয়। নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে ভদ্রেশ্বর ও নবাবগঞ্জে বাদাইয়ের খুব ধূম হইত। কিন্তু চন্দননগরের মত সমারোহ এ প্রদেশে কোথাও হইত না। এখানে অনেক দূর, এমন কি কলিকাতা হইতেও লোকে দেখিতে আসিত। শেষ সময়ে ইহার উদ্যোগিবর্গের মধ্যে ৺অম্বিকাচরণ নন্দী, ৺অম্বিকাচরণ দে, ৺ননিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র লাহা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

"জন্মাষ্টমীর বাদাইয়ের ধূম যখন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় বিবিরহাট নামক স্থান হইতে রসিকলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগে এবং শ্রীমতিলাল পলশাই মহাশয়ের সহায়তায় চার-পাঁচ বৎসরের জন্য শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর দিন বাদাই বাহির হইয়াছিল। ইহার গীতাদি প্রধানতঃ শ্রীরাধা বিষয়ক হইলেও, ইহার সহিত নূতন পাঁজি, তুলাধোনা, দাই, হিজড়া, নাপিত, নাপিতানি প্রভৃতি সং বাহির হইত।

"নিম্নে জন্মাষ্টমীর কয়েকখানি গীত উদ্ধৃত করিয়া ইহার কথা শেষ করিতেছি।

"১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের গান

"ইহলোক পরলোক ত্রিলোকেতে পূজে যায়,
গোলোক পরিহরি হরি ভূলোকেতে শোভা পায়।
ধন্য গো মা নন্দরাণী ধন্য পুণ্য করেছিলে ;
পূর্ণব্রহ্ম অবতীর্ণ আমি তব পুণ্য ফলে।
ব্রহ্মাণ্ডের পতি যিনি ডাকিবেন মা-মা ব'লে,
অবহেলে পেলে মাগো ভব তরিবার উপায়।

"একখানি অতি প্রাচীন গান।

"(আজি) আনন্দের অবধি নাহি শ্রীনন্দ ভবনে
নাচে প্রেমানন্দে উপানন্দ শ্রীনন্দের সনে॥

ঐ শিশু হেরি গোপগণে (তারা) সবাইভাবে মনে মনে।
বুঝি গোলোকপতি বালক-রূপে উদয় গোপনে ॥
(মনে জ্ঞান হয় গো)
কেহ বলে নন্দের কিবা সাধ্য ঐ সাধিলে গো কি অসাধ্য ;
দেখ দেবারাধ্য আবদ্ধ আজ তব নিকেতনে ॥
(গোপশিশুছলে হে)
কেহ ভুলিয়া বিষ্ণু মায়াতে, দেখ পদধূলি লহে হাতে
দিতেছে ঐ কৃষ্ণের মাথে উল্লসিত মনে ॥
(জীও জীও বলে রে)

" 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'র একটি গীত :—

"যমের বাড়িতে তোমরা চল শীঘ্র চল রে।
এমন করে এ সংসারে বেঁচে কি ফল বল রে ॥
জননীকে দিসনে খেতে, জন্মেছিলি কোথা হতে
... ...
শ্বেত চামরের বাতাস দিয়ে, দিচ্ছে তোদের ভূত ঝাড়িয়ে
যেমন কুকুর মুগুর খেয়ে হ'স যদি তায় ভাল রে ॥

"রাধাষ্টমীর বাদাইয়ের' একটি গীতের অংশ :—

"আমরা যাই চল ভাই, রাজভবনে দেখতে উৎসবো।
হেরে সুখার্ণবে ভাসিবো ॥
হয়েছে রাজার সুতা, সর্ব্বসুলক্ষণযুতা।
শুনিলাম সে রূপের কথা অতি অসম্ভবো ॥"

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

ছড়া ও গানের প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচী

প্রথম ছত্র / স্থান পৃষ্ঠা